অভেদানন্দ-দর্শন

স্বামী অভেদানন্দ-রচিত বাংলা গ্রন্থ

ভারতীয় সংস্কৃতি
আত্মজ্ঞান
আত্মবিকাশ
যোগশিক্ষা
কর্মবিজ্ঞান
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম
পুনর্জন্মবাদ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম
মনের বিচিত্র রূপ
স্তোত্ররত্নাকর
আমেরিকায় বিবেকানন্দ
পঞ্চদশীদর্শন
পত্র-সংকলন

স্বামী অভেদানন্দ-রচিত ইংরেজী গ্রন্থ

India and Her People
Life Beyond Death
Our Relation to the Absolute
Doctrine of Karma
Attitude of Vedanta Towards Religion
Lectures in India
Ideal of Education
Human Affection and Divine Love
Christian Science & Vedanta
Spiritual Unfoldment
Reincarnation
Songs Divine
Self-knowledge
Path of Realization
How to Be a Yogi
Science of Psychic Phenomena
Divine Heritage of Man
Religion of the Twentith Century, etc.

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত গ্রন্থাবলী

১। তীর্থরেণু (স্বামী অভেদানন্দের ক্লাস-লেকচার ও দার্শনিক আলোচনা)
২। শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী)
৩। রাগ ও রূপ (ভারতীয় সংগীতের বিস্তৃত ঐতিহাসিক আলোচনা)
৪। বাংলা ধ্রুপদমালা (বাংলা ধ্রুপদগান ও স্বরলিপি)
৫। শ্রীদুর্গা (দেবী দুর্গার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা)
৬। প্রোগ্রেস এ্যাণ্ড পারফেক্‌সন (মুক্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে, ইংরেজী গ্রন্থ)

অভেদানন্দ দর্শন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

দার্জিলিঙ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম

স্বামী অভেদানন্দের বিচিত্র চিন্তাধারার অবদান

"অভেদানন্দ-দর্শন"

তাঁরই অভিন্নহৃদয় গুরুভ্রাতা

— বিশ্ববরেণ্য —

স্বামী বিবেকানন্দের

পবিত্রোজ্জ্বল স্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীত হোল।

স্বামী অভেদানন্দ

জন্ম মঙ্গলবার, ২ অক্টোবর ১৮৬৬—শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে ১৮৮৩—তপস্যা ও ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ ১৮৮৮-১৮৯৫—বেদান্ত-প্রচারে লণ্ডনযাত্রা ১৮৯৬—লণ্ডন, ব্লুমস্ বেরী স্কোয়ারে খৃষ্টো-থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে প্রথম বক্তৃতা, ২৭ অক্টোবর ১৮৯৬—অধ্যাপক মোক্ষমূলর, পল্ ডয়সন প্রভৃতির সাথে পরিচয় এবং প্রথমবার আমেরিকায় নিউইয়র্কে আগমন ৬ আগষ্ট ১৮৯৭—উইলিয়াম জেমস্, রেভারেণ্ড ডক্টর হিবার নিউটন, উইলিয়াম জ্যাকসন, জোসিয়া রয়েস, অধ্যাপক ল্যানম্যান, অধ্যাপক ফে, বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন, ডক্টর এল্‌মার গেট্‌স্, রাল্‌ফ্ ওয়ালডো ট্রাইন, ডব্লিউ. ডি. হাউয়েলস্, অধ্যাপক হার্সেল পার্কার, ডাক্তার লোগ্যান, রেভারেণ্ড বিশপ পটার, অধ্যাপক শ্যালার, কেম্ব্রিজ ফিলসফিক্যাল্ কন্‌ফারেন্সের চেয়ারম্যান ডক্টর জেন্‌স্ প্রভৃতি মনীষীদের সাথে পরিচয় ১৮৯৮—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লার সাথে (ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম) তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় ১৮৯৮—আলাস্কা, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি উত্তর আমেরিকার বহু দেশে পর্যটন এবং নানা প্রতিষ্ঠানে বেদান্ত-প্রচার—ইউরোপে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় দর্শন, সনাতন ধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দান—ব্রুকলীন ইনিষ্টিটিউটে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে "India and Her People" নামে বক্তৃতাবলী প্রদান ১৯০৬—দশ বৎসর সাফল্যময় প্রচারকার্যের পর ভারতে প্রথমবার আগমন ১৯০৬—ভারতের প্রত্যেক প্রধান নগরে সর্বত্র বিরাট অভ্যর্থনা লাভ এবং পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাগমন ১৯০৬—কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত বার্কসায়ারে আশ্রম স্থাপন এবং ভারতীয় ধর্ম ও সাধনাসম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান—স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে হনলুলুতে প্যান্-প্যাসিফিক্-শিক্ষাসম্মিলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান—জাপান, চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালালামপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন ও কলিকাতায় আগমন ১৯২১—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ১৯২২-১৯২৫ এপ্রিল—সমগ্র উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পর্যটন এবং কাশ্মীর ও তিব্বতে পরিভ্রমণ ১৯২২—বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন ১৯২৩—কলিকাতায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' স্থাপন ১৯২৩—দার্জিলিঙ-এ 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম' স্থাপন ১৯২৪—শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে কলিকাতা টাউন হলে ধর্মমহাসম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব ১৯৩৭—'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' সংস্থাপন ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯—মহাসমাধি শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ভূমিকা

"অভেদানন্দ-দর্শন" প্রকাশিত হোল স্বামী অভেদানন্দের অসংখ্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলী, ঘরোয়া আলোচনা, কথোপকথন ও পত্রাবলী প্রভৃতিকে অবলম্বন কোরে। "অভেদানন্দ-দর্শন" স্বামী অভেদানন্দের চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ও অন্যান্য বিচিত্র চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা। স্বামী অভেদানন্দ পার্থিব শরীর নিয়ে আমাদের ভিতর না থাকলেও ভাবরাজ্যে তথা চিন্তাধারার জগতে তিনি সর্বদাই আছেন ও অনন্তকাল থাকবেন—'He will live for eternity in the world of Ideas'; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কর্মক্ষেত্রের অসংখ্য বক্তৃতা ও রচনাবলী তাঁকে চিরস্মরণীয় ও মহিমামণ্ডিত কোরে রাখবে।

কোন মনীষীর দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও অনুশীলন দু'রকমভাবে হোতে পারে: একটি—কেবল তাঁর নিজেরই সমস্ত লেখা বা রচনাকে অবলম্বন কোরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা, এবং অপরটি—তাঁর চিন্তাধারার সাথে সাথে তুলনামূলকভাবে ও অপরাপর দার্শনিক তথা চিন্তাশীল মনীষীদের মতের সংক্ষেপ অথবা বিশদ আলোচনা। আমি শেষোক্ত প্রণালীটিই গ্রহণ করেছি তুলনার মাধ্যমে স্বামী অভেদানন্দের চিন্তাধারার মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট কোরে তোলার জন্যে।

শুধু দর্শন কেন, বিচিত্রমুখী চিন্তার জগতে স্বামী অভেদানন্দের দান অফুরন্ত ও অপরিসীম; সকল-কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি বৈশ্লেষণিকী দৃষ্টিতে গভীরভাবে, সুতরাং তাঁর "দর্শন" রচিত হওয়া উচিত সুবিস্তৃতভাবে। কিন্তু আমার এ' প্রচেষ্টা তার তুলনায় সত্যিই নগণ্য। আমি তুলনামূলকভাবে, কিন্তু সংক্ষেপে ও সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বামী অভেদানন্দের সুচিন্তিত ভাবধারাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে, তাই ভূমিকার আকারে এই গ্রন্থটি তাঁর সুবিশাল অবদানের দিকদর্শকমাত্র, পরিপূর্ণ অনুশীলন মোটেই নয়। সুতরাং রীতিমত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-পাঠিকারা যদি এই বইয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালীর মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা না পেয়ে হতাশ হন তবে অপরাধী রূপে গণ্য আমি মোটেই হব না। তাই এ'গ্রন্থ যে স্বামী অভেদানন্দের বিস্তৃত দর্শনের ভূমিকা বা দিকদর্শকমাত্র তা আগে থেকেই বোলে রাখা সমীচীন মনে করি। তবে এই ভূমিকা-গ্রন্থ সকলের কাছ থেকে সমাদর পেলে ভবিষ্যতে সুবিস্তৃতভাবে স্বামী অভেদানন্দের বিচিত্র চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করার আমি সাহস পাব। ঠিক এই ধরণের একটি "শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন" লেখার ইচ্ছাও গ্রন্থকারের অবচেতন মনে সুপ্ত আছে।

বর্তমান গ্রন্থে দর্শনের পরিভাষাগুলির অনুবাদ আমি সাধারণভাবেই করেছি, তাই গ্রন্থের পরিশেষে ইংরেজী ও বাংলা দার্শনিক পরিভাষার একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্যে মাত্র দার্শনিকদের নামের একটি নির্ঘণ্টও দেওয়া হোল।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে শব্দের বানান-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে নানান কারণে। যেমন, 'বোঁসাকে' ও 'বোসাংকে', যদিও 'বোসাংকে'-ই ঠিক। 'এরিষ্টোটেল', 'আরিষ্টোটেল' ও 'এ্যারিষ্টোটেল'; 'এ্যাণ্ড' ও 'য়্যাণ্ড'; 'বের্গসোঁ'—কিন্তু হওয়া উচিত—'ব্যের্গসোঁ'; 'ব্রাড্‌লি' ও 'ব্রাড্‌লে' হওয়া উচিত 'ব্র্যাড্‌লে'; 'লিবনিজ' ও 'লাইবনিজ', কাণ্টের ভাষ্যকার 'ইয়ুঙ' নন, হবে 'অধ্যাপক ইউয়িঙ্‌' প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্যান্য ভুল-ত্রুটিও আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ বইখানির ছাপা ও সাথে সাথে পাণ্ডুলিপি তৈরী করার কাজ চল্‌তে থাকায় জায়গায় জায়গায় পুনরুক্তিদোষও হয়েছে। এছাড়া অসাবধানতার জন্যে বইখানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদও হয়েছে বড় কম নয়; যেমন, ২০ পৃষ্ঠায় 'বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদের (objective idealism)'-এর স্থানে হবে 'বিষয়-বিজ্ঞানবাদের (objective idealism)', এবং ঐ ২০ পৃষ্ঠায় 'বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদে জগতের' স্থানে হবে 'বিষয়-বিজ্ঞানবাদে জগতের'; 'বিষয় বা আত্মার' (পৃঃ ৯৭) স্থানে হবে 'বিষয়ী বা আত্মার'; 'পৃথক কোন উপকারীতা' (পৃঃ ১৭০) স্থানে হবে 'পৃথক কোন উপকারিতা', প্রভৃতি। পরবর্তী সংস্করণে সকল ত্রুটীর সংশোধন করার ইচ্ছা রইল।

'অভেদানন্দ-দর্শন' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ হিসাবেই প্রকাশিত হোল, কিন্তু এটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হোলে সকল দেশের শিক্ষাসেবীদের দরবারে পৌছানোর সুবিধা ছিল। অবশ্য আমার ইংরেজীতে লিখিত সুবিস্তৃত "ফিলজফি অব নলেজ এ্যাণ্ড দি এ্যাবসোলিউট" ('Philosophy of Knowledge and the Absolute'—যা এখনো অপ্রকাশিত ও পাণ্ডুলিপির আকারে আছে) নামক তুলনামূলক গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক মতবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে যাঁদের আমি একান্তভাবে সহায়তা লাভ করেছি তাঁদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানানো কর্তব্য বোলে মনে করি। কুমারী মীরা মিত্রের সহায়তা এই গ্রন্থ-রচনার ক্ষেত্রে অপরিসীম। বইখানির অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি তিনি ধৈর্য-সহকারে দেখে দিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় ভাষা ও রচনার সৌষ্ঠব ও সঙ্গতি বজায় রাখার জন্যে সংশোধন এবং পরিবর্তন করতেও তিনি ত্রুটি করেন নি। এছাড়া নিয়মিতভাবে প্রুফ দেখা, বিভিন্ন দর্শনগ্রন্থ থেকে প্রমাণবচন-সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অক্লান্ত ও অজস্র সহায়তা না পেলে এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা আমার পক্ষে কোনদিক দিয়েই সম্ভবপর হতো না, তাই তাঁর ঋণ সম্পূর্ণভাবে অপরিশোধ্য।

প্রুফ প্রভৃতি দেখার ও বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করার জন্যে শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী সত্যরূপানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী দুর্গানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী গিরিজানন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ্‌ শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এ, বি-এল, শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ, স্নেহাস্পদ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য ও মাননীয় শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়, বার-এ্যাট্-ল (জমিদার, নড়াইল) প্রভৃতিকে। এই গ্রন্থ-রচনার সময়ে নানানভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দানে এঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রীমৎ স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজকে।

এরই আগে প্রকাশিত আমার সংগীতের গ্রন্থ "রাগ ও রূপ" সংগীতশিল্পীদের কাছে সমাদর লাভ ও খ্যাতি অর্জন করেছে দেখে আমি আশান্বিত আমার ভবিষ্যৎ রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্যে। কিন্তু "রাগ ও রূপ" বইখানির খ্যাতি-অর্জনের মূলে আমি সর্বতোভাবে দেখি স্বামী ভবেশানন্দজী মহারাজকে কারণ-রূপে, কেননা তাঁরই অজস্র উৎসাহ ও একান্ত সহায়তা না পেলে সেই বই থাকত লৌহপেটিকার মধ্যে আবদ্ধ লোকলোচনের চিরদিন অজ্ঞাত হোয়ে। তাই প্রশংসার আশীর্বাদ যদি কিছু বর্ষিত হোয়ে থাকে সে-বই প্রকাশিত হওয়ার জন্যে, তার সবটুকুই প্রাপ্য শ্রীমৎ স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজের, আমার নয় এবং এই স্বীকারোক্তি আমার পক্ষে গরীয়সী দীনতা নয়।

এই "অভেদানন্দ-দর্শন" বইখানিও প্রকাশ করা সম্ভব হোল প্রধানতঃ তাঁরই একান্ত সহায়তা ও চেষ্টায়; তাঁরই অবিশ্রান্ত প্রেরণা ও উৎসাহ প্রবুদ্ধ করেছে আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায়। আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই তাই শ্রীমৎ স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজকে।

এছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হোল আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন বন্ধুর সহানুভূতি ও অর্থসাহায্যে, এজন্যে তাঁদের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। এই "অভেদানন্দ-দর্শন" আমি নিঃসত্ত্বভাবে দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমকে দান করলাম, সুতরাং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমই পাবে। তবে এইটুকু আমার দাবী রইল যে, এই বই নিঃশেষিত হবামাত্র এরই বিক্রয়লব্ধ অর্থে তৎক্ষণাৎ সেই আশ্রম যেন এই বইয়ের পুনর্মুদ্রন ও প্রকাশ করেন।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সুচারুরূপে মুদ্রন করার জন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-এর সুযোগ্য কর্তৃপক্ষদের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬
ফাল্গুন, ১৩৫৭

প্রজ্ঞানানন্দ

সূচীপত্র

পঞ্চম আলোচনা

ষষ্ঠ আলোচনা

সপ্তম আলোচনা

অষ্টম আলোচনা

নবম আলোচনা

দশম আলোচনা

একাদশ আলোচনা

দ্বাদশ আলোচনা

ত্রয়োদশ আলোচনা

চতুর্দশ আলোচনা

পরিশিষ্ট

অভেদানন্দ-দর্শন

—প্রথম আলোচনা—

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি

পরমসত্যের নিরাবরণ কল্যাণময় রূপকে সাক্ষাৎভাবে ও পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করার নামই 'দর্শন'। ভারতবর্ষে দর্শনকে তাই বলা হয় অধ্যাত্ম বা মোক্ষশাস্ত্র। বিশ্ব-বৈচিত্র্যের কারণ বা স্রষ্টার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে সার্থকতা থাকে দর্শনশাস্ত্রের, তাই ভারতবর্ষীয় দর্শনের সত্যিকার রূপই 'উপলব্ধি' যা দার্শনিক ব্র্যাড্‌লের কথায় 'ফেল্‌ট্ এক্‌স্‌পিরিয়েন্স' (*felt experience*) বা কাণ্টের ভাষায় 'এ্যাপার্‌সেপ্‌সান অব দি এ্যাবসোলিউট্' (apperception of the Absolute).

পাশ্চাত্যদেশে দর্শনশাস্ত্রকে বলা হয় 'ফিলজফি': 'ফিলস্' (*philos*) বল্‌তে প্রগাঢ় অনুরাগ ও নিষ্ঠা ও 'সফিয়া (*sophia*) অর্থে জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগের নামই 'ফিলজফি' (Philosophy) বা দর্শনশাস্ত্র। এই জ্ঞানানুরাগের পিছনে থাকে বিচার বা বৌদ্ধিক অনুসন্ধান ও অনুশীলন, আর চিন্তা, যুক্তি ও অপরোক্ষানুভূতি দেয় পরিচয় পরিপূর্ণ সত্যের। তবে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যে সকলেই মেনে নিয়েছেন এই সিদ্ধান্তকে একবাক্যে, এমনও নয়। হেগেল ও তাঁর মতানুবর্তীরা চিন্তা (idea) ও বস্তুসত্তাকে (reality) স্বীকার কোরে নিয়েছেন এক ও অভিন্ন বোলে, কেননা জড় ও চৈতন্যের—বুদ্ধি ও বোধির মাঝখানে ব্যবধান কোন মেনে নিতে তাঁরা রাজী নন্। হেগেলের অভিমত যা-কিছু প্রতিভাত হয় সত্য বোলে সে সমস্তই পড়ে যুক্তির এলাকায় ('all that is rational is real and all that is real is rational')। মোটকথা হেগেলের দৃষ্টিতে যুক্তি, চিন্তা, মন, বুদ্ধি, বোধি, ভগবান এসবই অভিন্ন ও এক পর্যায়ভুক্ত। তিনি বলেছেন: জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—বিষয় ও বিষয়ী পৃথকভাবে সৃষ্ট হোলেও একই ব্রহ্মের (Absolute) তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আসলে ব্রহ্মই জ্ঞাতা-রূপে জানেন জাগতিক বিষয়-সকলকে আর এই বিষয়কে জানা ও বিষয়-রূপে প্রতিভাত হওয়ার মধ্যে ভেদ কিছু নেই।* ডেকার্ট, লিবনিজ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সিদ্ধান্তও অনেকটা এই একই ধরণের। তবে অধ্যাপক ম্যাক্‌টাগার্ট হেগেলীয় মতের অনুবর্তী হোলেও এ-সিদ্ধান্তকে একেবারে মেনে নতে পারেন নি। কাণ্ট্, ব্র্যাড্‌লে, বোসাঁকে এঁদের মতবাদ হেগেল থেকে আবার অনেক ভিন্ন। ক্যাণ্ট্ স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন: চিন্তা ও বাস্তবতার ব্যবধানকে বুদ্ধি কোনদিনই মুছে দিতে পারবে না, আর ব্রহ্মের সঙ্গে মনের মিতালী হওয়াও কোনদিন সম্ভব নয়। ব্র্যাড্‌লের অভিমতও তাই। তিনিও বলেছেন: পরিপূর্ণ সত্যের নাগাল মন বা বুদ্ধি কোনদিনই পেতে পারে না; সমুদ্র মাপতে গিয়ে নুনের পুতুলের যে দুরবস্থা হয়, ব্রহ্মকে

জানতে গিয়ে মন ও বুদ্ধির অবস্থাও হয় ঠিক সেইরূপ, ব্রহ্ম-রূপী প্রদীপ্ত সূর্যের আলোকে বুদ্ধি ও যুক্তির দীপালোক হয় চিরদিনই নিষ্প্রভ। অদ্বৈতবেদান্তের অভিমতও তাই। ব্রহ্মের পরিচয় দিতে গিয়ে শংকরাচার্যও বলেছেন: ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—মন বুদ্ধি দিয়ে মন-বুদ্ধির প্রতিভাসক ব্রহ্মচৈতন্যকে মোটেই ধরা যায় না, তবে বিচার ও বুদ্ধির অতীত নির্দ্বন্দ্ব ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অনুভব করা যায় অপার্থিব জ্ঞানের ক্ষেত্রে। এই জ্ঞানে আপেক্ষিকতার গন্ধ থাকে না, এই জ্ঞানকে লাভ করার কোন উপায় বা সাধনও নাই, এই জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, মায়িক ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই জ্ঞানের পবিত্র আলোকে একাকার। এই জ্ঞানের আলো নিজেই প্রকাশিত হয় ও সর্বদাই প্রকাশশীল। আচার্য শংকর এই জ্ঞানকে বসিয়েছেন তাই আত্মা বা ব্রহ্মের পবিত্র সিংহাসনে। উপনিষৎ এই জ্ঞানকে বলেছে সচ্চিদানন্দ। চিৎসুখাচার্য এই জ্ঞানের অভিধান দিয়াছেন—বিষয়-বিষয়ীদ্বন্দ্ববিহীন 'অপরোক্ষ-ব্যবহার' বোলে। সুরেশ্বরাচার্য খণ্ডন করেছেন এই বিষয়-বিষয়ী বা গুণ-গুণী-সম্বন্ধকে, পদ্মপাদ বলেছেন এই সম্বন্ধকে মায়িক; সুতরাং সকল সম্বন্ধ ও সকল গুণ-বিবর্জিত স্বয়ংপ্রকাশ অপার্থিব দ্বন্দ্বরহিত জ্ঞানই ব্রহ্ম। বাচস্পতি মিশ্রের সিদ্ধান্তও তাই, আর এই সিদ্ধান্তের ওপরই সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় দর্শনের মহিমময় কল্যাণতম রূপ!

ভারতবর্ষীয় দর্শনের সত্যিকার রূপ কি?—এর পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের মতবাদ কোনদিনই হেঁয়ালির ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত নয়, তা সর্বদাই সাবলীল, সরল, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে তা জাগতিক জটিল সমস্যাগুলির সমাধান এমনই ভাবে করে যা বিজ্ঞানের পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব। সত্যিকার দর্শনশাস্ত্র মানব-জীবনের চরমলক্ষ্যকে ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত না কোরে বরং সামঞ্জস্য সাধন করে সার্বভৌমিক ধর্মের চরমসত্যের সঙ্গে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে থাকা চাই তিনটি অবশ্য-করণীয় বিষয়: (১) প্রথমত—জড়বিজ্ঞানের চরম-সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কতকগুলি যথাযথ নিয়ম আবিষ্কার করা ও সেই সব নিয়ম দিয়ে জগতের বিচিত্র রহস্য বিশ্লেষণ করা। যখনই দর্শনশাস্ত্র করে এ-সকল রহস্যের মর্ম-উদ্‌ঘাটন, তখনই তাকে বলা হয় দৃশ্যবাদ বা 'ফেনোমেনোলজি'। হার্বার্ট স্পেন্সার করেছেন অতি সুন্দরভাবে এসকলের বর্ণনা, কিন্তু জীবনের যে-সমস্ত জটিল ও দুরূহ সমস্যার সমাধানে বড় বড় মনীষীরাও হোয়ে পড়েন হতবুদ্ধি, সেগুলির মীমাংসা দূরে থাকুক, তিনি করেন নি তাদের কোন-কিছুরই আলোচনা, অথচ এ সকল জটিল সমস্যার সমাধানের ওপরই নির্ভর করে মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে * *। (২) দ্বিতীয়ত—জ্ঞানের উৎপত্তি ও সীমা নির্ধারণ করাও দর্শনশাস্ত্রের একটি অপরিহার্য বিষয়। যে বই পড়া ও আলোচনা করা হয় সে সম্বন্ধে পাঠকদের নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সেই জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে সে সম্বন্ধে হয় তো তাঁদের মোটেই জ্ঞান থাকে না। জগতের বহু প্রখ্যাত মনীষীও এ-সম্বন্ধে উত্তর দিতে গিয়ে হয়েছেন হতবুদ্ধি। মন কি পরিমাণে ও কিভাবে এই জগৎকে জানতে পারে? এ জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা থেকে? জ্ঞানের শেষই বা কোথা?—এইসব প্রশ্নের মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের যেদিক থেকে করা হয় তাকে বলে প্রমাবিজ্ঞান বা 'এপিস্টেমোলজি'।

কাণ্ট', হেগেল, ফিক্‌টে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দর্শনশাস্ত্রের এদিকটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। দার্শনিক জর্জ ক্রুম রবার্টসন তাঁর 'এলিমেণ্টস্ অব জেনারেল ফিলজফি' বইয়ে লিখেছেন: প্রমাবিজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের যথার্থ রূপ, কারণ দর্শনশাস্ত্রের এই অংশ বা শাখাই বস্তু ও তার সত্তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান, বাহ্য জগতের সঙ্গে আন্তর জগতের যোগসূত্র নির্ণয়—এসকল বিশদভাবে আলোচনা ও প্রকাশ করে। প্রমাবিজ্ঞানবিৎ এই রকমে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই লাভ করতে পারেন না। * * আসলে জড়-বিজ্ঞান যেখানে শেষ করে তার যাত্রা, দর্শনশাস্ত্রের সূচনা হয় সেখান থেকেই। পরিদৃশ্যমান জগতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে সীমাবদ্ধ মনকে বাক্য-মনের অগোচর অতীন্দ্রিয় ভূমি বা আত্মানুভূতির রাজ্যে পৌঁছে দেওয়াই দর্শনশাস্ত্রের তৃতীয় কাজ।[১] এ ছাড়া স্বামী অভেদানন্দ আরো বলেছেন: "তাই হোল প্রকৃত দর্শন যা অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর কোরে আমাদের শাশ্বত শান্তির আলো দেখায়, সেই আলোয় চেতনা লাভ কোরেই নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে পারি আমরা দুঃখময় সংসারেও, স্বার্থের বশে অজ্ঞানকৃত কাজের ফল পাবার আশাও করি না আমরা কোন রকমের * *।"[২]

দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগসূত্র আছে যথেষ্ট পরিমাণে। বিজ্ঞান জাগতিক বিষয়কে বারবার পরিদর্শন কোরে যে জ্ঞান অর্জন করে সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা পৃথিবীর মায়া ও আকর্ষণকে অতিক্রম না করলেও অপার্থিব রহস্যের দিকে টেনে নিয়ে যায় মানুষের মনকে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: 'সত্য যা তাকে নির্ণয় করাই সকল শাস্ত্রের—সকল বিদ্যার উদ্দেশ্য। তবে তার মধ্যেও আবার রূপ ভেদ থাক্‌তে পারে। বিজ্ঞান যে সত্যকে চরম-আবিষ্কার বোলে মনে করে, দর্শন হয়তো তাকে শ্রেষ্ঠতার মর্যাদা দিতে হয় গররাজী, কিন্তু তাহোলেও উভয়ের প্রচেষ্টাই যে যথার্থ সত্যের সন্ধানে ছুটে চলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই আকুল প্রচেষ্টার জয়যাত্রা অব্যাহত থাক্‌লেই একদিন-না-একদিন দর্শন করবে মিতালী বিজ্ঞানের সঙ্গে চরম-সিদ্ধান্তের দিক থেকে।'[৩] বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্ প্লাঙ্কও তাঁর 'হয়ার ইজ্ সায়েন্স গোইঙ্' বইয়ে (পৃঃ ১৯৯-২০০) স্বীকার করেছেন:

১। (ক) অভেদানন্দ: 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার্ পিপল্', পৃঃ ৩৮; (খ) ডাঃ মুরহেড ও রাধাকৃষ্ণন্ সংপাদিত 'কনটেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি'-তে (১৯৩৬) প্রকাশিত ডাঃ দাশগুপ্তের 'ফিলজফি অব ডিপেন্‌ডেণ্ট ইমার্জেন্স' প্রবন্ধ (পৃঃ ১৭৩) দ্রষ্টব্য।

২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান্ টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৯১

৩। ডাঃ দাশগুপ্ত আবার বলেছেন: "The method of philosophy is that of science. It analyzes experiences and the facts denoted by them, collects them, and arranges them in order, forms hypotheses and theories to explain them in relation to other experiences. It thus uses both the deductive and inductive methods of science and attempts a systematisation of all known facts and experiences."—*Contemporary Indian Philosophy* (1936), p. 189.

"লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্তে আমরা সর্বদাই চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা করছি ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে পুনঃপুনঃ পর্যবেক্ষণ ও তার অনুশীলন কোরে ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি, কেননা সকল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।" ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে বলেছেন: 'দর্শন বল্‌তে আমরা বুঝি যা বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান (science of science)। দর্শন বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দী নয়, কিংবা দর্শন ও বিজ্ঞান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু নয়, পরস্পরের মধ্যে বেশ একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। মোটকথা দর্শনে সত্য বা মনকে [৪] আমরা দেখি পরিপূর্ণরূপে আর বিজ্ঞানে তার প্রকাশ হয় মাত্র আংশিকভাবে ("that for philosophy, reality or mind is concrete, the whole ; for science, reality or nature is abstract, a partial aspect") ; অথবা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের অভিধান তিনি দিয়েছেন এই বোলে: বিজ্ঞানী আমরা তাঁকেই বলি যিনি সত্যকে বলেন স্থির, নিশ্চল ও মনের বাইরের জিনিস, অথচ চাঞ্চল্য বা শক্তির প্রকাশ থাকে বাইরের জগতে অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহের আকারে। দার্শনিক সত্যকে বলেন ইতিহাসের অভিব্যক্তি, যার মধ্যে নাও থাক্‌তে পারে কালপ্রবাহ, কিন্তু থাকে আন্তর কর্ম-চাঞ্চল্যের প্রবাহ যা প্রকাশ পায় বাস্তব জগতে প্রাণ বা মনের রূপ নিয়ে।' [৫] তাই বাহ্য ও আন্তর বস্তু দুটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের নজিরে বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিতর যে পাওয়া যায় একটি নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ একথা মোটেই অস্বীকার করা যাবে না।

ধর্মের সঙ্গেও দর্শনের আছে এক মধুর সম্পর্ক, একটি অপরটিকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না মোটেই—একথা স্বামী অভেদানন্দও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "Of the tree of knowledge, true philosophy is the flower and religion is the fruit, so they must go together" ; অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ জ্ঞান-বৃক্ষের ফুল দর্শনশাস্ত্র আর ফল ধর্ম, একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা ছাড়া ধর্ম ও দর্শনকে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: ধর্ম দর্শনশাস্ত্রের ব্যবহারিক বা কার্যকরী দিক আর দর্শন ধর্মের ঔপপত্তিক দিক—"Religion is nothing but the practical side of philosophy and philosophy is the theoretical side of religion." মোটকথা ব্যবহার ও অনুভূতির দৃষ্টিকোন থেকে একই জিনিস দু'রকম ভাবে অভিব্যক্ত হয়। দর্শনের রূপ ধর্ম, বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক, অনুভূতি এই সমস্তগুলিকে নিয়ে পরিপূর্ণ, আর সত্য-শিব-সুন্দরের উপলব্ধিতেই দর্শনের সার্থকতা।

৪। ক্রোচে মন বা মাইণ্ডকেই বল্‌তে চেয়েছেন সত্তা বা প্রকৃতি।

৫। এইচ. উইলডন কার্: 'দি ফিলজফি অব দি বেনেদেত্তো ক্রোচে, (১৯২৭), পৃঃ ২৮-২৯

অধ্যাপক কার্ আরও বলেছেন: "By philosopher we have come to mean one who regar ds reality as a history, rot necessarily as a time process, but essentially as an internal activity which manifests itself outwardly, and which we usually name life or mind."—'দি ফিলজফি অব দি বেনেদেত্তো ক্রোচে',, পৃঃ ২৯

দর্শনের অভিব্যক্তির একটি রূপ আছে। সেই অভিব্যক্তি ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়েই রূপায়িত হয়। দর্শন আকস্মিক বা আগন্তুক কোন অভিনব বস্তু নয়, সমাজের বুকেই মানুষ তার ভাব ও চিন্তা দিয়ে গড়ে তোলে দর্শনের শরীর ও মন। চিন্তাপ্রবাহের বিকাশেরও আছে একটি ইতিহাস, আর সেই ইতিহাসকে ভিত্তি কোরেই দর্শনের সৌধ উঠেছে গড়ে। সৃষ্টির গোড়াকার দিকে মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল দিগন্তবিস্তারী আকাশ ও সূর্য, বিশেষ কোরে আকাশবিহারী সূর্যের মহিমালোকেই সঞ্জিবীত ছিল বিশ্ববৈচিত্র্য। সূর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপের বিকাশ ছিল মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতা, তাই তখনকার যুগের মানুষের মন ছিল স্তোত্র, গান ও সরল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ; শস্য, ঐশ্বর্য, আয়ু ও কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা জানাত তারা ঐসব দেবতাদের কাছে; দর্শনের রূপও ছিল তাই প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষার ভাবে পরিপূর্ণ। কতদিন ধরে এভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল তা আমরা জানি না, তবে সভ্যতা ও উন্নত সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন ও চিন্তাধারা যখন বিকশিত হোয়ে উঠেছিল, বুদ্ধি ও বোধির ক্ষেত্রও তখন হয়েছিল প্রদীপ্ত ও প্রসারিত। এই বৌদ্ধিক যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল উপনিষৎ। ঔপনিষদিক যুগের বীজও ঋগ্বেদের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। গৃহী ও বনী, ভোগী ও যোগী, সকামী ও নিষ্কামী সবার অনুযায়ী উপাসনা ও ধ্যানেরও ছিল বিধান। দর্শন তখন সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের মহিমালোকে ছিল উজ্জ্বল ও অভিব্যক্ত। পরিবর্তনই করে সমাজের সর্বশরীরে নূতন শক্তির সঞ্চার, করে রক্ত সঞ্চালন কোরে তাকে বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করার ও বেঁচে থাকার উপযোগী। পরিবর্তনের স্রোতে পড়ে সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের চিন্তাধারা সৃষ্টি করল ধীরে ধীরে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের অভিনব যুক্তিপ্রণালী। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব সকল রকম সাধকদেরও অভ্যুদয় হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন পথ ও মতকে অবলম্বন কোরে। কপিল অস্বীকার করলেন ঈশ্বরকে, সৃষ্টির কারণ হিসাবে দেখালেন চেতন পুরুষ ও জড়া প্রকৃতির পরস্পর মিলনকে, অথচ কেন অস্বীকার করলেন ঈশ্বরকে, সমাজের ও মানব-মনের কি প্রয়োজন হয়েছিল সেই নির্ভিক অস্বীকারের পিছনে, তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণও তিনি দেখালেন না কোন প্রমাণপঞ্জী দিয়ে। অবশ্য অস্বীকৃতিই স্বীকৃতির ধারণাকে করে পরিস্ফুট আর তাই থেকে কপিলের সমসাময়িক সমাজে যে অব্যাহত ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব একথাও যায় বেশ বোঝা। মুক্তির স্বরূপ বলতে গিয়ে কপিল বল্লেন: ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে হয় নিঃশ্রেয়স। ঔপনিষদিক সৃষ্টিক্রম পেল বিজ্ঞানের আলোকে নবচেতনা।

কিন্তু তারপরই মেনে নিল পতঞ্জলির সমাজ ঈশ্বরের উপযোগীতাকে; পতঞ্জলি জগৎ-কারণতার সিংহাসনে বসালেন ঈশ্বরকে ও অষ্টাঙ্গযোগের বিধান দিলেন সাধন হিসাবে। মন সেখানে হোল মুক্তির অন্তরায়, সুতরাং মনকে নিরুদ্ধ কোরে তার স্বরূপের মধ্যে দেখালেন তিনি আত্মার নিরাবরণ রূপ। আত্মার স্বরূপে অবস্থিতিকেই পতঞ্জলি বল্লেন মুক্তি। এরপর পরমাণুবাদের সৃষ্টি হোল অনুসন্ধানী মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার অবদানরূপে। কণাদ বল্লেন:

অবিভাজ্য অতিসূক্ষ্ম পরমাণুই বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাতে নিমিত্তমাত্র। কণাদের বিশ্লেষণী নীতি অনেকটা আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে। কিন্তু ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার টমসন (Sir J. J. Thomson) অবিভাজ্য পরমাণুকে বিভক্ত কোরে করলেন অসংখ্য বৈদ্যুতিক অণুতে পরিণত। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরাও অণুকে বল্লেন জগতের উপাদান। তবে কণাদের মতে পরমাণুর অবিভাজ্যতার হানি কিন্তু কোনদিনই হোল না। বেদান্তে অবশ্য খণ্ডন করা হোল পরমাণুবাদকে জড় ও অশাশ্বত বোলে। গৌতম করলেন ষোলটি ভাব-পদার্থের সৃষ্টি নিঃশ্রেয়স লাভের উপকরণরূপে। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানকে বল্লেন তিনি অপবর্গ বা মুক্তিলাভের পথে অন্তরায়, এদের নাশেই হয় আত্মজ্ঞানের উদয়। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই বারটি পদার্থ গৌতমের মতে প্রমেয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই চারটি প্রমাণের দিলেন তিনি পরিচয়, আর বল্লেন : এই চারটি প্রমাণের সাহায্য নিয়ে সকল পদার্থের যথার্থ রূপের জ্ঞানেই হয় মোক্ষ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই মোক্ষকেই বলেছেন সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। তাৎপর্য-টীকাকার বলেছেন একে কৈবল্য।

মীমাংসাদর্শনের যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞের হোয়ে উঠল আবার নতুনরূপে উজ্জীবন যদিও তান্ত্রিক আচার ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার প্রার্থক্য সৃষ্টি হোলে অনেক। বৈদিক আচারই গোপনে ছদ্মবেশ নিয়ে পরিণত হোল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে। বৈদিক সোমরস তান্ত্রিক সাধনে কারণরূপে হোল পরিচিত আর মন্ত্ররূপী দেবতারা উভয় সাধনেই আসন গ্রহণ করলেন সমান ভাবে। বৈদিকযুগের যাগ-যজ্ঞ আবার আকর্ষণ কোরে বসল মানুষের মনকে। সকাম সাধকের কর্মানুষ্ঠানে "অপূর্ব' নামে এক শক্তির আবির্ভাব হোল স্বর্গপ্রাপ্তির সহায়রূপে। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের পাতাকা হোল উন্নত ; ঈশ্বর, বেদ, স্বর্গ এসকলের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা গেল মুছে। তন্‌হা বা তৃষ্ণার প্রবাহে জর্জরিত মানুষ নির্বাসনার আশীর্বাদ নিয়ে বসালে চরম শান্তির আসনে নির্বাণকে। ক্রমে আবির্ভূত হলেন ভারতের পূণ্যতীর্থে আচার্য শংকর। জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে স্তব্ধ ও ম্লান হোল যজ্ঞের ধূম ও অগ্নিশিখা ; কর্মকে মায়াজাল মনে কোরে মুক্তির সাধক বরণ কোরে নিলেন তখন জ্ঞান ও বিচারের পথকে। দর্শন ও সাধনের প্রতিপাদ্য বিষয় হোল অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আর মুক্তির রূপ হোল আত্মোপলব্ধি।

মোটকথা দর্শন মানুষের ক্রমবিকাশশীল চিন্তারই পরিণতি। মানুষ বাস করে সমাজে, সমাজের ঘটনা-পারম্পর্যের সঙ্গে তার মনের মিলন ও সংঘাতের জন্যে সৃষ্টি হয় যে চিন্তাধারার তাকে সুসংগত ও নিয়মবদ্ধ কোরে প্রকাশ করাতেই রূপায়িত হয় দর্শন। আত্মা, ভগবান, সুখ-দুঃখ, ইহলোক-পরলোক, অদৃষ্ট, কর্ম, পুরুষকার, প্রারব্ধ —এ সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধ তার অনিবার্য আর এই সম্পর্কের মাঝখানে প্রতিক্ষণে প্রশ্ন ওঠে তার মনে অসংখ্য রকমের, বিবেকদীপ্ত মনও আবার মীমাংসা করে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্যে। এই প্রশ্ন ও মীমাংসার ধারা চলে আসছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, এই প্রশ্ন ও সমাধানের সমস্যাই সৃষ্টি করেছে দর্শনে বিচিত্র মত ও পথ যদিও চরম-সিদ্ধান্তের সঙ্গে মৈত্রীভাব রেখেছে সকল মত ও পথ অবিসংবাদিতরূপে।

—দ্বিতীয় আলোচনা—

স্বামী অভেদানন্দ দার্শনিক কিনা?

দার্শনিক আমরা তাঁকেই বলি যিনি দর্শনের চিন্তাধারা নিয়ে করেন অনুশীলন ও আলোচনা, দর্শনের মূলতত্ত্ব করেন উপলব্ধি ও দর্শনের জগতে দেন নতুন নতুন প্রেরণা, ভাব ও যুক্তির অবদান। তবে দার্শনিকদের মোটামুটি দু'রকম শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: (১) প্রথম যাঁরা নিজেদের প্রজ্ঞালোকে জন্ম-মৃত্যু ও জগৎকারণ-সমস্যার সমাধান কোরে অন্তরে হন পরম-আত্মতৃপ্ত ও সেই পরমতৃপ্তির সংবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন কোরে মৌলিক চিন্তা ও সাধনার জগতে সৃষ্টি করেন পুণ্য পরিবেশ ও দিব্যপ্রেরণা। (২) দ্বিতীয়—যাঁরা কেবলই যুক্তি ও বিচারের আলোকে সকল দর্শনের তথা মতবাদের রহস্য হন অবগত, অভিনব ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ ও প্রচার করেন তাকে জ্ঞানপিপাসু মানুষের মনে প্রেরণা ও প্রাণে শান্তি দেবার জন্যে। স্বামী অভেদানন্দকে দার্শনিক বোলে গণ্য করি আমরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোরে, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানী ও ধ্যানী, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন তাই দর্শনের চরমসত্যকে মরমী দ্রষ্টার মতো পরিপূর্ণভাবে। বাল্যে তাঁর বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞানের অনুরাগ, আকুলতা, কৈশরে যুগনায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে আত্মসমর্পণ, যৌবনে ধ্যান, ভজন ও তীব্র তপস্যার আলোকে জীবন-সমস্যার চিরসমাধান ও অখণ্ডের অনুভূতি লাভ, পরিব্রাজক জীবনে আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ ও কৃচ্ছ্রসাধন, আচার্যদেবের সার্বভৌমিক বাণী বহন কোরে বেদান্তের ও প্রাচ্যের সুমহান আদর্শ প্রচারের জন্যে সুদূর পাশ্চাত্যে গমন ও সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেদেশে প্রচার ও সংগঠন-কার্যে অতিবাহিত করা প্রভৃতি অফুরন্ত কর্ম ও ত্যাগপ্রদীপ্ত জীবন সত্যই আদর্শ স্থানীয়। বিশ্বকল্যাণের জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল তাঁর শরীর ও মন। দর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদিত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের জীবনে, আর তাই তাঁর "গ্রেট সেভিয়ার্স অব দি ওয়ার্ল্ড' বইয়ে সুস্পষ্টভাবে স্বীকারও করেছেন: "যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর যে, আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি কিনা, তবে আমি বলব: যে ঈশ্বরের পুত্রকে দর্শন করেছে, সে ঈশ্বরকেই দর্শন করেছে। বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে (ভগবানের সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) দর্শন করেছি, সুতরাং একথা সত্যি যে, আমি স্বয়ং ভগবানকেই দেখেছি।"[৬] তাঁর 'সেল্‌ফ-নলেজ' বইয়ের গোড়াকার দিকে

৬। "If you ask me whether I have seen God, I will answer, 'He that hath seen the son hath also seen the Father? The latest manifestation of Divinity was in the from of Bhagavan Sri Ramakrishna. Him I have seen, therefore I have seen God and through Him I have realized * * ."—'গ্রেট সেভিয়ার্স অব দি ওয়ার্ল্ড' (১৯২৯), পৃঃ ৬৯

তাঁর পরমারাধ্য আচার্যদেবকে বইটিকে উৎসর্গ করার সময়ে তিনি আবার বলেছেন: "যার করুণায় আত্মজ্ঞানরূপ পরমাশির্বাদ আমি লাভ করেছি সেই পরমারাধ্য গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পাদপদ্মে এই বই উৎসর্গ করলাম।"[৭] এথেকে স্বামী অভেদানন্দের জীবন যে দর্শনের চরম-তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত হোয়েছিল একথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়।

ভারতবর্ষে সত্যিকার দার্শনিক কে—এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ নিজেই বলেছেন: "ভারতবর্ষে যথার্থ দার্শনিক কেবল পুস্তকের জ্ঞানেই আবদ্ধ ও সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁর জীবন অধ্যাত্ম-সাধনা ও দিব্য-অনুভূতিতে থাকে পরিপূর্ণ। যে সমস্ত ধর্মের ও শাস্ত্রের মতবাদ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কার্যকরী ও ব্যবহার উপযোগী করা যাবে না, সেগুলিকে তিনি বিশ্বাস করেন না। মোটকথা তিনি যা বিশ্বাস করেন তা তাঁর নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেন।"[৮] তিনি আরো বলেছেন: "ভারতবর্ষে যদি কেউ কতকগুলি বই লেখেন অথচ সাংসারিক জীবনও যাপন করেন তবে তিনি কখনই সত্যিকারের একজন দার্শনিকরূপে পরিচিত হোতে পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্যে কোন লোক যদি গ্রন্থাগারে অসংখ্য পুস্তক পাঠ ও গ্রন্থ রচনা করেন, তবে অধ্যাত্মজীবন যাপন না করলেও তিনি যথার্থ একজন দার্শনিক বোলে পরিচিত হোতে পারেন।"

তথাকথিত দার্শনিক ও সত্যিকারের দার্শনিক এ দুয়ের যে পরিচয় দিয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ

৭। "To the lotus Feet of Bhagavan Sri Ramakrishna, My Divine Guru by whose grace the bliss of Self-knowledge is realized." এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে আমরা পাই: শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী অভেদানন্দকে তাঁর সাধনার সময়ে বলেছিলেন: 'এবার তুই অখণ্ডের ঘরে উঠ্‌লি, তোর বৈকুণ্ঠ (ব্রহ্ম) দর্শন হোয়ে গেল', 'তোরা হোমা পাখীর দল' প্রভৃতি।

৮। অভেদানন্দ: 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড্‌ হার পিপ্‌ল,', পৃঃ ৪৩

৯। এসম্বন্ধে আর একটি বিষয়ে অধ্যাপক ফার্মের মন্তব্য এখানে মনে পড়ে। অধ্যাপক ফার্ম তাঁর "ফার্ষ্ট এ্যাডভেনচারস্‌ ইন্‌ ফিলজফি" (১৯৩৬) বইয়ে (পৃঃ ১৩-১৯) 'হু আর দি ফিলজফার্স' প্রসঙ্গে প্রচারকদেরও দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্য কবিরাও দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্গত। দার্শনিক কোল্‌রিজ্‌ও বলেছেন: "No man was ever yet a great poet without being at the same time a great philosopher." এদিক থেকে পাশ্চাত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কিট্‌স, মিলটন, ব্রাউনিঙ্‌, দান্তে, টেনিসান ও প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ও সুফীসম্প্রদায়ের হাফিজ, জলালুদ্দীন রুমী প্রভৃতি কবি ও মরমীদের নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ফার্ম বলেছেন: "Preachers are philosophers. When the man of the pulpit urges his hearers to forsake the broad way that leadeth to destruction for the narrow way that leadeth to life, he has made an evaluation of human pathways that reach, so he suggests, into the very portals of eternity. Whether or not his philosophy is good or bad, consistent or inconsistent, need not here concern us; the very fact that he sets forth an interpretation makes him a philosopher." তবে এই প্রচারক অথবা ধর্মপ্রচারকের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তাই স্বামী অভেদানন্দ সে প্রসঙ্গে বলেছেন: "A preacher of the universal religion is one who has seen God and who has realized divinity in all of those who are worshiped as the Incarnations of God and the Saviours of the world" (—'গ্রেট সেভিয়ার্স অব দি ওয়ার্ল্ড', পৃঃ ২৮—৩০)। প্রাচ্যের

তাদের মধ্যে শেষ পর্যায়েরই তিনি হবেন অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রকৃত দার্শনিকের মধ্যে থাকে চিন্তাধারার অভিনবত্ব ও স্বাধীনতা, সৃষ্টি করেন তিনি দর্শন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, জীবন তাঁর হয় মৌলিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, সমন্তরাল হয় তাঁর চিন্তা ও কাজ, নিজের জীবনের আদর্শ ও উপলব্ধি দিয়ে প্রচার করেন তিনি তাঁর প্রাণবান দর্শন যা প্রত্যক্ষ প্রেরণা দিয়ে মানুষের মনে আনে নবজাগরণ ও মহামুক্তির আকুলতা। আরিষ্টোটেল ও প্লেটোর অভিমতও তাই। স্বামী অভেদানন্দের চিন্তারাশির মধ্যে পাওয়া যায় গতিরুচ্ছলতার সঙ্গে গাম্ভির্য ও সাবলীলতা, লেখার স্বচ্ছ সরল ভাব ও মাধুর্য পাঠকের মর্ম স্পর্শ কোরে আনে সত্যের প্রতি আকৃতি, তীক্ষ্ণতার মধ্যে প্রসন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি কোরে পাঠকের মানসিক দৃষ্টিকে করে অনন্তপ্রসারী। স্বামী অভেদানন্দ নিজে পরিপূর্ণভাবে অধ্যাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি কোরেছিলেন বোলে সকল-কিছু বোঝাবার ভাব ও ভঙ্গীর ভেতরে ছিল না এতটুকুও জটিলতা ও কাঠিন্যের পরিচয়, ভাষার মধ্যে ছিল না জড়তা ও না-বোঝার ভাব, অথচ বিষয়বস্তু ছিল সুগভীর অন্তস্থলস্পর্শী। প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসা ও অনুশীলন তিনি করেছেন নিজেরই মেধা, বুদ্ধি ও বোধির প্রোজ্জ্বল আলোকে। সত্যের পরিচয়-দানের ভঙ্গী ছিল তাঁর এতই চাক্ষুষ ও যুক্তিপ্রদ যে, মনীষী সি. ই. এম. জোড (C.E.M. Joad) 'কন্‌টেম্‌পোরারি ইণ্ডিয়ান্ ফিলজফি' (১৯৩৬) বইখানিতে প্রকাশিত অভেদানন্দের লেখা 'হিন্দু ফিলজফি ইন্ ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধটি সমালোচনা করতে গিয়ে 'দি আরিয়ান্ পাথ' ইংরেজী পত্রিকা-খানিতে [১০] উল্লেখ করেছেন :

"What strikes me most forcibly about these modern exponents of the secular tradition of Indian philosophy is their unanimity. It is not merely that they all accept the same tradition : broadly speaking, they all subscribe to the same philosophical truth. What is this truth ? The clearest exposition of it is perhaps that contained in the contribution of Swami Abhedananda, the President of the Ramakrishna Vedanta Society[১১] in Calcutta.

আসলে সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ পরিপূর্ণভাবে—'আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠম্,' আর সেই উপলব্ধ সত্যকে সাধারণ সত্যানুসন্ধিৎসুর দরবারে অকাতরে বিতরণ করতেও তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। দর্শন ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক দুরকম প্রকাশ নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বময় জীবনে একাধারে গাম্ভির্য ও প্রসন্নতা এই উভয় ভাব ও প্রকৃতিকে সৃষ্টি কোরে। সুতরাং

আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ স্বামী অভেদানন্দের উদ্দেশ্য ছিল : প্রচারক অথবা ধর্মপ্রচারক প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞান থাকা দরকার। স্বামী অভেদানন্দের নিজের জীবনও ছিল প্রত্যক্ষ আত্ম-উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ এবং বিদেশে ধর্ম ও প্রাচ্য আদর্শের প্রচারক-রূপে তিনি ছিলেন আনন্দময় দিব্য-অনুভূতির প্রেরণা ও উন্মাদনা নিয়ে, আর এদিক থেকে তিনি যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

১০। ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭, পৃ: ৮২—৮৫

১১। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গীকৃত হোয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

সত্যিকার দার্শনিক বোলে স্বামী অভেদানন্দকে যে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্মান দান করব এতে আর বৈচিত্র্য কি? দর্শন কেবলই মনের খোরাক নয়, প্রাণেরও খোরাক, বরং মনের চেয়ে প্রাণের সঙ্গেই পরিচয় এর বেশী। স্বামী অভেদানন্দ দর্শনকে করেছিলেন প্রাণেরই বিষয়, প্রাণেই দর্শনের করেছিলেন প্রতিষ্ঠা, অথচ মনের সঙ্গে প্রাণের তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল না এতটুকুও, মিতালী পাতিয়েছিলেন তিনি মন ও প্রাণের সঙ্গে, তাই দর্শনও মূর্তিমান হোয়েছিল তাঁর সাধন ও সত্যনিষ্ঠ জীবনে, জীবন্ত হোয়েছিল তাঁর প্রাণের দেবতা। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রদীপ্ত বোধির সহমিলনে তিনি ব্যবহারিক বাস্তব জীবনেও যেমন ছিলেন কর্ম্মশক্তির মূর্ত বিগ্রহ, ধ্যান সমাহিত ও ব্রহ্মনিষ্ঠও ছিলেন তেমনি অধ্যাত্ম জীবনে সকল বন্ধন, সকল মোহ-মলিনতাকে ধুয়ে ফেলে। পৃথিবীর সঙ্গে ছিল তাঁর সম্পর্ক প্রেমের, নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়েই তিনি আপন করেছিলেন বিশ্বের সকল প্রাণীকে, অথচ মায়া ও আমিত্বের এতটুকু ছায়াও স্পর্শ করেনি তাঁর নিরাসক্ত মনকে, কামনার জগতে থেকেও নিষ্কাম ও নির্বাসন ছিল তাঁর জীবন। জ্ঞানের তিনি ছিলেন যেন প্রশান্তমহাসাগর, কর্মের ছিলেন অফুরন্ত উৎস, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার ছিলেন তিনি প্রদীপ্ত ভাস্কর। ইংলাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে থাকার ও ভ্রমণের সময়ে যে সকল প্রখ্যাতনামা মনীষী ও অধ্যাপকদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন সকলেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রখর প্রজ্ঞার পরিচয় লাভ কোরে হয়েছিলেন বিস্মিত। আমেরিকার স্যার উইলিয়াম জেমস্, ডাঃ হিবার নিউটন, উইলিয়াম জ্যাক্সান, অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস, অধ্যাপক হাউইসন, অধ্যাপক হিস্‌লপ্ আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন, অধ্যাপক হার্সেল সি. পার্কার, অধ্যাপক ল্যানম্যান, অধ্যাপক মোক্ষ মূলার প্রভৃতি লণ্ডন, কলম্বিয়া, হার্বার্ড, ইয়েল, কর্ণওয়েল, বার্কলে ও ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যথার্থ বিদ্যানুরাগীরা স্বামী অভেদানন্দের বহুমুখী প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও দার্শনিক যুক্তিপ্রণালী লক্ষ্য কোরে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। সকল রকম পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গভীর ও প্রগাঢ় আত্মানুভূতিই তাঁকে যথার্থ দার্শনিক, যথার্থ সাধক, যথার্থ সমাজ-সংস্করক ও যথার্থ প্রেমিক সন্ন্যাসীরূপে বিশ্বের দরবারে সুপরিচিত ও মহিমান্বিত করেছিল।

—তৃতীয় আলোচনা—

স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী

কোন মানুষকে চিনতে, বুঝতে বা ধরতে গেলে যেমন তাঁর চিন্তাধারাকেই (আইডিয়াজ্) প্রথমে বোঝা উচিত, তেমনি কোন দার্শনিকের বা মরমী সাধকের লেখা ও ভাব জানতে ও বুঝতে হোলে তাঁর দার্শনিক মতবাদ ও বিশেষ কোরে দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হোতে হবে। চিন্তা বা ভাবধারাই মানুষের যথার্থ ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি ও আন্তর রূপের পরিচয় দান করে। মানুষের শরীর বা রক্ত, মাংস, সৌন্দর্য সবই বাইরের উপকরণ ও আবরণ মাত্র, মন বা আন্তর বিকাশই আসলে তার মহিমা ও সত্যিকারের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। গ্রীক দার্শনিকদের মুকুটমনি প্লেটোর অভিমতও তাই। প্লেটোও 'আইডিয়াজ্' বা ভাবকেই দিয়েছেন সত্যিকার সম্মান, অন্তরই নাম-রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশ পায় বাইরে বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ কোরে। স্বামী অভেদানন্দের মতবাদ ও লেখা বুঝতে হোলে তাই পরিচিত হোতে হবে তাঁর আন্তর ভাবধারার ও বিশেষ কোরে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, কেননা একথা অতি সত্য যে, বাহ্যিক সকল ঘটনার সমাবেশ, প্রমাণপঞ্জী, জন্ম ও জীবনের বর্ষ-তারিখই একটি মানুষকে জানিয়ে দেবার পক্ষে সব-কিছু নয়, বরং সত্যিকার পরিচিতি দানের পক্ষে সেগুলি নগণ্য ও অপ্রয়োজনীয়ই।

আমরা স্বামী অভেদানন্দের জীবনের বিচিত্র ঘটনার সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করে তাঁর সুমহান চরিত্র ও বিরাট ব্যক্তিত্বকে আংশিকভাবে মাত্র। আসলে তাঁর লেখা বই তাঁরই বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারার প্রকাশক। মন করে চিন্তা ও সেই চিন্তার শক্তিতরঙ্গই হাতের পেশী ও শিরাগুলিকে সবল ও সচল কোরে কালি-কলমের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় বাইরে অক্ষর ও লেখার আকারে। তাই লেখা চিন্তারই বাস্তব রূপায়ণ মাত্র। লেখকের মনের তথা চিন্তার সচলতা ও সবলতা সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিমর্ষ, উৎসাহ-নিরুৎসাহ ও প্রেরণা এই সকল-কিছু ভাব ও রসের সৃষ্টি কোরে লেখার মধ্যে দিয়ে পায় প্রকাশ, আর সেই লেখা পাঠ করার অর্থই: পাঠক তাঁর নিজের মন ও চিন্তাধারাকে গ্রথিত করেন একই সূত্রে লেখকের মন ও চিন্তাস্রোতের সঙ্গে; অর্থাৎ পাঠক তাঁর চিন্তাতরঙ্গকে ক্রিয়াশীল ও সচল করেন লেখকেরই চিন্তা ও কল্পনার সুরে। যেমন অসংখ্য বীণার তারগুলি যদি সমান সুরে থাকে বাঁধা, তবে একটি তারে আঘাত দিলে সকল বীণার তারই একসঙ্গে বেজে ওঠে—একই সঙ্গে একই সুরে। কিন্তু এতো গেল লেখকের লেখা বা রচনার রসানুভূতিকরণ পাঠকের মনে। কিন্তু লেখার মধ্যে রস ও ভাব ছাড়া থাকে আর একটি জিনিস যা লেখকের চিন্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীই দেয় চিন্তার স্বরূপের সত্যিকারের পরিচয়। অথবা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীই পাঠকের বোঝা ও জানার ক্ষেত্রে কাজ করে দীপশিখার মতো: দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে স্বচ্ছ ও প্রদীপ্ত হোয়ে ওঠে লেখার

রহস্য ও মর্মকথা। তাই স্বামী অভেদানন্দের লেখা ও মনোভাব তথা মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হোতে গেলে উচিত পরিচিৎ হওয়া তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, কেননা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক না পাতিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব, ধর্ম ও দর্শনের মর্মকথা জানতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

মানুষমাত্রেরই আছে নিজস্ব একটি দর্শন আর এই নিজস্বতার জগতে প্রত্যেক মানুষই তাই বড়। চিন্তাজীবি মানুষ চিন্তার জগতেই করে বাস, বাইরের কর্মপ্রচেষ্টা তার অন্তর্জগৎ তথা চিন্তারই বহির্বিকাশমাত্র। নিজের নিজের চিন্তাক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষই আবার স্বাধীন, স্বাধীন মতবাদ ব্যক্ত করবারও তার তাই আছে পূর্ণ অধিকার। এই অধিকার আছে বোলেই একটি মানুষ অপরটি থেকে হয় পৃথক, চিন্তার বৈশিষ্ট্যই একজনকে করে অপর থেকে আলাদা। সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও সৃষ্টি হয়েছে ঠিক এই রকম ভাবেই। যে যার বিশিষ্ট ও মৌলিক চিন্তাধারা নিয়েই গড়ে তোলে তার দর্শন। এই বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতাই প্রত্যেকের চিন্তাক্ষেত্রে রচনা করে আবার দৃষ্টিভঙ্গী আর এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই মানুষের স্বাতন্ত্র্যের ও নিজস্বতার করা যায় পরিমাপ।

পার্থিব জগতে মানুষের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর নির্ণয় করতে যাওয়ার অর্থই সেই মানুষ বাস্তব পদার্থ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, অনুভূতি, নৈতিকতা, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে কি রকম ধারণা পোষণ করেন তারই নির্ধারণ করা। প্রথমে তাই পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের অভিমত ও সিদ্ধান্ত কি—সে বিষয়েই আমরা সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করব ও তা থেকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কি আমরা অবশ্যই জানতে পারব।

বাইরের জগতের জ্ঞান আমরা ক্যামন কোরে লাভ করি, পার্থিব বিষয়ের অনুভূতি হয় আমাদের কি মনোবৈজ্ঞানিকী নীতি ও ধারাকে অবলম্বন কোরে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "জ্ঞান বা জানা বলতে বোঝায় প্রত্যভিজ্ঞান বা পুনরায় জানা" ('knowledge or awareness means *recognition*')। মানুষ কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে—তার কারণ সেই মানুষের আন্তর চেতনা বিষয়-চৈতন্যের সঙ্গে পাতায় মিতালী আর সেই অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রই আমাদের বিষয়ের বাস্তব অনুভূতির ক্ষেত্রে আনে চেতনা বা সাড়া। তাই পেতে গেলে পার্থিব সব-কিছু বিষয়েরই জ্ঞান সেই জিনিস যদি মনের আসনকে আমাদের অধিকার কোরে না বসে তবে কখনই তার পরিচিতি লাভ করতে আমরা পারি না। এজন্যে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "বিষয়ী বিষয়-বস্তুকে জানে, কেননা বিষয়ী কর্তা বিষয়রূপ কার্য থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। * * * জানবার বিষয়টি যতক্ষণ না আমাদের মনের কোনে আসন পেতে না বসছে ততক্ষণ তার জ্ঞান মোটেই হয় না।"[১২] তিনি আবার তাঁর "মিষ্ট্রি অব ডেথ" বইয়ে (মৃত্যুরহস্য বা কঠোপনিষৎ-বক্তৃতায়) উল্লেখ করেছেন: "আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, বই পড়ে ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বা ইন্দ্রিয়সংযোগের সাহায্য নিয়ে আমরা বাইরের জগৎ থেকে জ্ঞান লাভ করি, জ্ঞান সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই আসে; কিন্তু একথা ঠিক নয়, কেননা কোন জিনিষের জ্ঞান কখনও বাইরে থেকে আসে না, জ্ঞান সর্বদা ভেতর থেকেই উৎপন্ন হয়। কোন জ্ঞানই

১২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১৫

বাইরে থেকে আমরা অর্জন করি না, বাইরের জগৎ বস্তু বা বিষয়ের ধারণা আমাদের মনের মধ্যেই সৃষ্টি করে, তারই ফল বা প্রতিক্রিয়া হিসাবে জ্ঞান সৃষ্টি হয় আমাদের মনে, আর তখনই জ্ঞান বা অনুভূতি হয় বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধে। বস্তুর জ্ঞান লাভ করার উপায়ই এই।"

মোটকথা স্বামী অভেদানন্দের মতে জ্ঞান সম্পূর্ণ আন্তর বা মনের জিনিস। যে বিষয়ের জ্ঞান সৃষ্টি হয়, আসলে তার সংস্কার থাকে আমাদের মনের অবচেতন স্তরে। সেই বিষয়রূপী সংস্কারের সঙ্গে যখনই জ্ঞানলিপ্সু আমাদের মনের হয় মিলন তখনই তা প্রকাশ পায় বাইরে (বাহ্যজগতে) বিষয়-জ্ঞানের আকারে। মনীষী হোয়াইটহেড এই বিষয়-জ্ঞানের নাম দিয়েছেন 'রেকগ্নিসন্' বা প্রত্যভিজ্ঞান। অবশ্য এই প্রত্যভিজ্ঞান ঠিক ব্রহ্মবিজ্ঞান নয়, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানমাত্র যাকে কাণ্ট বলেছেন 'ইন্টুইসন্' বা 'সেন্সিবিলিটি' (intuition or sensibility)। বৈজ্ঞানিক হোয়াইটহেড উল্লেখ করেছেন: "কোন বিষয়কে জানা একটি প্রণালী-বিশেষ বা অবস্থামাত্র * *। এর নাম আমি বলি প্রত্যভিজ্ঞান। প্রত্যভিজ্ঞানের অপর নাম (বিষয় ও বিষয়ীর) একত্ব-জ্ঞান।"[১৩] বিষয়ের এই প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের অভিমত অনেকটা অধ্যাপক হোয়াইটহেডের মতো; যেমন অভেদানন্দ বলেছেন: "জ্ঞান অর্থে প্রত্যভিজ্ঞান" ('consciousness means *recognition*')।[১৪] তবে অভেদানন্দ ও হোয়াইটহেড এ দু'জনের প্রত্যভিজ্ঞান দুটির ভেতর প্রার্থক্য হোল: বিষয়ের জ্ঞান হোতে গেলে অভেদানন্দ যেখানে প্রত্যভিজ্ঞানধারার মধ্যে বৌদ্ধিক সম্পর্কের ('intellectual relation') প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, হোয়াইটহেড সেখানে বুদ্ধির সকল রকম সম্বন্ধ বাদ দিয়েই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কথা মেনে নিয়েছেন। হোয়াইটহেড বলেছেন: "আমি 'প্রত্যভিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে কোন বৌদ্ধিক সম্পর্কের বালাই না রেখে, অথচ এই ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনোজগতেই উৎপন্ন হয় জ্ঞান ও মনের মধ্যে কোন-কিছু ব্যবধানের ভাব না রেখে।"[১৫] মনোবিশ্লেষক ডাঃ সি. জে. ইয়ুঙও জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার মধ্যে 'জানা' ও 'প্রত্যভিজ্ঞান'—দুটি বিকাশের কথা স্বীকার করেছেন।[১৬] অবশ্য জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার কোরেই তিনি একথা বলেছেন, আর এ থেকে প্রত্যভিজ্ঞানকে তিনি যে জ্ঞানের তথা প্রত্যক্ষজ্ঞানের পর্যায়েও ফেল্‌তে চান নি একথাই বোঝা যায়। তবে স্বামী অভেদানন্দ আবার যেখানে প্রত্যভিজ্ঞান বল্‌তে 'কন্‌সাস্‌নেস্' বা চৈতন্য বল্‌তে চেয়েছেন সেখানে প্রত্যভিজ্ঞানকে

১৩। "The awareness of an object as some factor * * is what I call 'recognition.' * * Recognition is an awareness of sameness."—'দি কন্‌সেপ্ট্ অব নেচার' (১৯৩০) পৃঃ ১৪৩, ১৮৯

১৪। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ৩৮

১৫। "I use recognition for the non-intellectual relation of sense-awareness which connects the mind with a factor of nature without passage."—দি কন্‌সেপ্ট্ অব নেচার,' পৃঃ ১৪৩

১৬। ডাঃ ইয়ুঙ: 'মডার্ণ ম্যান ইন্ সার্চ অব সোল' (১৯৪৫), পৃঃ ১১২-১১৩

তিনি বলেছেন প্রাথমিক বা নির্বিকল্পক জ্ঞান—"It is knowledge of a primary kind."[১৭] সুতরাং এই জ্ঞানে বৌদ্ধিক কোন সম্পর্ক থাকার প্রয়োজন নাই।

স্বামী অভেদানন্দ বিষয় বা বস্তুর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ আন্তর (mental) বলেছেন, অর্থাৎ যা মনের অজ্ঞাত বা অবচেতন স্তরে অস্ফুট অব্যক্ত আকারে থাকে লুকিয়ে তাই প্রকাশ পায় চেতন স্তরে বাইরের জগতে আন্তর-বাহ্যপ্রণালীর (physico-chemical process) ভেতর দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের মতেও জ্ঞান তথা প্রত্যক্ষজ্ঞান আন্তর প্রণালীর অন্তর্গত। যেমন 'যৌগিক সাধনা' (পৃঃ ২০-২১) ইংরেজী বইয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: 'নলেজ' (জ্ঞান) অর্থে 'এ্যাওয়ারনেস্' (awareness—জানা) ও যে-কোন জিনিসকে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানক্ষেত্রের বা চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত করা বোঝায় ("taking a thing into active consciousness, into our *Chaitanyam*")। মোটকথা বিষয়ের গ্রহণকে ('taking a thing') শ্রীঅরবিন্দ বাইরের জগৎ থেকে গ্রহণ করার কথা বলেন নি, বলেছেন ভেতর থেকে কিনা চৈতন্য থেকে; সুতরাং জ্ঞানপ্রণালীটি তাঁর মতে আন্তর, মোটেই বাহ্য নয়। ইংরেজ নব্যবস্তুতন্ত্রবাদী (neo-realist) এস. আলেকজাণ্ডার আন্তরসত্তাবাদ (idealism) স্বীকার না করলেও জ্ঞান বা জানা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: জ্ঞান ও জানার প্রণালীটি বস্তুত একই—"I am mind and am conscious of the object".[১৮] স্বামী বিবেকানন্দও স্বামী অভেদানন্দের মতো প্রত্যক্ষজ্ঞানের আন্তর-বাহ্যপ্রণালী (physico-chemical process) স্বীকার করেন, কেননা তাঁর মতেও জ্ঞান বলতে 'অবজেক্‌টিফিকেসান্' বা বহিরভিব্যক্তি। তিনি বলেছেন: "স্মৃতিতে (মনে) তোমরা অনেক জিনিসকেই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত করো ও সেগুলিকে আবার বাইরের জগতে প্রতিফলিত করো। সকল রকমের স্মৃতি বা সংস্কার, সকল জিনিস যা আমরা দেখি, আর যে সমস্ত বিষয় আমাদের মনের মধ্যে থাকে লুকিয়ে সেই সবগুলিকেই যখন আমি চিন্তা করতে চেষ্টা করি বা তাদের জানতে চাই তখনই জানার প্রথম কাজ হবে—মনের সেই সংস্কাররূপী বিষয়গুলিকে বাইরের জগতে বিকশিত করা।"[১৯]

স্বামী অভেদানন্দও তাঁর ইংরেজী "আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট" বইয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছেন: (১) "বাইরের জিনিসের সঙ্গে মনের

১৭। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ৩৪

১৮। আলেকজাণ্ডার: 'স্পেস্ টাইম এ্যাণ্ড ডিটি,' প্রথম ভাগ, (ভূমিকা) পৃঃ ১৫
অবশ্য আলেকজাণ্ডার বিষয় থেকে মনকে স্পষ্টভাবে আলাদাই বলেছেন, কেননা তিনি স্বীকার করেছেন যে, কোন বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করার অর্থই সেই বস্তুকে সামনে উপস্থিত করা যা মনের প্রতিচ্ছবি নয়, কিন্তু বাইরেরই স্বতন্ত্র একটি সত্তা।

১৯। "* * in memory you are objectifying many things projecting them of yourself. All memory, all the things which I have seen and which are in my mind, and when I would try to think of them, to know them, the first act of knowledge would be to project them outside."—'কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ,' ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৪

সম্বন্ধ হোলেই আমাদের হয় প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই মন আসলে কর্তা ও কর্ম—বিষয় বিষয়ী দুইই" (পৃঃ ৮); (২) "ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে আমাদের জ্ঞেয় বা বিষয়রূপী মন বাইরের জগৎ থেকে সকল মালমসলা সংগ্রহ কোরে জ্ঞাতা বা বিষয়ীরূপী মনের কাছে তা করে প্রকাশ" (পৃঃ ৯); (৩) "আমাদের মন ক্রিয়াশীল কতকগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টি; * * * সেগুলি বাইরের জগৎ থেকে সংবেদনের প্রেরণা পেয়ে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা তরঙ্গের আকারে হয় বিস্তৃত"। 'ডক্‌ট্রিন অব কর্ম' বা 'কর্মবিজ্ঞান' পুস্তকে (পৃঃ ৫৮, ১৩০) স্বামী অভেদানন্দ বস্তুর শব্দ বা বর্ণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "শব্দ বা বর্ণের প্রকৃতি-বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, শব্দ বায়ুতরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঐ শব্দতরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে হয় প্রেরিত এবং সেখানেই আমরা করি সংবেদনের অনুভব। এই সংবেদন যখন বাইরের জগতে হয় বিস্তৃত তখনই তাকে জড় শব্দ বোলে আমরা পারি জানতে। সেরকম দেখানো যেতে পারে, যে বর্ণ আমরা করি প্রত্যক্ষ তা প্রকৃতপক্ষে বস্তুতে অথবা বস্তু থেকে নির্গত জোতিস্তরঙ্গে থাকে না, নির্দিষ্ট পরিমান কম্পনবিশিষ্ট ইথার-তরঙ্গের দ্বারাই হয় সে বর্ণের সৃষ্টি। ঐ কম্পনযুক্ত ইথার-তরঙ্গই অক্ষিগোলক ও রূপবহা স্নায়ু বা নাড়ীর (optic nerve) সংস্পর্শে এসে সৃষ্টি করে একরকম উত্তেজনা যার জন্যে লাভ করি আমরা মস্তিষ্কে বর্ণ-সম্বন্ধে সংবেদন বা অনুভূতি।[২০] এই সংবেদনগুলিকে আমাদের দেহের বাইরে বিস্তৃত কোরে যখন দূরবর্তী বস্তুতে করি সন্নিবেশ তখনই আমরা বলি যে, 'এই বা সেই বর্ণ আমরা দেখছি'।" এ ছাড়া "সেলফ্-নলেজ' বা 'আত্মজ্ঞান' পুস্তকে (পৃঃ ৫) স্বামী অভেদানন্দ আবার উল্লেখ করেছেন: "মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলেন: ফুলে যে রঙ্ আমরা প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতপক্ষে তা সেভাবে ফুলের মধ্যে থাকে না, রঙ্ এক ধরণের কম্পন-তরঙ্গের দ্বারা ও রূপবহা নাড়ীর সাহায্যে আনীত সংবেদন (sensation) বিশেষ। * * বর্ণের প্রত্যক্ষ ইথার-তরঙ্গের দ্বারা উৎপন্ন একটি মিশ্র ফল ছাড়া অন্য কিছু নয়। আসলে ঐ ইথার-তরঙ্গ চক্ষুর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ কোরে যখন চৈতন্যসত্তারূপ জ্ঞাতার কাছে এসে হয় উপস্থিত তখনই তাকে আমরা বলি 'সংবেদন'। সুতরাং বর্ণকে বাহ্য ও আন্তর এই দুরকম মনেরই ফলস্বরূপ বলা যায়।" এই রকম 'আওয়ার রিলেসন টু দি এ্যাবসলিউট' বইয়ে (পৃঃ ১৬৬) তিনি আবার লিখেছেন: "একটি চেয়ারের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কেবল চেয়ারের ওপর

২০। এছাড়া স্বামী অভেদানন্দ একটি চেয়ারের প্রত্যক্ষ বা সংবেদন সম্বন্ধেও বলেছেন: "If we analyze that *perception* we can only receive a reflection of the light falling on the chair, which produce an inverted image upon the retinea, and that is carried by the optic nerve into the grey matter of the brain, and there it becomes a *sensation*."
—'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১৬৬

পতিত একটি আলোকের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাব না; এই আলোর প্রতিবিম্বই সৃষ্টি করে, অক্ষিগোলকের ওপর বিপরীত একটি প্রতিকৃতি (image), সেই প্রতিকৃতিই রূপবহা নাড়ী দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে ধূসরবর্ণ পদার্থের (grey matter) মধ্যে হয় আনীত আর তখনই তা ধারণ করে সংবেদন বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের আকার।"

আসলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বেলায় সর্বদাই আন্তর-বাহ্য-প্রণালীর (physico-chemical process) হয় প্রয়োজন। অধ্যাপক মিল, ম্যাকডুগাল,[২১] উড্‌ওয়ার্থ ও অন্যান্য মনোবৈজ্ঞানিকেরাও এইভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি-প্রণালী স্বীকার করেন। অধ্যাপকদ্বয় ড্রমন্ ও মেলোনও প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই প্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন।[২২] অধ্যাপক ম্যাকডুগাল স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞান বা সংবেদন সম্বন্ধে বলেছেন: "এরকম সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা থেকে উৎপন্ন অনুভূতি বা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অংশ বা গুণ (sensory quality) স্বরূপত বাহ্যবস্তু নয়, তা বাহ্যবস্তুর একটি লক্ষণ বা চিহ্ন অথবা বস্তু-বিষয়ে চিন্তার একটি সুযোগ বা কারণ মাত্র বলা যায়। এটি বস্তু বা বিষয়ের উপস্থিতির লক্ষণ-বিশেষ, অথবা এই লক্ষণ আমাদের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি করে বা এসম্বন্ধে চিন্তার বিষয়ে আমাদের নিয়োজিত করে।"[২৩] এই প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনি গুণগত, কালিক ও দৈশিক এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উপযোগীতা স্বীকার করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা বস্তুজ্ঞানের বেলায় পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকী নীতি অনুসরণ করলেও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর হুবহু পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতো নয়। প্রত্যক্ষ-

২১। প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন: "The perception of anything is only possible so long as that thing or energy radiating from it, affects some sense-organ and initiates in it a nervous current which transmits itself to the brain."—'আউটলাইন্ অব সাইকোলজি' (১৯৩৬), পৃঃ ২২২

২২। অধ্যাপকদ্বয় ড্রমণ্ড ও মেলোন বলেছেন: "The fundamental process in our apprehension of the material world present to us is called *Perception*; and *Perception*, in the simplest form in which we experience it, is called *Sensation*, * *. *Sensations* arise normally when a sense-organ is stimulated so as to give rise to nervous impulses propagated to the brain, and only when these have reached some part of the cortex does any kind of sensation arise" (Italics ours)—'এলিমেন্ট্‌স অব সাইকোলজি,' পৃঃ ২১৩-২১৪। এছাড়া উইলিয়াম্ জেমস্ প্রণীত 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব সাইকোলজি,' ২য় ভাগ, পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য।

২৩। "In all these cases the *sensory quality* of experience resulting from the sense-stimulation is clearly not the physical object itself but only a sign of it an occasion for our thinking of the object; it is sign of the presence of the object, a sign which may suggest it to the mind, or may set us thinking of it"—ম্যাক্‌ডুগাল: 'আউটলাইন অব সাইকোলজি,' পৃঃ ২২৬

জ্ঞানের সময়ে যখন তিনি বলেছেন: 'জ্ঞাতা জ্ঞেয়-বস্তুর জ্ঞান লাভ করে, কেননা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই' ('Subject recognizes object because the subject is one with the object' [২৪])। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-বস্তুর মধ্যে শুধু এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নয়, এই যে তাদাত্ম্যভাব, এ থেকে আমাদের মনে পড়ে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের কথা। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু তিনটির একত্র মিলনে। অদ্বৈতবেদান্তে প্রত্যক্ষপ্রমাণ এক অদ্বিতীয় চৈতন্যের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। যদিও আধার বা অবলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্যে একই চৈতন্যকে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, তবুও চৈতন্য এক ও অখণ্ডই। বেদান্তে বিষয়-চৈতন্যকে বলে প্রমেয় বা প্রমেয়চৈতন্য, অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতাচৈতন্য আর অন্তঃকরণের বৃত্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণচৈতন্য। বৃত্তি অন্তঃকরণেরই পরিণাম, অর্থাৎ অন্তঃকরণ যখন অচঞ্চল ও স্থির থাকে, কোন বস্তু বা বিষয়ের আকার ধারণ না করে তখনই তা তেজোস্বভাব মূল-অজ্ঞান ও শুদ্ধচৈতেন্যর সমষ্টিমাত্র—যাকে সগুণ ব্রহ্ম বোল্লেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু যখনই স্বচ্ছ প্রকাশশীল অন্তঃকরণ কোন বিষয়ের আকার ধারণ করে তখনই সেই পরিণতি বা বিকৃতিকে বলে 'বৃত্তি'। 'বেদান্তপরিভাষা'-য় ধর্মরাজ অধ্বরিন বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: কোন নদী বা পুষ্করিণীর জল যেমন কোন সংকীর্ণ নালা বা ছিদ্রপথ দিয়ে নির্দিষ্ট একটি চারকোণযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ কোরে ক্ষেত্রের আকারই ধারণ করে তেমনি তেজোময় অন্তঃকরণও চক্ষুদ্বার দিয়ে নির্গত হোয়ে ঘট প্রভৃতি বিষয়কে আশ্রয় (আবৃত) কোরে ঠিক ঘটেরই আকার ধারণ করে। এই আকার ধারণ করা-রূপ পরিণতির নামই 'বৃত্তি'।[২৫] বৃত্তি স্বরূপতঃ প্রকাশশীল অন্তঃকরণই। বৃত্তিতে থাকে অজ্ঞান ও নির্মল-চৈতন্য শিবশক্তির মতো চণকাকারে একীভূত হোয়ে; অজ্ঞান থাকার জন্যে অজ্ঞানের হয় পরিণাম বা বিকৃতি, তাকে বলি আকার আর চৈতন্যের জন্যে আকার বা বৃত্তি হয় তেজোময়: নিজেকে ও অপরকে উভয়কেই সেই চৈতন্য করে সমানভাবে প্রকাশ। কিন্তু অজ্ঞানেরই রূপায়ণ বোলে অন্তঃকরণ জড় অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। অন্তঃকরণ ধার করা জিনিস নিয়েই চেতন ও প্রকাশধর্মী, তাই তা চৈতন্য তথা শুদ্ধ-চৈতন্যের অধীন ও সাপেক্ষ (relative) বস্তুমাত্র, সুতরাং নিত্য বা নিরবচ্ছিন্ন সত্য হোতে পারে না, তা মিথ্যা বা শুদ্ধচৈতন্যসত্তা থেকে ভিন্ন।

প্রত্যক্ষ-বিষয়ে এক অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই হয় প্রমাতা (জ্ঞাতা), প্রমাণ (জ্ঞান) ও প্রমেয় (জ্ঞেয়বস্তু); একই চৈতন্য প্রকাশ বা উপাধির জন্যেই হয় ভিন্ন, কিন্তু তিনটির মধ্যে থাকে একই চৈতন্য। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সময়ে প্রমাতাচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ও প্রমেয়চৈতন্য (কর্তা, ক্রিয়া

২৪। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ৩৮

২৫। "তত্র যথা তড়াকোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তাবদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে।" —বেদান্তপরিভাষা (আড়েয়ার সংস্করণ, মহামহোপাধ্যায় সূর্য নারায়ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত), পৃঃ ১৩

ও কর্ম) এই তিনটিই একাকার হোয়ে যায় ; এই চৈতন্যের একাকার বা একীভূত অবস্থাতেই প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব হয়, অথবা বলা যায়—তিনটি উপাধিচৈতন্যের একীভূত হওয়ার নামই প্রত্যক্ষজ্ঞান। অজ্ঞাত বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় তখনই যখন অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়ের আকারে আকারিত হওয়া মাত্র বিষয়ে না-জানা-রূপ অজ্ঞান-অন্ধকার বৃত্তিগত চৈতন্যের আলোকে হয় বিদূরিত ও সঙ্গে সঙ্গে হয় বিষয়ও প্রকাশিত। সুতরাং প্রত্যক্ষ-বিষয়ে অজ্ঞান-নাশ ও বিষয়ের প্রকাশ এই দুটি কার্য একসঙ্গেই হয়। বেদান্তসারে সদানন্দ যতি তাই ঘটের প্রত্যক্ষ-ব্যাপারে বলেছেন : " 'অয়ং ঘটঃ' ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিঃ অজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদ্‌গতাজ্ঞাননিরসনপুরঃসরং স্বগত চিদাভাসেন জড়ম্ ঘটম্ অপি ভাসয়তি"।[২৬]

প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ে বিষয় ও বিষয়ীর যে একত্ব (sameness), অথবা স্বামী অভেদানন্দ যেমন বলেছেন : "জ্ঞাতা জ্ঞেয়-বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, কেননা জ্ঞাত ও জ্ঞেয়-বস্তু একই" (—"Subject recognizes object because the subject is one with the object")। এ থেকে একমাত্র চৈতন্য বা বিজ্ঞানের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয়। ইংরেজীতে একে 'সাব্‌জেকটিভ আইডিয়ালিজম্' (subjective idealism) বা বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদ বলে। 'সাব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিজম্'-এর অপর নাম 'মেটাফিজিক্যাল্ আইডিয়ালিজম্' (metaphysical idealism) বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদ। সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ প্রত্যক্ষজ্ঞানের যে লক্ষণ দিয়েছেন তা তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও সমর্থন করেন, কাজেই তিনি বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদী বা সাব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিষ্ট্। বিষয়-বিজ্ঞানবাদিদের সংখ্যা কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে বড় কম নয়। ভারতবর্ষে যোগাচারী বা মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা ও যোগবাশিষ্ঠমতবাদিরা বিশেষ কোরে বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদী এবং পাশ্চাত্যে বিশপ বার্কলে, মেলব্রোচ্ প্রভৃতিও ঐ মতবাদ বিশ্বাস করেন। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই : বিজ্ঞানই একমাত্র থাকে, বিকাশ-বৈচিত্র্য যা আমরা দেখি তা আন্তর বিজ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, বিজ্ঞানকে সহায় কোরেই তারা প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিলে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব মোটেই থাকে না। মোটকথা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষকারী জ্ঞাতা থেকে মোটেই ভিন্ন নয়, বরং জ্ঞাতাই নিজেকে নিজে প্রত্যক্ষ করে বলা যায়। বিশপ বার্কলের সিদ্ধান্তও তাই : 'এসি ইজ্ পারসিপাই' (*"essi is percipi*)। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মধ্যে নাগার্জুনকেই মাধ্যমিক মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। নাগার্জুন একমাত্র 'বিজ্ঞান' স্বীকার করলেও এই বিজ্ঞানকে তিনি ক্ষণিক অথচ নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য বলেছেন। এই আলয়-বিজ্ঞানের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও ধ্বংস হচ্ছে বোলে ক্ষণিক ; এক মুহূর্তও স্থির বা অচঞ্চল নয়। গ্রীক দার্শনিক পারমেনাইডেস ও হেরাক্লিটাস, জার্মাণ দার্শনিক হিউম ও ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ এই মতবাদ ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী (neo-realist) ইংরেজ দার্শনিক আলেকজাণ্ডারও অনেকটা এই রকমের ক্ষণিকবাদ

২৬। (১) মধুসূদন সরস্বতী : অদ্বৈতসিদ্ধি (নির্ণয়-সাগর সং), পৃঃ ২৩২ ; (২) ডাঃ দাশগুপ্ত : 'এ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান্ ফিলজফি,' ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৭২

স্বীকার করেন। কিন্তু তাহোলেও সকলেই এঁরা একই মতবাদে বিশ্বাসী নন। প্রাচ্যে *যোগাচারী বা মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও যোগবাশিষ্ঠমতানুবর্তীরা ও পাশ্চাত্যে বার্কলে প্রভৃতিই বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদ বা সাব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিজমের বিশেষ পক্ষপাতী। অবশ্য মাধ্যমিকদের ক্ষণিকতা তথা শূন্যতা ও হেরাক্লিটাস ও হিউমের সংস্কারের* (sensations) *ধারাবাহিকতা যথাক্রমে আচার্য শংকর ও ইমানুয়েল কাণ্টের যুক্তিতে খণ্ডিত হয়েছে। বৌদ্ধদের গতিচঞ্চল ধারাবাহিক বুদ্ধি বা* সংবেদনগুলির (sensations) মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন শংকর নিত্য অপরিনামী আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার কোরে। কাণ্টও তেমনি হেরাক্লিটাস ও হিউমের পরম্পরবিচ্ছিন্ন ভাবধারাগুলিকে (impressions) ঐক্যসূত্র গ্রথিত করেছেন চেতন 'ইগো' বা আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে। প্রাচ্যে শংকর ও পাশ্চাত্যে কাণ্ট উভয়েই বিষয়-বিজ্ঞানবাদী বা অব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিষ্ট, কেননা "অবজেক্‌ট' বা বিষয়-বস্তুরূপী জগতের অস্তিত্বকে ব্যবহারিক ভাবে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদ বা সাবজেক্‌টিভ আইডিয়ালিজমের পরিণতি বিজ্ঞানমাত্রবাদ বা 'সলিপসিজম্'। এই বিজ্ঞানমাত্রবাদ বা 'সলিপসিজম্'-এর মতে মন বা বিজ্ঞানের বাইরে বাহ্য-পার্থিব কোন-কিছু বস্তুরই একেবারে অস্তিত্ব নেই।

স্বামী অভেদানন্দ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রসঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-বস্তুকে অভিন্ন বোল্লেও বাহ্য-পার্থিব বস্তুর তথা জগতের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নি। এদিক থেকে তিনি বরং শংকর ও কাণ্টের মতবাদেরই অনুবর্তী, সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ বিষয়-বিজ্ঞানবাদ বা অব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ই সমর্থন করেন স্বীকার করতে হবে। তা ছাড়া একথা সত্যি যে, বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদিরা সম্পূর্ণরূপে প্রমাবিজ্ঞানপ্রণালী বা 'এপিস্‌টেমোলজিক্যাল প্রোসেস'-কে অনুসরণ করেন। প্রমাবিজ্ঞান ন্যায়ের কচ্‌কচি ও যুক্তি-বিচারেই পরিপূর্ণ। কেবলই ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিচারের আলোকে আত্মোপলব্ধি করার পক্ষপাতী স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন না, তাই তিনি কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দর্শনিকদের সিদ্ধান্তকে চরম-সিদ্ধান্তের দিক থেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করেছিলেন বিষয়-বিজ্ঞানবাদকে মেনে নিয়ে। অধ্যাপক প্রিঙ্‌গ্‌ল-প্যাটিসন (A. Seth Pringle-Pattison) প্রমুখ দার্শনিকেরা আবার একে ভাববাদ বা 'মেণ্টালিজম্' (mentalism) বলেছেন। অনেকে একে সংবেদনবাদ বা 'সেনসেসনালিজম্' (sensationalism)' বলেন। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ এসকল মতবাদের কোনটাই যে সমর্থন করেন না তা সহজেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, হেগেলের পরাবিজ্ঞানবাদ বা 'এ্যাবসোলিউট আইডিয়ালিজম্' (absolute idealism)-এরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে হেগেল কাণ্টের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী থাক্‌লেও কাণ্ট যেমন বৈচিত্র্য বা জগৎকে ঠিক পারমার্থিক সত্য বলতে পারেন নি, হেগেল ঠিক তার বিপরীত মতবাদে বিশ্বাস করেন। হেগেলের দৃষ্টিতে জগৎ যখন ব্রহ্ম বা এ্যাবসোলিউটেরই বিকাশ, জীব ও জগৎকে নিয়েই যখন এ্যাবসোলিউটের সার্থকতা, তখন জীব ও জগৎ উভয়েই সত্য, উভয়ের মধ্যে দিয়েই এ্যাবসোলিউট বা ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশিত হয়। হেগেলের মতবাদ অনেকটা রামানুজেরই মতো; রামানুজও জীব, জগৎ ও ব্রহ্মকে নিয়ে এক বিরাট কল্যাণময় ও পরমৈশ্বর্যবান ভগবানের রূপ কল্পনা করেছেন। সুতরাং হেগেল ও রামানুজের মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তথা দ্বৈতবাদেই পর্যবসিত হয়েছে বলতে হবে। স্বামী

অভেদানন্দ সেজন্যে হেগেল ও রামানুজের সঙ্গে একমত নন, কারণ পরাবিজ্ঞানবাদ তিনি স্বীকার করেন না। বস্তুতন্ত্রবাদী বা রিয়ালিষ্ট তিনি নন, কেননা বস্তুতন্ত্রবাদী হোলে জগতের অস্তিত্বকে তিনি ব্রহ্মানুভূতির পরও স্বীকার করতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। পাশ্চাত্যদর্শনে বিশেষভাবে প্রচারিত প্রত্যক্ষবাদ বা এম্পিরিসিজম্ (empiricism)-কেও স্বামী অভেদানন্দ মেনে নিতে রাজী হন নি। অবশ্য প্রত্যক্ষবাদের আবার রূপভেদ আছে। কারণ বেকন্ ও হব্স্ থেকে আরম্ভ কোরে লক্, বার্ক্‌লে, হিউম ও পরে বেন্‌থাম্, মিল, স্পেনসার্ সবার দর্শনেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রত্যক্ষবাদ বিভিন্ন নাম-রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই এক প্রত্যক্ষবাদই পাশ্চাত্য তত্ত্ববিজ্ঞানে সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সৃষ্টি করেছে, মনোবিজ্ঞানে সংসর্গবাদে (এসোসিয়েসনিজম্) রূপান্তরিত হয়েছে এবং নীতিশাস্ত্রে সুখবাদ (হেডনিজম্) এবং উপযোগবাদ বা হিতবাদ (ইউটিলিটেরিয়েনিজম্) নামে অভিহিত হয়েছে।"[২৭] স্বামী অভেদানন্দের মতবাদ এগুলির কোনটিরই শ্রেণীভুক্ত নয়। এছাড়া মার্টিনোর নৈতিক-বিজ্ঞানবাদ বা এথিকাল-আইডিয়ালিজমেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কেননা নৈতিক-বিজ্ঞানবাদের মতে এক বিরাট ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে এবং এই ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে ভগবান বা ব্রহ্ম। ন্যায়মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাই আবার নিমিত্তকারণ পরমাণুকে সমষ্টিবদ্ধ ও সৃষ্টি-উন্মুখী করার জন্যে। মার্টিনোর মতে প্রত্যেক মানুষেরই নৈতিক স্বাতন্ত্র্য বা 'মরাল ফ্রিডম্' আছে, সেদিক থেকে মানুষ উদাসীন ভগবান বা ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সুতরাং মার্টিনোর নৈতিক-বিজ্ঞানবাদ দ্বৈতবাদেরই নামান্তর। স্বামী অভেদানন্দ এ ধরণের দ্বৈতবাদকে মিথ্যা ও কল্পিত বোলেই স্বীকার করেছেন। মোটকথা স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদের (objective idealism) পক্ষপাতী যা অদ্বৈতবেদান্তী শংকর ও অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ববিজ্ঞানবাদী কাণ্ট ও ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতি স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীও তাই। বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদে জগতের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকৃত হয় না, তবে পারমার্থিকভাবে অস্বীকৃতই হয়। স্বামী অভেদানন্দ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বেলায় স্বীকার করেছেন : (ক) "মনের সঙ্গে পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শ হোলেই আমাদের জ্ঞান হয়" ("Knowledge of perception we get through the contact of the *external object* with the mind substance"), (খ) "ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের বহির্মুখী মন বাহ্যজগৎ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে" ("The objective mind gets the information from the *external* world through senses") প্রভৃতি। এখানে বাইরের জগৎ বা বাহ্যবস্তুকে মোটেই অস্বীকার করা হয় নি, বরং জাগতিক জ্ঞানের জন্যে পার্থিব বস্তু ও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। আবার ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সকল-কিছু আপেক্ষিকতা, সকল-কিছু দ্বৈতজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, থাকে মাত্র অখণ্ড চৈতন্যসত্তারই জ্ঞান—একথাও স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন।

২৭। 'দর্শন'-পত্রিকা ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২য় বর্ষ, পৃঃ ১০৪

তিনি বলেছেন: "যে মুহূর্তে ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমরা অনুভব করতে পারব, ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বার্থপরতা-রূপ সংকীর্ণতা, স্বার্থপ্রণোদিত চিন্তা ও সীমাবদ্ধ জাগতিক জ্ঞানের গণ্ডী অন্তর্হিত হবে, আমরা এ'সকলকে ঠিক তখনই সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারব আর এই অতিক্রান্ত মায়াতীত অবস্থা লাভ করাই ধর্মের উদ্দেশ্য।"[২৮] স্বামী অভেদানন্দ 'ধর্ম' বল্‌তে আত্মা বা আত্মজ্ঞানই বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তও তাই। ধর্ম বল্‌তে কেবলই আচার-বিচার বা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নয়, ধর্ম প্রাণের জিনিস। মানুষের সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে যা ধরে রাখে তাই ধর্ম। এদিক থেকে আত্মাই সকল বিশ্ববৈচিত্র্যের আধার বা অধিষ্ঠান। মানুষও চেতন বোলে পরিচিত হয় যতক্ষণ তার মধ্যে আত্মচৈতন্য থাকে, আত্মার অভাবে সযত্নে পরিপুষ্ট রক্ত-মাংসের শরীরেরও কোন মূল্য থাকে না। সাধারণতঃ প্রাণবায়ুর সঙ্গে আত্মচৈতন্যকে আমরা একাকার কোরে ফেলি। কিন্তু প্রাণবায়ু বা মুখ্যপ্রাণ ও আত্মচৈতন্য এক পর্যায়ভুক্ত নয়। মুখ্যপ্রাণকে বড়জোর হিরণ্যগর্ভের আসন দান করা যায়, আত্মচৈতন্যের মহিমা তার চেয়েও বেশী। আত্মচৈতন্য শুদ্ধব্রহ্মেরই সমান, তবে প্রাণীদের দেহে ও সকল জিনিসের মধ্যে অনুস্যূত থাকার জন্যে তাঁকে সগুণ-রূপে চিন্তা করা হয় মাত্র। ধর্ম বল্‌তে শুদ্ধ-ব্রহ্মচৈতন্যকেই বুঝ্‌তে হবে, কেননা ধর্ম লাভ বল্‌তে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি। স্বামী অভেদানন্দ 'এই অতিক্রান্ত মায়াতীত অবস্থা লাভ করাই ধর্মের উদ্দেশ্য' বল্‌তে ধর্মের উদ্দেশ্য মায়ানির্মুক্ত আত্মজ্ঞান লাভ—একথাই বলেছেন। স্বার্থপরতাই এই জ্ঞান-লাভের প্রতিবন্ধক, স্বার্থপরতাই অজ্ঞান বা মায়া, সুতরাং স্বার্থপরতার পারে গিয়ে আত্মচেতনা লাভ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বার্থপরতা বা মায়াই পার্থিব জগৎ অর্থাৎ সংসারে আসক্তি। আচার্য শংকর ও স্বামী অভেদানন্দ কিন্তু বিষয়-বিজ্ঞানবাদ বা 'অব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিজম্‌' স্বীকার কোরে ব্যবহারিকভাবে জগৎ তথা সংসারের পার্থিব সত্তা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক নিত্য অপরিণামী চৈতন্যসত্তা মাত্রই থাকে বলেছেন। অবশ্য স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিতে ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিচারের সময় আমরা এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

২৮। "The moment we realize our relation with the Absolute, we cannot live within the limitations of our selfish motives, selfish ideas and individual consciousness. We must transcend all these, and that is the purpose of religion".
—"আওয়ার রিলেসান্ টু দি এ্যাবসোলিউট", পৃঃ ১৮৩

—চতুর্থ আলোচনা—

জড় ও চৈতন্য

জড় ও চৈতন্যের ধারণা আজ নয়, পৃথিবীর বুকে যেদিন প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল, যেদিন সর্বপ্রথম জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছিল সমাজ, সেদিন থেকেই এদুটির ধারণা তাদের মনের কোনে আসন পেতে বসেছিল। ঋগ্বেদে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী, নাসত্য প্রভৃতি দেবতাদের কাছে সমাজের মানুষ যে সকল স্তোত্রগান কোরে সুখ-সম্পত্তি, শস্য ও বৃষ্টি প্রার্থনা করত সে সবের মধ্যে লুকোনো ছিল বড়র কাছে ছোটর আত্মনিবেদন ও আবেদনের আকৃতি। এই অধীনতা ও প্রণতির প্রেরণা থেকেই কালে সৃষ্টি হয়েছে সমাজে প্রভু-ভৃত্য ও সেব্য-সেবকের ভাব। বিষয়-বিষয়ী—জড় ও চৈতন্যের ধারণাও রূপায়িত হয়েছে এই ধারণা থেকে। আবার এদেরই অন্তস্থলে লক্ষ্য করি আমরা বিভেদের তথা দ্বৈতকল্পনার বীজ; পৃথক ও স্বতন্ত্র পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়েছে এই দ্বৈত-কল্পনারই ভেতর থেকে; এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের আবাহাওয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে শুধু মানুষের কেন—সকল প্রাণীর অন্তরেই ভয়, সংকীর্ণতা ও শোক-দুঃখের কালিমা!

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: এই যে জড় ও চৈতন্যের ধারণা—এ কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রেই নয়, বিজ্ঞান ও ধর্মের রাজত্বেও একাধিপত্য বিস্তার কোরে বসেছে। আত্মা ও অনাত্মা, জীব ও ঈশ্বর, বিষয় ও বিষয়ী, মন ও জগৎ—এ সমস্তই জড় ও চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ। দর্শনশাস্ত্র যুক্তি ও সূক্ষ্ম-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে জড় ও চৈতন্য নিয়ে আলোচনা করেছে যথেষ্ট। নানান বিশ্লেষণী গবেষণা থেকে বিচিত্র মত ও সিদ্ধান্তেরও সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই বিচিত্র মতকে স্বামী অভেদানন্দ মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: (১) অধ্যাত্ম বা বিজ্ঞানবাদ (আইডিয়ালিযম্), (২) জড়বাদ বা বস্তুতন্ত্রবাদ (রিয়ালিজম্) ও (৩) অদ্বৈতবাদ (নন্-ডুয়ালিজম্)। অধ্যাত্ম বা বিজ্ঞানবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হোল: বিজ্ঞান বা প্রাণ জীবজগৎ ও মনের স্রষ্টা, পার্থিব বস্তুমাত্রই বিজ্ঞান বা প্রাণের বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়: (২) জড়বাদ বা বস্তুতন্ত্রবাদের প্রতিপাদ্য হোল: জড়পদার্থ থেকেই বিজ্ঞান বা প্রাণ, মন, আত্মা সমস্তই সৃষ্টি হয়েছে; আর (৩) অদ্বৈতবাদে এক ব্রহ্মই মায়াকে আশ্রয় কোরে জীব ও জগৎ হয়েছেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ', অর্থাৎ নিখিল-বিশ্বকে সৃষ্টি করতে সংকল্প কোরে ব্রহ্ম নিজেই জীব ও জগৎ-রূপে বিবর্তিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে জগৎ ও মনের দিক থেকেই বস্তুতন্ত্রবাদ (মেটিরিয়ালিজম্ বা রিয়ালিজম্) ও বিজ্ঞানবাদের (আইডিয়ালিজম্) উৎপত্তি ও সার্থকতা। যে সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জড় বা ম্যাটারকে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান ও কারণ বোলে তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে চরম বোলে মনে করেন তাঁরাই সমাজে বস্তুতন্ত্রবাদী নামে পরিচিত, আর যাঁরা বিজ্ঞান, প্রাণ বা চৈতন্যকে সকল জিনিস বা সৃষ্টির কারণ

বোলে মনে করেন তাঁদেরকেই বলা হয় বিজ্ঞানবাদী। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের মতে বস্তুতন্ত্রবাদ ও বিজ্ঞানবাদ এই দুটি মতবাদই ঠিক নয়, কারণ এ দুটি মতবাদ পরস্পর আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ, এ' দুটি দিয়ে মানুষের সত্যিকার উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হয় না। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "যৌক্তিকতার দিক থেকে বস্তুতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কেননা এর দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী—কার্য ও কারণ ঠিক ঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না, বরং যথার্থ নির্ধারণের পথ হয় আরো অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল। বস্তুতন্ত্রবাদ প্রথমেই জড়বস্তুকে বলে বিষয়, আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ করতে চায় যে, বিষয় থেকেই বিষয়ী অর্থাৎ কার্য থেকেই কারণ হয়েছে সৃষ্টি, যা কখনই সংগত নয়। 'আছে'-ক কখনও 'না'-ক হয় না। বস্তুতন্ত্রবাদ তার জয়যাত্রা শুরু করে জড়বস্তুকে বিষয়-রূপে প্রতিপন্ন করার ধারণা নিয়ে, কিন্তু পরিশেষে প্রমাণ কোরে বসে যে, বিষয়ই বিষয়ী, মন, চৈতন্য বা আত্মা। এই মতবাদে প্রথমেই মেনে নেওয়া হয়: যা প্রত্যক্ষ করা যায় বা যা থেকে সংবেদন (জ্ঞান) হয় তাই জড়বস্তু, কিন্তু ক্রমশ আবার একথাও প্রমাণ করা হয় যে, জড়-বস্তুই জ্ঞান-অনুভবের কর্তা সুতরাং চৈতন্য; কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ স্ববিরোধী ও অমূলক। বস্তুতন্ত্রবাদের মতো বিজ্ঞানবাদও একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানবাদে জড়বস্তুর বা বিষয়ের অস্তিত্বকে করা হয় অস্বীকার ও মনকেই বলা হয় যথা-সর্বস্ব, সমস্ত জিনিষের কারণ মনই।"[১] ভাইকাউন্ট হ্যাল্‌ডেনও স্বীকার করেছেন: "বস্তুতন্ত্রবাদ ও বিজ্ঞানবাদ এ দুটি পরিভাষা বা শব্দই ভ্রমাত্মক বোলে মনে হয়।"[২] কেননা তাঁর মতে "এ দুটি মতবাদ থেকে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তা আপেক্ষিক এক ধরণের উপায়রূপেই গণ্য হোতে পারে, তাদের সাহায্যে বহিরঙ্গরূপেই মাত্র আমরা সত্যের সম্মুখীন হোতে পারি, ঠিক অন্তরঙ্গভাবে নয়। এই জ্ঞানের আলোকে যে অনুভূতির স্পর্শ আমরা পাই তা কেবল বাইরের ও ভাসা-ভাসা, গভীর নয়; তাছাড়া এ রকম জানার ধারা অনন্তকালই চল্‌তে থাক্‌বে, শেষ আর কোনদিনই হবে না।"[৩]

১। "The materialistic theory is a logical blunder, because it is based upon a confusion between object and subject. * * As materialism is onesided and imperfect, so is the spiritualistic or idealistic theory of the world, which denies the existence of matter or object, and says that everything is mind."—'সেল্‌ফ-নলেজ' (১৯৪৪), পৃঃ ১২

২। "* * the terms Idealism and Realism seem alike unsatisfactory"—'অধ্যাপক মুরহেড সম্পাদিত "কনটেম্‌পোরারী ব্রিটিশ ফিলজফি' (১৯২৬), ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩৮

৩। "For they suggest the view of knowledge as a sort of instrument which is only rational and with which we approach reality from outside itself, * * . The series of its operation is, indeed in the appearance of our experience, unending and never summed up."—ডাঃ মুরহেড সংপাদিত 'কনটেম্‌পোরারী ব্রিটিশ ফিলজফি' (১৯২৬), ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩৮

জড় ও চৈতন্য নিয়ে দার্শনিকদের ভেতর আলোচনা ও মতবিরোধও বড় কম হয় নি। চৈতন্য বল্‌তে কেউ বলেছেন প্রাণ, কেউ বলেছেন মন, আত্মা (জীবাত্মা), আবার কেউ বলেছেন দেশ-কালবর্জিত মন-বুদ্ধির অগোচর নির্বিশেষ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। আসলে প্রাণধর্মী যা তাই চেতন বা চৈতন্য। জড় বল্‌তে যা গতি বা স্পন্দন-হীন তাই; কিন্তু বিজ্ঞান ও বেদান্তের মতে জড়বস্তু বোলে কোন জিনিসই থাকতে পারে না, স্পন্দন ও শক্তি সকল জিনিসেই আছে, তবে তা হয়তো অব্যক্ত সুতরাং ক্রিয়াশীল নয়। স্বামী অভেদানন্দ জড়বস্তু বা ম্যাটারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: বস্তু-তন্ত্রবাদীরা জড়ের সত্যিকার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন: যা থেকে নিয়ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি পাবার সম্ভাবনা আছে তাই জড়বস্তু। জড়বাদ আনে সংবেদন (sensation) আর চেতনধর্মী মন সৃষ্টি করে অনুভূতি (feeling)। আর্নেষ্ট হেকেল বলেছেন: যা অনন্তপ্রসারী তাই জড়, আর যা সর্বব্যাপী চিন্তাশক্তির আকারে প্রকাশ পায় তাই প্রাণ বা চৈতন্য। জড়বস্তুর ইংরেজী নাম 'ম্যাটার'। ম্যাটরকে লাটিন ভাষায় বলে 'মেটিরিজ্'—কাঠের গুঁড়ি বা স্থাণু। দর্শনজগতে ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'ম্যাটার' বল্‌তে বোঝালো এক অজানা জিনিস যা থেকে সৃষ্টি হয় জ্ঞানের বিচিত্র উপাদান! বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাও মেনে নিল সেই অজানা জিনিসকেই 'ম্যাটার' বা জড় বোলে, আর তা থেকেই বিকশিত হয়েছে বিশ্বচরাচর। তাঁরা বলেছেন: কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে ঐ অজানা জিনিসটিকে জানা যায় না অথচ বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তরে রয়েছে তা অনুস্যূত। সেই অজানা জিনিসটি দেশও নয়, কালও নয়, কোন-কিছুর কারণও নয়, কিন্তু দেশ, কাল ও কারণ এদের প্রতেকটির ভেতর ওতঃপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িত রেখেছে।[৫] হার্বার্ট স্পেন্সার জড় ও চৈতন্যকে আবার একই শক্তিকেন্দ্রের বিচিত্র বিকাশ বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় ও চৈতন্যের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা সাধারণভাবে দুঃসাধ্য। যাকে আমরা বলি জড়, বিজ্ঞানী তার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন: 'জড় এমনি একটি জিনিস যার কোনদিন সৃষ্টিও হয় নি আকস্মিকভাবে, বা শূন্যগর্ভে মিলিয়েও যাবে না অকস্মাৎ।[৬] বিজ্ঞান তাই জড়বস্তুকে আসলে শক্তিকণার সমষ্টিই ('a structure of energy-units') বলেছে: প্রতিনিয়ত তা ঘুরছে দেশ-কালের মধ্যে বিপুল বেগে, সুতরাং জড়কে শক্তি, গতি বা স্পন্দন ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। পার্থিব বস্তুমাত্রকে আমরা ঘটনা-পারম্পর্য বোল্লেও বল্‌তে পারি, জড় সেজন্যে কোন অচঞ্চল বা অনন্ত বস্তু নয়, অনন্ত শূন্যের মধ্যে ঘূর্ণায়মান সংখ্যাতীত শক্তিবিন্দুবিশেষ।[৬] তাই অধ্যাপক

৪। অভেদানন্দ, 'সেল্‌ফ নলেজ' (১৯৪৪), পৃঃ ৮-৯

৫। ঐ. পৃঃ ১১

৬। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্: 'এ্যান্ আইডিয়ালিষ্ট্ ভিউ অব লাইফ', পৃঃ ২২৯

রাধাকৃষ্ণন্ জড় ও চৈতন্যের প্রার্থক্য সম্বন্ধে বলেছেন: জড় ও চৈতন্যের প্রার্থক্য মোটেই ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়তার জন্যে নয়, কিন্তু ভিন্ন রকমের দুটি ক্রিয়া বা গতিরুচ্ছলতার জন্যে প্রতীয়মান হয় তারা পরস্পর পৃথক বোলে;[৭] তা ছাড়া বিষয় ও বিষয়ীর দ্বন্দ্বকেও তিনি বলেছেন নিরর্থক, কেননা বিচারীর দৃষ্টিতে কার্য-কারণের মতো তারা অভিন্ন, মনে হয় পৃথক বোলে কেবল বিশ্বগত ও বিশ্বোত্তীর্ণ ধারণা দুটিকে অপেক্ষা কোরে। ভাইকাউন্ট হাল্‌ডেনের অভিমতও তাই। বিষয় ও বিষয়ীর ভিন্ন সত্তাকে তিনি বলেছেন নিরর্থক। তিনি উল্লেখ করেছেন: "পরিপূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখি—জানা বল্‌তে কেবল বিষয়কে জানা নয়, বিষয়ীর জ্ঞানকেও বোঝায়। বিষয় ও বিষয়ী সেই অনন্তেরই অংশমাত্র। পরিপূর্ণ জ্ঞানই সত্য, বিষয় ও বিষয়ীরূপ আংশিক জ্ঞান-দুটি ঐ পূর্ণকে অপেক্ষা কোরেই ভিন্ন বোলে প্রতীত হয়।"[৮] ফরাসী পণ্ডিত রেঁণে গুঁয়ের (Rene Guenon) অভিমতও অনেকটা তাই।[৯]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: জড় বা জড়বস্তু বল্‌তে আমরা বুঝি যাকে উপাদান কোরে এই ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করা ও মন দিয়ে তাকে জানা যায়। জড় সর্বদাই বাহ্য-বিষয় আর চৈতন্য আন্তর-বিষয়ীরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাই বস্তু হিসাবে তারা পরস্পর পৃথক্ ও বিরোধী হোলেও অখণ্ড একটি বিরাট চৈতন্যেরই

৭। "* * difference between life and matter is not one of activity and passivity, but between two different kinds of activity."—'এ্যান্ আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অব লাইফ', (১৯৩৭) পৃ: ২৩৬

৮। In our experience, in its fullest aspect as a form of knowledge, we find that to know means to be either only subject, but that these are the moment in a large entirety which is actual fact of knowledge with which they are distinguished."—'দি রেন্ অব রিলেটিভিটি,' পৃ: ১৭৩

৯। রেঁণে গুঁয়েও বলেছেন: " * * the separation of subject and object is a special feature of modern philosophy, but already among the Greeks, the distinction between a thing and a notion had gone a little too far, * * as if it were only through notions that things could be known to us."—'ইনট্রোডাক্‌সান টু দি ষ্টাডি অব দি হিন্দু ডক্‌ট্রিন্স,' (১৯৪৪), পৃ: ২৪৪

ইতালীয় দার্শনিক জেন্‌টাইল জড় ও চেতনাকে আত্মা (ইগো) ও অনাত্মার (নন্-ইগো) পর্যায়ভুক্ত কোরে আত্মা বা বিষয়ীকে আলো ও অনাত্মা বা বিষয়কে বলেছেন ছায়া, অথচ পরস্পর সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, কেননা একজনের থাকার ওপরে নির্ভর করছে অপরের না থাকার ও একজনের না-থাকার ওপরে নির্ভর করছে অপরের থাকার। যেমন আঁর. ডব্লিউ. হোম্‌স্ (R. W. Holmes) উল্লেখ করেছেন: "Ego is like a shinig light : Not-Ego is like a shadow. The shadow is the negation of the light and dependent upon the light for its existance. The two are corelative and must be taken together" (—'দি আইডিয়ালিজ্‌ম্ অব গিয়োভিনি জেন্‌টাইল', ১৯৩৭, পৃ: ৮৬)। জড়কে (ম্যাটারকে) জেন্‌টাইল আবার রূপ বা আকার (form) থেকে আলাদা করেছেন জড়কে জ্ঞানের বিষয় ও রূপকে জ্ঞানোৎপাদনের ক্রিয়াশীল উপাদান বোলে গণ্য কোরে।—ঐ, পৃ: ৮৩

তারা দুটি দিক বা বিকাশ, কিন্তু অবিচ্ছেদ্য তাদের সম্বন্ধ। সেই বিরাট এক ও অখণ্ড চৈতন্যের অর্ধেক হোল জড় বা বিষয় আর অর্ধেক মন বা বিষয়ী। তাই বস্তুতন্ত্রবাদীরা যখন সে চৈতন্যকে বলেন জড় বা বিষয় তখন অর্ধাংশ মাত্রকে গ্রহণ কোরে অপরার্ধকে করেন তাঁরা অস্বীকার, আর বিজ্ঞানবাদীরাও যখন বলেন তাকে বিজ্ঞান বা মন, মনে করেন তাঁরাও অখণ্ড চৈতন্যের মাত্র অর্ধ অংশকে।[১০] কাজেই উভয় মতবাদই অসম্পূর্ণ বোলে পরিপূর্ণ সত্যের সন্ধান দিতে একেবারে অক্ষম।

স্বামী অভেদানন্দ জড় ও চেতনের অধিষ্ঠানরূপে তৃতীয় একটি উদাসীন ও অখণ্ড বস্তুর কথা স্বীকার করেছেন যা আসলে জড়ও নয়, চৈতন্যও নয়—জগৎও নয়, মন, প্রাণ বা বিজ্ঞানও নয়, অথচ এ সকলের মধ্যেই অনুস্যূত। অনেকের মতে এই সাক্ষীস্বরূপ জড় ও চেতনাতীত তৃতীয় বস্তুটি অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-বিশেষ। মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্তও তাই যদিও বিজ্ঞানের পরমাণুর সঙ্গে কণাদীয় অণু বা পারিমাণ্ডল্যের ঠিক মিল নেই। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: সাক্ষীরূপে নিরপেক্ষ বস্তুই আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্য,[১১] জড়জগৎ ও মন ব্রহ্মের ইতিবাচক (পজেটিভ) ও নেতিবাচক (নেগেটিভ) এই দুটি দিক বা বিকাশ। স্বামী অভেদানন্দ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এজন্যে একটি চুম্বক পাথরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই চুম্বক পাথরের একটি দিক (বিকাশ) জড় ও অন্যদিক চৈতন্য বা মন, এদুটির যোগসূত্র রচনা করেন নিরপেক্ষ সাক্ষী-চৈতন্য।[১২]

বেদান্তের মতে জড়জগৎ ও মন একটিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ: একটি ব্যক্ত ও অপরটি অব্যক্ত, একটি জাগ্রৎ ও অপরটি স্বপ্ন বা সুষুপ্তি। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিকাশ দুটিকে নিয়েই বিশ্বপ্রকৃতির কোলে সৃষ্টি ও প্রলয়ের খেলা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে।[১৩] নটরাজ নৃত্য করেন লীলায়িত ছন্দে, প্রতিছন্দে তাঁর তরঙ্গায়িত হয় সৃষ্টিও প্রলয়—ভাঙা ও গড়া, এ নৃত্যের আর শেষ নাই! তবে এ নৃত্য যাঁর উদ্দেশে হোচ্ছে তাঁরই কাছে আছে এর অন্ত ও পরিসমাপ্তি। এ সমাপ্তির অপর নামই শাশ্বত শান্তি। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: প্রত্যেক মানুষই শাশ্বত শান্তিরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার

১০। অভেদানন্দ: 'সেল্‌ফ-নলেজ', পৃ: ১১-১২

১১। এই ব্রহ্মচৈতন্যকে সগুণ অথবা নির্গুণ দুইই বলা যেতে পারে। সগুণ এজন্যে যে, জীবজগৎ ও মন-রূপ বিকাশ দুটিকে অপেক্ষা কোরেই তিনি তৃতীয় বস্তু; আবার দুটি বিকাশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও অতি নিকট ও অবিচ্ছেদ্য। নির্গুণ এজন্যে যে, সাক্ষী-চৈতন্যকে তুরীয় ও ত্রিগুণাতীত বলাও অসমীচীন নয়। বিকাশ বিকৃতি-রূপে পরিবর্তনশীল সুতরাং অনিত্য বা মায়া, তৃতীয় তথা তুরীয় চৈতন্য মায়াতীত, সুতরাং শুদ্ধব্রহ্ম।

১২। "This universe is like a gigantic magnet, one pole of which is matter, and the other is spirit, while the neutral point is the absolute substance". —(১) সেল্‌ফ-নলেজ' (১৯৪৪), পৃ: ১৭; (২) 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট'; পৃ: ৪৩

১৩। "* * this is the play of mind and matter. This is the universe. It is a play."—'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট' (১৯৪৩) পৃ: ৪১

লাভ করতে সক্ষম হবে, কেননা পরিপূর্ণতার অনন্ত বিকাশ-সম্ভাবনার বীজ প্রত্যেকের অন্তস্থলেই গোপনে লুকোনো রয়েছে। মানুষ তো স্বরূপে পূর্ণ, অপূর্ণতা সে নিজেই বরণ কোরে নেয় ভুল-ভ্রান্তির জন্যে, একেই শংকরাচার্য বলেছেন 'মিথ্যাপ্রত্যয়' বা ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণার অবসান হয় যথার্থ ধারণা হোলে পরে। যথার্থ ধারণার নাম ভুলের সংশোধন, (correction of error), কাজেই ভুল ধারণার অপসারণ ও সত্য-ধারণার উদয় একই সময়ে হয়, দুটি প্রণালী আলাদা বোলে মনে হোলেও আসলে একই।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই সর্বব্যাপীতার ও সর্বজ্ঞতার বীজ রয়েছে সুপ্ত, জাগ্রত করার নামই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। তিনি উল্লেখ করেছেন:

"Individual can find God, the Absolute, in the ego, which is potentially the Whole in quality and a part in quantity. We are Whole in quality. We have the seed in us of omnipresence, omnipotence and omniscience. In quantity we are parts, but in quality we have the same quality as Godhead, and therefore we can know God, because we are potentially God. The potentiality of the Whole is there and therefore we can realize the Whole. * * That explains unity and variety, and it also explains the relation between monism and dualism. That is monism when we look at the neutral point of the magnet: then we do not see the positive end and the negative end. But dualism would admit the positive end and the negative end and does not pay any attention to the neutral point."[১৪]

শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশই মানুষের মধ্যে তর-তম—ছোট বড়র ভাব জাগিয়ে দেয়; অংশ ও পূর্ণতার ধারণাও ঠিক এজন্যেই মানুষের মনে সৃষ্টি হয়। কিন্তু আসলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সঙ্গে আমরা সমান ও এক। এই অনুভূতিই বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার ভাব পরিস্ফুট করে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথাও আমাদের জানিয়ে দেয়। মোটকথা মায়ানির্মুক্ত ব্রহ্মের দিক থেকে যখনই আমরা সৃষ্টি-রহস্যের বিচার ও সমাধান করতে বসি তখনই অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মনকে অধিকার কোরে বসে, তখনই জীবজগৎ ও মনের প্রশ্ন আর আমাদের মধ্যে জাগে না। কিন্তু দ্বৈতবাদে বাহ্য ও আন্তর জগতের দ্বন্দ্ব অটুটই থাকে, অদ্বৈতের অনুভূতি আর হয় না। আসলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ দৃষ্টিভঙ্গীর রকমফের থেকেই সৃষ্টি হয়, সত্যানুভূতির এই দুটি পথ বা উপায়, তবে পরমসত্যের রাজ্যে মতবাদের সত্যিকার কোন স্থান নেই। তাই অভেদানন্দ বলেছেন: "So, neither monism nor dualism is correct. They are only different standards as we interpret."[১৫]

জড় বা ম্যাটারের ও চৈতন্যের বা স্পিরিটের ধারণা আমাদের ভারতীয় দর্শনেও নানান রকমভাবে করা হয়েছে। যোগাচারী বৌদ্ধেরা জড়বস্তুকে বিজ্ঞানের পরিণতি বলেছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাসনার প্রেরণায় ঐ বিজ্ঞান থেকেই হয় জড়ের বিকাশ।

১৪। অভেদানন্দ: 'সেল্‌ফ-নলেজ' (১৯৪৪), পৃঃ ১৮; 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট্; পৃঃ ৪৪

১৫। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৪৪

সাংখ্যদর্শনে চৈতন্যকে জ্ঞানঘন পুরুষ ও জড়কে প্রকৃতি বলা হয়েছে। শংকরের মতে জড় অসত্য, কেননা অজ্ঞানই তার উপাদান। রামানুজ ও পঞ্চরাত্রের অনুবর্তীরা জড়কে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই দুরকম ভাবে কল্পনা করেছেন: অশুদ্ধ জড় প্রকৃতি ও শুদ্ধ জড় চিৎশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর। বাংলা ও কাশ্মীর তন্ত্র এবং বীরশৈবদর্শনও এই মতের পক্ষপাতী।[১৬] কোন কোন শৈবসম্প্রদায় জড় বস্তুকে বলেছেন 'বিন্দু' যা শুদ্ধ আকারে মহামায়া ও অশুদ্ধ আকারে মায়া নামে পরিচিত। বেদান্তের কোন কোন আচার্য জড় তথা মায়াকে বিদ্যা ও অবিদ্যা অথবা মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা এই দুরকমে ভাগ করেছেন, তবে আচার্য শংকর ও বিবরণসম্প্রদায়ের অনেকে এই বিভাগ স্বীকার করেন না। বেশীর ভাগ ভারতীয় দার্শনিকেরা জড়কে অজ্ঞান বা বন্ধনেরই নামান্তর বলেছেন।[১৭] স্বামী অভেদানন্দও জড়কে ব্রহ্মের নেতিবাচক ও মন বা বিজ্ঞানকে ইতিবাচক বিকাশ বলেছেন। জড় ও বিজ্ঞান উভয়েই আপেক্ষিক, সুতরাং পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে তিনি এদুটির উপযোগীতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "বেদান্তে একই পরমসত্যের দুটি অবস্থা বা বিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: একটি স্বচ্চিদানন্দরূপ অখণ্ড ব্রহ্মসমুদ্র—সমস্ত গুণ, ক্রিয়া ও ঐশ্বর্য-বর্জিত আর অপরটি সর্বগুণ ও কল্যাণের আধার জ্ঞান ও করুণাঘন মূর্তি। যখনই নির্গুণ ব্রহ্মসমুদ্র বিশ্ববিকাশরূপ বিচিত্র তরঙ্গের সংস্পর্শে আসেন তখনই তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা, পিতা মাতা ভাই বন্ধুরূপে হন প্রকাশিত; তখনই তিনি সগুণ ও সাকার ব্রহ্ম; তখনই তিনি দ্বৈতবাদী, আস্তিক, একেশ্বরবাদী ও পৃথিবীর সকল রকম উপাসকদের কাছ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করেন। কিন্তু বিরাট প্রকৃতিতে অনুস্যূত ঐ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই যখন বিশ্বমায়ার অতীত হন, পার্থিব কোন মালিন্যই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তখনই তিনি নির্গুণরূপে প্রকাশ পান।"[১৮] এ থেকে বোঝা যায়, স্বামী অভেদানন্দ ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দুরকম বিকাশই স্বীকার করেছেন। একথাও তিনি আবার বলেছেন: "সত্যিকারের বেদান্ত-পথিকেরা কখনও দ্বৈতবাদী, কখনও একেশ্বরবাদী, আবার কখনও বা একত্ব তথা অদ্বৈতবাদী।"[১৯] তবে এথেকে একথা যদি আমরা বুঝি যে, তিনি

১৬। কাশ্মীরীয় তন্ত্রসারে (পৃঃ ৭৭-৮০) আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন: "অণুর্নাম কিল চিদচিদ্রূপাবভাস এব, তস্য চিদ্রূপমৈশ্বর্যমেব, অচিদ্রূপত্বৈব মলঃ, * *। তত্র সর্বোঽয়ং কলাদিবর্গঃ শুদ্ধঃ যঃ পরমেশ্বরবিবরতয়া * * অশুদ্ধস্তু তদ্বিপরীতঃ॥"

১৭। ডাঃ উমেশ মিশ্র: 'কন্‌ফেস্‌সান অব ম্যাটার' (১৯৩৬), বইয়ের 'ইন্‌ট্রোডাক্‌সান', পৃঃ ১০-১২ দ্রষ্টব্য।

১৮। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন্', পৃঃ ২৬-২৭

১৯। অভেদানন্দ: এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ২৮; 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১০৭

সমান আদর দিয়ে সকল মতবাদকেই সত্য ও পারমার্থিক বলেছেন তাহোলে ভুল করা হবে, কেননা সমস্ত মতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দুইই কখনও একই সঙ্গে পারমার্থিক সত্য হোতে পারে না, অথবা একবার সত্য ও আর একবার অসত্য হওয়া অসম্ভব। তাই বুঝতে হবে যে, অদ্বৈতব্রহ্মানুভূতির মহোচ্চ আসনে সমাসীন থেকেই উদারদৃষ্টিতে স্বামিজী সকল রকম মত, পথ ও সাধককে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালেও মায়া ও বন্ধনহীন অদ্বৈতানুভূতিকেই তিনি চরমসত্য ও শাশ্বত আনন্দ বোলে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া জড় (জীবজগৎ) ও চৈতন্য (মন) ছাড়া তৃতীয় একটি সাক্ষী ও মায়নির্মুক্ত উদাসীন ব্রহ্মবস্তুর উল্লেখ করায় তাঁর মতবাদ যে অদ্বৈতানুভূতির ওপরই সুপ্রতিষ্ঠিত একথা সহজেই বোঝা যায়।

অবশ্য স্বামী অভেদানন্দের মতবাদের প্রতিচ্ছায়া আমরা পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকের চিন্তাধারার মধ্যেই দেখতে পাই। স্বামী অভেদানন্দের মতো মনীষী বার্টাণ্ড রাসেলও চরমসত্যের বিচার করতে গিয়ে নিরপেক্ষ কতকগুলি উপাদান ('নিউট্রাল পার্টিকুলাস') স্বীকার করেছেন যেগুলি জড়ও নয়, মন বা বিজ্ঞানও নয়, অথচ জড় ও মনের মধ্যে সকল বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য কোরে দেয়। মনীষী রাসেল ঐ নিরপেক্ষ উদাসীন উপাদানকে বলেছেন: 'মূল উপাদান' (প্রাইমাল ষ্টাফ) বা 'বুদ্ধি' (সেন্‌সিবিলা)। সেই মূল উপাদানই তাঁর মতে জড় ও চেতনের (মনের) অধিষ্ঠান, আর ধ্বংস বা প্রলয়ের সময়ে তারা উভয়েই যে যার প্রকৃতিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদাসীন উপাদানের অন্তরে আত্মগোপন করে। রাসেলের এই মতবাদকে 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' ('নিউট্রাল মনিজিম্') বলে।[২০] অসোয়াল্ড কুল্‌পে একে একত্ববাদই ('ডক্‌ট্রিন্ অব ইউনিটি') বলেছেন, কেননা এই মতবাদের সাহায্য নিয়ে ঈশ্বর ও জগতের—সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটি যোগসূত্র রচনা করা সম্ভব হয়। অবশ্য প্রমাবিজ্ঞানের (এপিস্‌টেমোলজি) ক্ষেত্রে আমরা এ ধরণের একত্ববাদের উল্লেখ যে পাই না তা নয়, কিন্তু সেখানে চিন্তা ও বাস্তবতার মধ্যে সকল প্রার্থক্যের অবসান কোরে জ্ঞেয়-বস্তুর মধ্যে সত্যিকারের একটি ঐক্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই ঐ একত্ববাদের ব্যবহার করা হয়েছে।[২১] একত্ববাদকে যে কেবল দার্শনিকেরাই তাঁদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন তা নয়, বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিকেরাও দুটি বিপরীত বস্তু পূর্বপক্ষ (থিসিস্) ও উত্তরপক্ষের (এ্যান্‌টিথিসিস্) মধ্যে একটি সামঞ্জস্য (সিন্‌থেসিস্) দেখাবার জন্যে ব্যবহার করেছেন। রাসেলের স্বাধীন একত্ববাদকে এজন্যে 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' বা 'নিউট্রাল মনিজিম্' বলাই সমীচীন। বস্তুতন্ত্রবাদী, বিজ্ঞানবাদী, পরাবিজ্ঞানবাদী সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নজিরে একত্ববাদ স্বীকার করেন। যেমন বস্তুতন্ত্রবাদী (রিয়ালিষ্ট্) আর্নেষ্ট হেকেল, উইলিয়াম জেম্‌স্ প্রভৃতি মনীষীরা একত্ববাদের পক্ষপাতী। আবার বিজ্ঞানবাদী স্পিনোজা, কাণ্ট, ফিক্‌টে, শেলিঙ, পরাবিজ্ঞানবাদী হেগেল, জোসিয়া রয়েস, হাউইসন ও বের্গসোঁ, ব্রাড্‌লে প্রভৃতি দার্শনিকেরাও একত্ববাদের পক্ষপাতী।

২০। অধ্যাপক জোড (C. E. M Joad): 'এ্যান্ ইনট্রোডাক্‌সান টু মডার্ণ ফিলজফি', পৃঃ ২৯-৩০

২১। অসোয়াল্ড্ কুল্‌পে: 'ইন্‌ট্রোডাক্‌সান টু ফিলজফি' (১৯২৭), পৃঃ ১৩৮-১৩৯

তবে একই মতবাদকে অনুসরণ করলেও সকলের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির পরিমাপ ঠিক এক নয়, কেননা একই পরমার্থতত্ত্বকে সত্য ও শাশ্বত বোলে প্রমাণ করতে গিয়ে কেউ বৈচিত্র্যকে তথা জগৎ ও মনকে ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত অবস্থায় নিত্য, আবার কেউ বা অনিত্য বোলে স্বীকার করেছেন। এ ধরণের বিচিত্র স্বীকৃতির নজির ভারতীয় দর্শনেও আছে, তবে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ বা একত্ববাদ থেকে সে সব অনেক ভিন্ন।

স্বামী অভেদানন্দের মতো বার্টাণ্ড রাসেলও মন ও বৈচিত্র্যের অখণ্ড অধিষ্ঠান-রূপে সাক্ষী ও কূটস্থ উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের সিদ্ধান্ত একেবারে আলাদা, কারণ স্বামী অভেদানন্দের,উদাসীন তৃতীয় বস্তুটি যেখানে এক ও অদ্বিতীয়-রূপে বাহ্য ও আন্তর জগতের ঐক্য সাধন করেছে নিজেকে অধিষ্ঠান ও অনুস্যূত বস্তু হিসাবে, রাসেলের নিরপেক্ষ উপাদান সেখানে একের ছদ্মবেশে বিচিত্র রূপধারী মন ও জগতের সমন্বয় করেছে তাদের থেকে নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে ; সুতরাং একের চরমসত্য যেখানে এক ও অদ্বিতীয় হোয়ে বিচিত্রতাকে করেছে অস্বীকার, অপরের চরমসত্য সেখানে এক অথচ বহুত্বের আনন্দে হয়েছে ভরপুর। তবে একথা আবার সত্যি যে, রাসেলের 'নিউট্রাল মিনিজিম্' ঠিক তাঁর নিজস্ব মতবাদ নয়, এর জন্যে ঋণী তিনি উইলিয়াম জেম্‌সের কাছে। মনোবৈজ্ঞানিক জেম্‌সের ভিতর এই মতবাদের পরিচয় আমরা পাই তখন যখন প্রতিপাদন করেছেন তিনি চৈতন্যকে অসত্তা বা শূন্য ('the name of nonentity') বোলে সমালোচনার মনোবৃত্তি নিয়ে। জেম্‌স্‌ও স্বীকার করেছেন : অখণ্ড একটি মূল উপাদানরূপ ('things which is only one primal stuff material') শুদ্ধ অনুভূতির (pure exprience) সত্তা। এই শুদ্ধ অনুভূতির পরিচয় দিতে গিয়ে জেম্‌স্ বলেছেন : তা প্রত্যক্ষ জীবন্ত একটি উৎস যার প্রবুদ্ধ প্রেরণায় সমগ্র জীবন আমাদের হোয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। প্রেরণাসঞ্চারী উৎসটির মধ্যে দীনতা ও দ্বৈতভাবের কোন লেশ-মাত্র নাই, অথচ জগৎ ও মনের—জড় ও চেতনের মধ্যে দৈন্য ও বৈষম্য-বিষয়ে তা সম্পূর্ণ সচেতন।[২২] সুতরাং এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জেম্‌স্‌কে নিশ্চয়ই বলা যায় একত্বের উপাসক যদিও বস্তুতন্ত্রবাদেরই তিনি ছিলেন পুরোপুরী পক্ষপাতী।[২৩] তবে একথাও আবার সত্যি যে, তাঁর সেই একত্ব-উপাসনার মধ্যে আত্মগোপন কোরেছিল বহুত্ববাদ তথা বিচিত্র সত্তারই বীজ।

২২। অধ্যাপক রাসেল : 'হিষ্ট্রী অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলজফি' (১৯৪৬), পৃঃ ৮৪০-৮৪১

২৩। উলিয়াম জেম্‌সের (১৮৪২-১৯১০) বস্তুতন্ত্রবাদ একমাত্র জাগতিক তথা বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা নিয়েই সার্থক। ইংরেজীতে এর নাম 'প্র্যাগ্‌মেটিজিম্'। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে কেম্‌ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে স্বামী অভেদানন্দ যখন 'ইউনিটি ইন্‌ ভ্যারাইটি' (বহুত্বে একত্ব) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, ডাঃ জেম্‌স্‌ ছিলেন তার সভাপতি। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম জেম্‌স্, প্রোঃ ল্যানম্যান প্রভৃতি। অধ্যাপক জেম্‌স্‌ তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়েছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শেষ হোলে প্রশ্নোত্তরের সময়ে অধ্যাপক জেম্‌স্‌ একত্ব তথা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বহু প্রশ্ন তাঁর ছাত্রদের দিয়ে করিয়েছিলেন। তা দেখে ডাঃ জেম্‌স্ বলেন : "স্বামিজী আনন্দিত হবেন যদি অধ্যাপক জেম্‌স্ ঐসব প্রশ্ন নিজে করেন"। তাতে অধ্যাপক

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স্‌ নিরপেক্ষ একত্ববাদ বা 'নিউট্রাল্‌ মনিজিম্‌' প্রতিষ্ঠা করলেও নিজে কিন্তু কখনও এই শব্দটি তাঁর আলোচনার কোথাও কখনও ব্যবহার করেন নি, এর পরিবর্তে তিনি বলেছেন 'অনুভূতি' (এক্সপিরিয়েন্স্‌) বা 'শুদ্ধ অনুভূতি' (পিওর এক্সপিরিয়েন্স্‌)। অধ্যাপক ডেভিড গেষ্ট্‌ উল্লেখ করেছেন যে, অধ্যাপক রাসেল তাঁর 'আউটলাইন্স্‌ অব ফিলজফি' বইয়ে লিখেছেন: আর্নেষ্ট্‌ ম্যাক্‌ই তাঁর 'এ্যানালিসিস্‌ অব সেন্‌সেসান্‌স্‌' বা 'সংবেদনের বিশ্লেষণ' শীর্ষক আলোচনায় সর্বপ্রথম 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' (neutral monism) শব্দটি ব্যবহার করেন ও অধ্যাপক জেম্‌স্‌ পরে তাঁর 'এসেজ্‌ ইন্‌ র‍্যাডিক্যাল্‌ এম্‌ফিরিজ্‌ম্‌' প্রসঙ্গে ও অধ্যাপক জন্‌ ডিউই, অধ্যাপক পারি ও অন্যান্য আমেরিকার নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদীরা বিস্তৃতভাবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ডেভিড গেষ্ট্‌স্‌-এর মতে নিরপেক্ষ একত্ববাদের মধ্যে আছে অর্থনৈতিক তথা বস্তুতন্ত্রতার দৃষ্টিভঙ্গী, কাজেই তাকে বরং আপোষকারী দর্শন বা 'ফিলজফি অব কম্‌প্রোমাইজ্‌'-ই বলা সমীচীন। তিনি বলেছেন: উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও প্রায় বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার দিকে সাম্রাজ্যবাদীর মনোভাব নিয়ে ধনিকতন্ত্রবাদ যখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তখন বস্তুতন্ত্রবাদ (রিয়ালিজিম্‌) ও বিজ্ঞানবাদ (আইডিয়ালিজ্‌ম্‌)-এই দুটি বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে একটি ঐক্য আনবার জন্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ'-রূপ দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল।[২৪] আরনেষ্ট্‌ ম্যাক্‌-এর উদ্দেশ্যই ছিল: বার্কলে ও হিউমের গতানুগতিক মতবাদরূপ অচলায়তনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। তাই তিনি 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' প্রচার করলেন মিলনের একটি শুভ ইচ্ছা নিয়ে। মনীষী ম্যাক্‌ বল্লেন: ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বাইরের জিনিস নয়, তা সম্পূর্ণ আন্তর; সেই আন্তর বস্তুকেই

জেম্‌স্‌ বলেন: সে এখানে নয়। অবশ্য বক্তৃতার শেষে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে তিনি করমর্দন কোরে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতার জন্যে প্রশংসা করলেন ও তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সুতরাং ৩০শে মে ডাঃ জেন্‌স-এর সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সেলার, অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস, অধ্যাপক ল্যানম্যান প্রভৃতি। লাঞ্চের পর আলোচনা শুরু হোল একত্ব তথা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন নিয়ে। অধ্যাপক জেম্‌স্‌ বহুত্বের সপক্ষে উত্থাপন করলেন তর্কজাল আর স্বামী অভেদানন্দ প্রত্যেকটি আলোচনা অপূর্ব যুক্তি ও বিচারের সঙ্গে খণ্ডন করেন ও জগৎকারণ-উপলক্ষিত ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয়, বিচিত্র জগৎ যে মানুষের কল্পনা, বাস্তব সত্তা তার নেই এ সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করেন। বিতর্ক প্রায় চার ঘণ্টা অবিশ্রান্তভাবে চলেছিল। স্বামিজীর অখণ্ডনীয় যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন অধ্যাপক রয়েস, অধ্যাপক সেলার, ডাঃ জেন্‌স্‌, অধ্যাপক ল্যানম্যান। পরিশেষে অধ্যাপক জেম্‌স্‌ অদ্বৈতবাদকে মেনে না নিলেও স্বামী অভেদানন্দের আলোচনা ও অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদন যে সুদৃঢ় ও সূক্ষ্মযুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। সেদিনকার সেই আলোচনা এত পাণ্ডিত্য ও বিচারপূর্ণ হয়েছিল যে, বিতর্কের পর ডাঃ জেম্‌স্‌ উচ্ছ্বসিত হোয়ে বলেছিলেন: 'আজ যদি এই আলোচনার সময় কোনও সাংকেতিক লিপিবিদ্‌ (ষ্টেনোগ্রাফার) থাকতেন তাহোলে এই ঐতিহাসিক উপাদানপূর্ণ আলোচনা ভবিষ্যৎ বিদ্বৎসমাজের জন্যে সযত্নে রক্ষিত থাকত।"—অভেদানন্দ: 'লিভ্‌স্‌ ফ্রম্‌ মাই ডায়েরী', পৃঃ ৩১ এবং স্বামী শংকরানন্দ: 'জীবন-কথা', পৃঃ ১৬৯-১৭০

২৪। ডেভিড গেষ্ট্‌স্‌: 'এ টেকস্‌ট্‌ বুক অব ডায়েলেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌'

আমরা বলি বিশ্বসৃষ্টির চরম উপাদান। অধ্যাপক জেম্‌স্ একেই বলেছেন 'শুদ্ধ অনুভূতি' বা 'পিওর এক্‌স্‌পিরিয়েন্স', অধ্যাপক রাসেল বলেছেন 'মূল উপাদান' বা 'প্রাইমাল্ ষ্টাফ্'। অধ্যাপক রাসেল পরে এই মূল উপাদানের প্রতিপাদক 'নিরপেক্ষ একত্ববাদ' বা 'নিউট্রাল মনিজিম্'-ই গ্রহণ করেছিলেন বাহ্য বা আন্তর জগৎ—এই দুটির মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসা করার জন্যে।

অনেকটা এই ধরণের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন হেন্‌রী বের্গসোঁ। ডাঃ উইলডন্ কার্ বলেছেন: নিরবচ্ছিন্ন গতিরুচ্ছলতার মধ্যে জড় ও চৈতন্যকে বের্গসোঁ দু'শ্রেণীর নিত্য বস্তু বোলে স্বীকার করেছেন।[২৫] ডাঃ ষ্টুয়ার্টও ডাঃ কারের সঙ্গে এ' বিষয়ে একমত। ডাঃ ষ্টুয়ার্ট বলেছেন: বের্গসোঁ জড়কে বস্তুর পরিবর্তে মনে করতেন চলমান প্রবাহ বা গতি ও চৈতন্যকে বল্‌তেন স্থিতি। আবার জড়েরও যে একটি অচঞ্চল অবস্থা বা স্থিতি আছে একথা বের্গাসোঁ বিশ্বাস করতেন। গতি ও স্থিতির মধ্যে পার্থক্য ছিল পরিমাণ বা সংখ্যাগত।[২৬] কিন্তু তা হোলেও অধ্যাপক রাসেল বের্গসোঁর মতবাদকে বলেছেন দ্বৈতপর,[২৭] কেননা বের্গসোঁর আবিষ্কৃত 'এলাঁ ভিতা' (*e'lan vital*) বা প্রাণশক্তি জড় ও চেতন—এই বিরুদ্ধ পদার্থ দুটির মধ্যে সমতার সুরে ঐক্য রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও সেই ঐক্য মোটেই অখণ্ডতার আদর্শকে অটুট রাখ্‌তে পারেনি।

বের্গসোঁর মতো মরমী দার্শনিক স্পিনোজার ঈশ্বরে বা এ্যাব্‌সোলিউটে পাই অখণ্ডতার পরিচয়। স্পিনোজাও তাঁর ঈশ্বরকে বলেছেন নিরপেক্ষ ও অখণ্ড-চৈতন্য, কিন্তু মন ও জীবজগৎ অথবা চিন্তা (thought) ও বিস্তৃতিকে (extention) তিনি মেনে নিয়েছেন ঈশ্বরেরই অভিন্ন বিকাশ বোলে। স্পিনোজা বলেছেন: গুণ হিসাবে জড় ও চেতন ঈশ্বর থেকে আলাদা বোলে মনে হোলেও আসলে তারা অভিন্নই।[২৮] কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিন্নতার মধ্যে আত্মগোপন কোরে আছে ভিন্নতা বা দ্বৈতভাব। কাজেই স্বামী অভেদানন্দের মতে যে ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম করেন জড় ও চেতনের সমন্বয়, স্পিনোজার স্বয়ংকারণ (self-caused) ঈশ্বর সেই মহিমার আশীর্বাদও লাভ করবার অধিকারী নন, কেননা স্বামী অভেদানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে জড় ও চেতনকে বলেছেন ব্রহ্মের দুটি বিকাশ[২৯] তাদের ব্যাবহারিক উপযোগীতাকে স্বীকার কোরে আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে করেছেন সকল-কিছু বিকাশ থেকে মুক্ত। কিন্তু স্পিনোজা তাঁর ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বোল্লেও চিন্তা ও বিস্তৃতি তথা মন ও জগৎকে রেখেছেন ঈশ্বরের হৃদয়ের মধ্যেই লুকিয়ে, কাজেই একত্ব বা অদ্বৈতবাদের

২৫। ডাঃ উইলডন্ কার্: 'ফিলজফি অব চেঞ্জ', পৃঃ ৮৭

২৬। ডাঃ ষ্টুয়ার্ট: 'ফিলজফি অব বের্গসোঁ', পৃঃ ১১০

২৭। অধ্যাপক রাসেল: 'হিষ্ট্রী অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলজফি', (১৯৪৬), পৃঃ ৮২৯

২৮। অধ্যাপক রাইট: 'এ হিষ্ট্রী অব মডার্ণ ফিলজফি', পৃঃ ৯৯—১০৯

২৯। অভেদানন্দ: 'সেল্‌ফ-নলেজ' (১৯৩৪), পৃঃ ১৭—১৮

ছদ্মবেশে বহুত্ববাদই তাঁর দর্শনের রাজ্যকে অধিকার কোরে বসেছে। হেগেল ও ব্র্যাড্‌লের মতবাদের পরিণতিও তাই। বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক হোয়াইটহেডও ঈশ্বরের জড় ও প্রাণরূপ দুটি বিকাশ স্বীকার করেছেন।[৩০] অধ্যাপক হোয়াইটহেড বলেছেন: বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুটি দিক আমাদের চোখে পড়ে: একটি জড় যা ক্রমাগতই ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে আর অপরটি অধ্যাত্ম-বিকাশ-রূপ নবসৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জড়কে তিনি বলেছেন আনন্দ বা উপভোগ (enjoyment) ও প্রাণ তাঁর মতে ইচ্ছা বা সৃষ্টির ইচ্ছা (appitition)। ঈশ্বরের এ' দুটি বিকাশই সকল অবস্থার দিক থেকে সত্য, সুতরাং ঈশ্বরের অখণ্ডতার প্রশ্নও সম্পূর্ণ নিরর্থক।

কার্ল মার্কস্‌ও জড় ও চেতন নিয়ে আলোচনা করেছেন ও সে আলোচনার ভিত্তির ওপর তাঁর যুক্তিপরতন্ত্র-ঐতিহাসিক-বস্তুতন্ত্রবাদ (ডায়েলেক্‌টিক্যাল হিস্‌টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্) গড়ে উঠেছে। মার্কস্ ও অভেদানন্দের জড় ও চেতনের আলোচনা সম্পূর্ণ পৃথক, সিদ্ধান্তও আলাদা। স্বামী অভেদানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যকে বলেছেন জড়-জগতের অধিষ্ঠান, আবার পারমার্থিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মার্কসের মতে জড়বস্তু বাস্তব জগতেরই একটি সত্য উপাদান, যুক্তিপরতন্ত্র-বস্তুতন্ত্র-বাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে জড় ও চৈতন্যের ভিন্নতা আবার বিশেষ বোঝা যায় না। মোটকথা মার্কস্ জড়ের স্বাতন্ত্র্য ও উপযোগীতা দেখিয়াছেন চৈতন্যের চাইতেও বেশী আর সেজন্যে হেগেলের সঙ্গে মার্কসের সিদ্ধান্তও মেলে না। হেগেল বলেছেন: জড় তথা বিশ্বের ঘটনাপারম্পর্য বা ইতিহাস গতিশীল বোলে অনন্তকাল ধরে তার পরিবর্তন আছে, সুতরাং তাঁকে ঠিক সত্য বলা চলে না;[৩১] জড় আসলে বিরাট ইচ্ছারই ('পিওর বা এ্যাব্‌সোলিউট আইডিয়া') পরিণতি। মার্কস্ কিন্তু তা স্বীকার করেন না; অথচ ষ্ট্রাস্, ম্যাক্, ফায়ার-বাক্, এঙ্গেলস্, লেন্‌লি, মার্কস্ এঁরা সকলেই হেগেলের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। মার্কস্ ও হেগেলের প্রার্থক্য মোটামুটি জড় ও চেতনের মীমাংসা নিয়ে।[৩২] হেগেল যেখানে বলেছেন: বিরাট মন বা চৈতন্যই নিজে ঘটনাসমষ্টির পরিপূর্ণ মূর্তি আর তাই বিশ্বসৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে, মার্কসের অভিমত সেখানে: ঐতিহাসিক ঘটনার সমষ্টি-রূপ জড়-জগতের উপযোগীতাকেই আমরা মুখ্য ও প্রধান বোলে গণ্য করব, মন বা চৈতন্য গৌণ। মার্কস্ তাঁর বিখ্যাত বই 'দাস্ কাপিটাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন: "হেগেল বিরাট মনকে বলেছেন বিশ্বের স্রষ্টা, কেননা তাঁর মতে বিরাট মনের বহির্বিকাশ-রূপ সৃষ্টির একটি বাস্তবতা আছে। কিন্তু আমার মতে মন, যখনই মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে রূপান্তরিত হয় তখন তা জড় থেকে মোটেই ভিন্ন নয়।"[৩৩] কিন্তু মার্কস্

৩০। হোয়াইটহেড: 'রিলিজিয়ন্ ইন্ দি মেকিঙ', পৃঃ ১৪৪

৩১। রাধাকৃষ্ণন্: 'রিলিজিয়ন্ এ্যাণ্ড সোসাইটি' (১৯৪৭), পৃঃ ৩০

৩২। প্রজ্ঞানানন্দ: 'প্রোগ্রেস এ্যাণ্ড পারফেক্‌সান' (১৯৪৯), ইনট্রোডাকসান, পৃঃ ৭-৮

৩৩। রাধাকৃষ্ণন্: 'রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড সোসাইটি', পৃঃ ৩০

হেগেলের সিদ্ধান্ত মানেন নি, মার্কসের মতে জড়ই জগতের একমাত্র উপাদান আর. মন বা চৈতন্য জড়েরই একটি পরিণতি মাত্র।

কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের মতে জড় কখনও বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান হোতে পারে না, তাঁর মতে মার্কসের যুক্তিপরতন্ত্র-ঐতিহাসিক-বস্তুতন্ত্রবাদ মোটেই সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। স্বামী অভেদানন্দ 'ইজ্ বেদান্ত প্যান্থিয়িষ্টিক্' প্রসঙ্গে ৩৪ 'প্যান্থিয়িজিম্' বলতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বোঝায় কিনা এ'নিয়ে যখন আলোচনা করেছেন তখন প্যান্থিয়িজিমের ভিন্ন ভিন্ন রূপের কথাও বলেছেন। যেমন (ক) পোয়েটিক্ এস্থেটিক্ প্যান্থিয়িজিম্, (খ) ডক্ট্রিনাল্ প্যান্থিয়িজিম্, (গ) রিয়ালিষ্টিক্ প্যান্থিয়িজম্, (ঘ) ফিলজফিক্ প্যান্থিয়িজিম্, (ঙ) মেটিরিয়ালিষ্টিক্ প্যান্থিয়িজিম্. (চ) সায়েন্টিফিক্ প্যান্থিয়িজিম্ প্রভৃতি। প্যান্থিয়িজিমের ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন: প্যান্থিয়িজিমের ইতিহাস গ্রীক পুরাণকাহিনীর মধ্যে অন্বেষণ করতে হবে ("We shall have to go back to Greek mythology".) গ্রীসের মেষপালকেরা তাদের যে দেবতার উপাসনা করত তাঁর নাম 'প্যান্' (Pan)। প্যান্-দেবতার মানুষের মতো মাথা ও দেহ ছিল, কিন্তু ছাগলের মতো ছিল শিঙ্ ও দাড়ি; নাক ছিল থাঁদা, লম্বা কান ও লেজ, আর পা-দুটি ছিল ছাগলের মতো। সঙ্গীতের তিনি ছিলেন পরমভক্ত। মেষপালকদের বাঁশী নাকি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। প্যান্দেবতার যে কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় তা তখনকার যুগে মেষপালকদের ঈশ্বরীয় ধারণারই অপরিণত সাধারণ প্রতীক মাত্র। আসলে পশু পক্ষী মাছ পোকা-মাকড় গাছপালাদের মধ্যে যে প্রাকৃতিক শক্তি বা চৈতন্য, প্যান্ দেবতা তারই প্রতিচ্ছবি-মাত্র। পরে ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্যান্ পাহাড়, পর্বত, নদী প্রভৃতিদের দেবতা বোলে পরিচিত হোলেন ও তারও পরে প্রকৃতিদেবীর প্রতীক-রূপে পূজা পেতে থাকেন। * * তাছাড়া প্রথমের দিকে প্যান্ দেবতা বোলে পরিচিত হোলেও পরিশেষে প্রাকৃতিক সমস্ত জিনিষ ও শক্তির মধ্যেই তিনি জীবন্ত প্রতিভূ-রূপে পূজা পেতে লাগলেন। 'প্যান্' বলতে 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস', সুতরাং 'প্যান্থিয়িজিম্' বলতে বোঝায় 'সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ' (universal godism)। অবশেষে খৃষ্টানদের ইউকেরিষ্ট. বা যীশুখ্রীষ্টের শেষ-নৈশ-ভোজনের স্মৃতি-উৎসবের সুরা ও রুটিতে আর রক্ত ও মাংসের প্রতিনিধি-রূপে প্যান্থিয়িজিম্-এর সার্থকতা জড়িত হোল।"৩৫

স্বামী অভেদানন্দ প্যান্থিয়িজিম্ 'তথা সার্বভৌমিক-দেবতাবাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা রূপের পরিচয় দিয়ে উল্লেখ করেছেন : প্যান্থিয়িজিম্ বলতে অদ্বৈতবাদ তো নয়ই, পরন্তু তার অন্যান্য বিকাশগুলিও অদ্বৈতবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন: (ক) পোয়েটিক এস্থেটিক্

৩৪। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস রিলিজিয়ন্', পৃঃ ২২-২৮

৩৫। "The poetic description of the God *Pan* is nothing * * . It asserts the consubstantiation of God with nature."—'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন্', পৃঃ ২২-২৩

প্যান্থিয়িজিম্ বা কাব্য-সৌন্দর্যপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ বলতে সৌন্দর্যের জন্যে প্রকৃতিকে বা প্রকৃতিমাত্রকে পূজা করা বোঝায়; (খ) ডক্‌ট্রিনাল প্যান্থিয়িজিম্ বা তত্ত্বপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ বলতে একথাই আমরা বুঝি যে, সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরেরই চিরচঞ্চল বিকাশমাত্র, সুতরাং তাঁর বিকাশ-মাধুর্যকে পূজা করার অর্থই ঈশ্বরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করা; (গ) রিয়ালিস্টিক্ প্যান্থিয়িজিম্ বা বস্তুপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদের অর্থ বিশ্ব-জগতের প্রাকৃতিক কারণগুলিকে প্রাণবান দেবতা বোলে পূজা করা। মোটকথা বাস্তব জগতের সকল বস্তুকেই এক একটি জীবন্ত দেবতারূপে শ্রদ্ধাভক্তি করার নামই বস্তুতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ। স্পিনোজার সার্বভৌমিক-দেবতাবাদে অবশ্য দার্শনিকতারই আভাস পাওয়া যায় পরিপূর্ণরূপে। মুক্তি বা চরমানুভূতিও স্পিনোজার মতে বৌদ্ধিক (ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল) বিকাশের ভিতর দিয়ে হয়। অনেকে আবার স্পিনোজার মতবাদকে 'প্যারালেলিষ্টিক্ মনিজিম্'[৩৬] অর্থাৎ সমান্তরাল বা সমনিয়ততন্ত্র-একত্ববাদ (অদ্বৈতবাদ) বলতে চান, কেননা স্পিনোজা সকলের কারণরূপী সার্বভৌমিক দেবতা-রূপ ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বোলে স্বীকার করলেও সেই ব্রহ্মের চিন্তা (*thought*) ও বিস্তৃতি (*extention*) দুটি নিত্য বিকাশ আছে, সেগুলি সমান্তরালভাবেই গুণ-হিসাবে ব্রহ্মের মধ্যে উপাদান-রূপে অনন্তকাল থাকে; (ঘ) মেটিরিয়ালিষ্টিক্ প্যান্থিয়িজিম্ বা ইহবাহ্যপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদে ম্যাটার বা জড়কেই সকল জিনিসের কারণ বোলে নির্ণয় করা হয়েছে। মনীষী ষ্ট্রাস্ (Strauss) ও অন্যান্য জড়বাদী দার্শনিকেরাও এই মতের অনুবর্তী। কার্ল মার্কসের মতবাদও অনেকটা তাই। কখনও কখনও ইহবাহ্যপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদকে 'এস্‌থেটিক্ ফিজিক্স' বা সৌন্দর্যতন্ত্র-পদার্থবিজ্ঞানও বলে। গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর জেনোফোন সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন; (ঙ) ফিলজফিক্ প্যান্থিয়িজ্‌ম্ বা দর্শনপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদে ঈশ্বরকে বিশ্বের অণু-পরমাণুর ভিতর অনুস্যূত বোলে চিন্তা করা হয়। গ্রীসে আওনিকেরাও ঠিক এই ধরণের মতবাদ অনুসরণ করতেন; (চ) সায়েন্টিফিক্ প্যান্থিয়িজিম্ বা বিজ্ঞানপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পরমসত্যকে জড় ও চেতনের অধিষ্ঠান বোলে মনে করা হয়। এই মতবাদে চলমান বিশ্ববিকাশের কারণরূপেও পরমসত্যস্বরূপ ভগবানকে স্বীকার করা হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি, জোন্ ফিস্কে, ভলটেয়ার, টম্‌সন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা ও দার্শনিক ব্রুণো এই মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া শ্লেগেল, শেলিঙ, হেগেল প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকেরাও বিজ্ঞানপরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ

৩৬। 'প্যারালেলিষ্টিক্ মনিজিম'-এর মতে মুক্তির পরও এ্যাবসোলিউট বা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর চিরনিত্য গুণদুটি জড় ও চৈতন্য—থট্ ও এক্সটেন্‌সান অব্যক্ত আকারে সমান্তরালভাবে থেকে যায়, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। সুতরাং ঈশ্বর যেমন নিত্য, তাঁর গুণদুটিও নিত্যভাবে থাকে, কেননা নিত্য ও পরমার্থ গুণবানের গুণদুটি কখনও মিথ্যা বা অসৎ হোতে পারে না।

(আইডিয়ালিষ্টিক্ প্যান্থিয়িজিম্) স্বীকার করতেন। কবি গেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্, টেনিসান্, ব্রাউনিঙ্ ও দার্শনিক ইমার্সন প্রভৃতিও এই মতবাদের অনুবর্তী ছিলেন। আসলে 'প্যান্থিয়িজিম্' বা সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ ও তার অন্যান্য রূপগুলির কোনটিই বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সমতুল্য নয়, কেননা 'প্যান্থিয়িজিম্'-এ জড়-প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বোলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু অদ্বৈতবাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কার্য বা বিকাশ হিসাবে পরিবর্তনশীল সুতরাং অনিত্য ও মিথ্যা, এক অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যই শাশ্বত ও সত্য। সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক ঈশ্বরও সেখানে মায়ার গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারেন না। তাই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "বেদান্ত কোনদিনই সৌন্দর্য-পরতন্ত্র-সার্বভৌমিক-দেবতাবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় না, কারণ এতে কেবল জড় প্রকৃতিকে পরমতত্ত্ব বোলে উপাসনা করা হয়। তাছাড়া বস্তুতন্ত্র-সর্বভৌমিক-দেবতাবাদ, দর্শনপরতন্ত্র বা বিজ্ঞানপরতন্ত্র অথবা ইহবাদপরতন্ত্র এদের কোন রকমের সার্বভৌমিক দেবতাবাদকেই অদ্বৈতবেদান্ত সমর্থন করে না। মোটকথা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের বুকে যত মতবাদই সৃষ্টি হোক না কেন, কোনটির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই অদ্বৈতবেদান্তকে আমরা সীমাবদ্ধ করতে পারি না।"[৩৭] সুতরাং এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, স্বামী অভেদানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেই জড় ও চৈতন্যের অনুশীলন করেছেন। তিনি বলেছেন: জড় থেকে মন, বিজ্ঞান বা চৈতন্যের সৃষ্টি কোনদিনই হয় না, অনন্ত ভবিষ্যতের বুকেও কখনও হবে না। মন ও বুদ্ধির প্রদীপ্ত প্রেরণা লাভ কোরেই জড় প্রকাশশীল ও ক্রিয়া-চঞ্চল হয়। কিন্তু মন ও বুদ্ধিকেই চরমবস্তু বোলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে, কেননা এদেরও ওপরে আছেন স্বপ্রকাশ শাশ্বত চৈতন্য, সেই পরমার্থ চৈতন্যকে আশ্রয় কোরেই জড় মন ও বুদ্ধি এরা সকলেই 'আছে' বোলে প্রতীত হয়, এদের অস্তিত্ব আপেক্ষিক বোলে নিত্য নয়।

৩৭। "Vedanta does not teach *aesthetic pantheism* because it does not indulge in worshipping nature. It does not teach *realistic pantheism* nor *materialistic 'pantheism*, We cannot limit Vedanta by any of the *isms* of the past, present and future." —'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ২৫

সৃষ্টি ও ভগবান

সৃষ্টি বল্‌তে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'পরিবর্তন'। পরিবর্তন বা রূপান্তর বল্‌তেই অভিব্যক্তি বা বিকাশ: "By *change* I mean it is subject to growth, progress and evolution,"[১] সাংখ্যমতে যা অব্যক্ত থাকে তাই ব্যক্ত হওয়ার নাম সৃষ্টি আর প্রলয় বা ধ্বংসের নাম কার্যের কারণে—ব্যক্তের অব্যক্তে ফিরে যাওয়া। অব্যক্তকে গড়ে তোলে পূর্ব-পূর্ব জন্ম ও এই বর্তমান জন্মের অসংখ্য সংস্কাররাশি। সংস্কারের সত্যিকারের রূপ অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণকে সাধারণভাবে মনও বলে যদিও বেদান্তে মনকে সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণের একটি অবস্থা বা বিকাশ-বিশেষ বলা হয়েছে। মনও আসলে সংস্কার আর সংস্কারই সৃষ্টির কারণ! স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "সংসার বা সৃষ্টি আমাদের মনেরি মধ্যে হয়, বাইরে নয়। তাই মনে যদি আমরা সংসারকে জয় করতে পারি তবে সংসারের মধ্যে বাস কোরেও আমরা সংসার-জয়ী হই। কাজেই সংসারে বাস করতে আমাদের বাধা নেই, বাধা কেবল সংসারের অধীন হোয়ে বাস করায়। একটি নৌকা জলে ভাসতে পারে, কিন্তু জল যদি নৌকার মধ্যে প্রবেশ করে তবে নৌকা নিশ্চয়ই ডুবে যায়। সুতরাং সংসার বা সৃষ্টির মধ্যে আমরা বাস করতে পারি, কিন্তু সংসারের মোহ বা মায়া যদি আমাদের আচ্ছন্ন করে তবে মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য।"[২] যোগবাশিষ্ঠেও বলা হয়েছে: বিশ্বে যা-কিছু আমরা দেখ্‌ছি সমস্তই মন থেকে সৃষ্টি।[৩] বিশ্ব-চরাচর সমস্তই কল্পনা, জগৎ মনের কল্পনা ছাড়া আর কোন-কিছু নয়।[৪] বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য শংকরও বলেছেন: ভোগ্যবস্তু বিশ্ব-সংসার "সমস্তই মনের বিকাশ ও কল্পনা, বস্তুত সংসারের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই।[৫] মণ্ডুক্য-

১। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৩৮

২। "The world is not outside, *it is only in our mind.* If we conquer the world in our mind we may live in the world without being of the world. * * We can live in the world, but if the worldliness gets into us we are doomed.' —'আওয়ার রিলেসান, টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ২০৩

৩। "মনোমাত্রমতো বিশ্বম্ যদ্‌যজ্জাতম্ তদেব হি।"—যোগবাশিষ্ঠ ৩।৬৬।১১

৪। "সমস্তম্ কল্পনামাত্রমিদম্ বিশ্বম্ নাস্ত্যেব মননাদৃতে।"
মনোমননির্মাণমাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্।
মনোবিজৃম্ভণাদিম্ সংসার ইতি সম্মতম্।"—যোগবাশিষ্ঠ ৩।৪৪।২০ ; ২১।১১০।৪৮

৫। "ভোক্ত্যাদি বিশ্বম্ মন এব সর্বম্, অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ সংসার ন বস্তুতোঽস্তি।"—বিবেকচূড়ামণি ১৭০-১৭১

কারিকায়[৬] আচার্য গৌড়পাদ ও মাধ্যামিকবৃত্তিতে নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যেরাও বিশ্ব-সংসার তথা সৃষ্টিকে মনেরই কল্পনা বলেছেন।

মন বলতে বাসনা বা ইচ্ছাই তবে তা সংকল্প-বিকল্পাত্মক ইচ্ছা। ইচ্ছাকেই বলা হয়েছে আবার গতি, কম্পন বা কার্য। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "ইচ্ছা মনেরই গতিরূপচ্ছল স্বজনীশক্তি, এ ইচ্ছা সকল-কিছু কাজেরই পিছনে থাকে। সংস্কৃতভাষায় একে বলে বাসনা; এই বাসনা প্রাণবান বস্তু অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের মধ্যেই প্রবৃত্তিরূপে থাকে।"[৭] তিনি আরও বলেছেন: "ইচ্ছার অপর নাম বাসনা, বরং সৃষ্টি বোঝাতে গেলে ইচ্ছা শব্দের চেয়ে বাসনার ব্যবহারই হবে উপযোগী। ইচ্ছাও শক্তিবিশেষ, কিন্তু প্রকাশ এর বাইরের জগতে। বাসনা মনের জগতে খেলা করে * *।"[৮]

উপনিষদে আছে: সৃষ্টির আগে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন, বহু বা ভিন্ন হবার সংকল্প তাঁতে বিন্দুমাত্রও ছিল না। ক্রমশ ইচ্ছার উন্মেষ তাঁতে এলো, উদাসীন অচঞ্চল ব্রহ্মে গতিরূপচ্ছলতার প্রকাশ পেল। তিনি এক 'বহু' হলেন; এই 'বহু'-তে বা বিচিত্রতায় রূপান্তরিত (বিবর্তিত) হওয়ার নামই সৃষ্টি বা মায়া। যা ছিল না অথচ এলো, তার স্বরূপ নির্ণয় করাও সহজ নয়। অদ্বৈতবেদান্তে সৃষ্টি বা মায়াকে এজন্যে অনির্বচনীয় অর্থাৎ সৎ নয়, অসৎ নয় ও সদসৎ নয় বলা হয়েছে, অথচ 'কিছু আছে' ('কিঞ্চিদস্তি') একথাও বলা আছে। একেবারে অসৎ হোলে তো সৃষ্টি কোনদিনই ব্যবহারিকভাবেও প্রত্যক্ষের বিষয় হোত না। অজাতবাদীরা আবার বলেন যে, সৃষ্টি কোনদিনই ছিল না, কোনদিনই হবে না আর এখনও নেই। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীরা বলেন: সৃষ্টিকে দেখি বোলেই সৃষ্টির অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, নচেৎ নয়। তবে পরমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ছাড়া সৃষ্টি বা মায়ার অস্তিত্ব সত্যিকারই নেই। এখন যদি বলি: মায়া যদি একেবারে না থাকে তবে এলো কোথা থেকে? স্বামী অভেদানন্দ তার উত্তরে বলেছেন: বিশ্ববৈচিত্র্য ছিল অব্যক্ত, হোল ব্যক্ত, ছিল অপ্রকাশিত, হোল জীব-জগতের প্রকাশ। কিন্তু অপ্রকাশিত ভাবে থাকাও তো পড়ে 'থাকা'-রই কোঠায়, অথচ 'থাকা'-র অস্তিত্বকে মেনে নিলে ব্রহ্মের অসঙ্গতা ও অদ্বিতীয়তাবোধক শ্রুতি হয় নিরর্থক। তাই অনির্বচনীয় অব্যক্ত মায়াকেই মেনে নেওয়া হয়েছে সৃষ্টির কারণ বোলে। অবশ্য নিষ্কারণ ব্রহ্মকেই অদ্বৈতবেদান্ত বলেছে বিশ্ববিকাশের কারণ। এই কারণতাও

৬। "অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ। কল্পিতা এব তে সর্বে বিশেষস্থিন্দ্রিয়ান্তরে ॥"—গৌড়পাদকারিকা ২।১৫

৭। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাব্‌সোলিউট', পৃঃ ৮৫

৮। ঐ, পৃঃ ৮৬

মনীষী ক্রোচেও বলেছেন: "The practical form or activity is the will. * * in which will stands for mental energy, mind or activity in general, so that every act of the human mind is an act of will. * * The blind will is not will; the true will has eyes."—উইলডন কার্: 'দি ফিলজফি অব বেনেদেত্তো ক্রোচে', (১৯২৭) পৃঃ ১০৩-১০৪; ক্রোচে: 'এস্‌থেটিকা' পৃঃ ৫৫-৫৬

ব্রহ্মের গুণ, আর গুণমাত্রেই গুণীর প্রসারতাকে করে সংকীর্ণ, তাই গুণকেও বেদান্তে বলা হয়েছে 'মায়া'। এই মায়ার নির্বচন অদ্বৈতাচার্যেরাও সঠিকভাবে করতে পারেন নি, আর পারেন নি বোলেই মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বেদান্তীদের ওপর আক্ষেপ দিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন: সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না সুতরাং ছিল শূন্য বা অসৎ। বেদান্তবাদীরা যখন বর্ণনা করতে পারেন না মায়া ও ব্রহ্মকে বাক্য ও মন দিয়ে, তখন তা শূন্য ছাড়া আর অন্য কি হোতে পারে? বেদান্তীরা তাতে আপত্তি জানালেন যুক্তির নজির দিয়ে এই বোলে যে, সৃষ্টি হবার আগে বা সৃষ্টিনাশের পরে শূন্যই যদি একমাত্র থাকে তবে শূন্য যে 'আছে' বা 'থাকে' একথারই বা সাক্ষ্য দেয় কে? কাজেই 'আছে', 'ছিল' বা 'থাকে' এসবের অবশ্যই থাকে একজন জ্ঞাতা; [৯] এই শূন্য বা অসতের জ্ঞাতাকেই আমরা বলি ব্রহ্ম যিনি শূন্য থেকে একেবারে আলাদা। অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকেরাও বলেন: সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না, অসৎ থেকেই হয়েছে সৎ-এর উৎপত্তি। স্বামী অভেদানন্দ এ'ধরণের সকল রকম যুক্তিকেই খণ্ডন কোরে বলেছেন: "আমরা এসেছি সকলেই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম-সমুদ্র থেকে, আবার সেখানেই যাব ফিরে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই যদি যায় ধ্বংস হোয়ে, পৃথিবীটা যদি হটাৎ কোন গ্রহের বা ধূমকেতুর সংঘর্ষে এসে পরিণত হয় আবার নিহারীকাস্তূপে, আমরা সকলেই তাহোলে যাব বা থাকব কোথা? আমরা যাব বা থাকব সেখানেই যেখান থেকে আমরা এসেছি, অর্থাৎ কার্য থেকে কারণ অবস্থায় আবার আমরা যাব ফিরে; আমরা কারণরূপী প্রকৃতিতেই থাকব অব্যক্ত আকারে, কোন-কিছুরই ধ্বংস আমাদের হবে না।[১০] তিনি আরও বলেছেন: "একেবারে ধ্বংস বোলে কোন জিনিসই নেই; জগতে ধ্বংস বলতে কার্যেরই কারণাবস্থায় ফিরে যাওয়া বোঝায়। আমাদের কোনদিনই ধ্বংস হবে না, পার্থিব শরীর আমাদের নষ্ট হোতে পারে, কিন্তু যে পঞ্চভূত বা আদি পঞ্চতন্মাত্র থেকে সৃষ্টি লাভ করেছি, সেখানেই আমরা যাব আবার ফিরে, নতুন বিশ্বের হবে সৃষ্টি; আমরাও বেঁচে থাকব অনন্তকাল। পুরোতন এই জড় পৃথিবীটা ধ্বংস হোয়ে গেলেও গড়ে উঠবে তার বুকে আবার নতুন পৃথিবী, নতুন পৃথিবীর সাথে সাথে সৃষ্টি হবে নতুন সৌরজগৎ ও নতুন গ্রহ-উপগ্রহ: এটাই প্রকৃতি বা সৃষ্টির নিয়ম। এই অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যেই আমরা থাকব বেঁচে। এর নামই ব্রহ্মের লীলা, লীলার বা স্বেচ্ছায় নিরাসক্ত খেলার ভিতর আমরা নিজের স্বরূপের কথা যাই ভুলে; আমরা সত্যিকার কি ও কি যে আমরা করছি এসব কথাই যাই একেবারে বিস্মৃত হোয়ে। আমরা খেলা করি শিশুর মতো—শিশুরা যেমন চোখ বেঁধে খেলে রাস্তার ওপর কাণামাছি খেলা।"[১১] যাইহোক স্বামী অভেদানন্দ মায়া ও সৃষ্টি-বিষয়ে অনুসরণ করেছেন সাংখ্য ও বেদান্তেরই ধারাকে।

৯। প্রশ্ন উপনিষদে ঠিক এ ধরণের একটি বিচার আছে। আচার্য শংকর বলেছেন: "বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়ত্যেবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্যাভাবঃ কেন কল্প্যেত ইতি বাক্তব্যম্ বৈনাশিকেন। তদভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্‌জ্ঞানাভাবে তদনুপপত্তেঃ। * * অভাবোঽপি জ্ঞেয়োঽভ্যুপগম্যতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ।"

—প্রশ্ন উপনিষৎ ১।৬।২

১০। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান্ টু দি এ্যবে্‌সোলিউট', পৃঃ ১৮৪

১১। ঐ, পৃঃ ১৮৪

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "অহং অভিমানই সৃষ্টি করে মনের রূপ। এই 'আমি' অভিমান থাকে সুপ্ত আমাদেরই শরীরের প্রত্যেকটি অণুকোষের (cell) ভিতর। প্রত্যেকটি অণুকোষেরই আছে আবার মন, আছে স্মৃতিশক্তি ও অনুভূতি। আমাদের শরীর সৃষ্টি হয়েছে ঐ অণুকোষেরই সমষ্টিতে। প্রত্যেক অণুকোষের আছে আবার ব্যক্তিত্ব। ওই ব্যক্তিত্বের অভিমানই তৈরী করে মনকে।"[১২] মনকে বলা হয়েছে তাই অভিমানেরই সমষ্টি। মন বা অন্তঃকরণের অন্যতম রূপ বা বিকাশের নামই অহং-অভিমান। অহং-অভিমানই সৃষ্টি করে আসলে বৈচিত্র্যের রূপ কল্পনার উপাদান দিয়ে।

কিন্তু এও তো গেল ব্যষ্টি মনের কথা। সমষ্টি মনও সৃষ্টি হয় ব্যষ্টিমনের সমবায়ে; সমষ্টি মন থাকে প্রাণীর অবচেতন মনের অন্তস্থলে। এই অবচেতন মনই সৃষ্টি করে বিচিত্র সংসার; অবচেতন মনের অজ্ঞাত স্তরেই লুকোনো থাকে জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সংস্কার। নতুন সংস্কারও সৃষ্টি হয় অজস্রভাবে; সকল সংস্কারই থাকে ঐ অজ্ঞাত অবচেতন মনের মধ্যে লুকিয়ে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: অবচেতন মনের প্রসারতা চেতন মন থেকেও অনেক বড়, সুবিশাল এর ক্ষেত্র। জীবনের প্রত্যেকটি অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার পিছনে থাকে ঐ অবচেতন মনের ইঙ্গিত। অবচেতনের সুপ্ত সংস্কারই হয় জাগ্রত; অপরিসীম শক্তি ঐ বীজাকারে সুপ্ত সংস্কারগুলির; অবচেতনকে তাই বলি আমরা সচেতন মন-সমুদ্রেরই উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা।"[১৩] স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন: "জাগ্রতের ব্যষ্টি মনকে তুলনা করা যেতে পারে অনন্ত সুবিশাল অবচেতন মন-সমুদ্রের একটি জলবিন্দুর সাথে। * * অবচেতনের গভীর অন্তস্থলে থাকে সঞ্চিত শুধু এই জীবনেরই নয়, অতীত অসংখ্য জীবনেরই চিন্তা ও কার্যের সূক্ষ্ম-সংস্কার। বিষয়ীরূপী মনকে বলা যেতে পারে তাই বিরাট অসীম তরঙ্গায়িত সমুদ্র ('This great boundless ocean of subjective mind')।"[১৪] শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'লাইফ ডিভাইন' বইয়ে অবচেতন মনকে বলেছেন: 'পর-মন'; এই পর-মনের প্রসারতা সুবিশাল, অনন্ত ও অসীম ('supermind is vast and limitless')। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়ার চলমান উৎস ও বিশ্বের স্রষ্টা এই পর-মন ('the creatrix of the world')। ডাঃ ফ্রয়েড বলেছেন: "বাস্তব জগতের কর্ম-চেতনা মুখর ও চঞ্চল হোয়ে ওঠে অবচেতন মনেরই প্রেরণা পেয়ে। বংশানুক্রমিকতার প্রভাবে মনের কোনে সেগুলি হয় সঞ্চিত; এই অবচেতন মনের বুকেই থাকে সাধারণ চারিত্রিক উপাদানের ধারা যারা বংশপারম্পর্যের মধ্যে সংক্রমিত হোয়ে সৃষ্টি করে মানুষ ও জাতির প্রকৃতি। * * অজ্ঞাত অবচেতন মন থেকেই সৃষ্টি হয় আমাদের দৈনন্দিন চেষ্টার বেশীর ভাগ অংশ যদিও থাকে তারা আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্পূর্ণ অগোচরে।"[১৫] মনোবিজ্ঞানবিৎ লি বন্ বলেছেন:

১২। ঐ, পৃঃ ১৮৫

১৩। ঐ পৃঃ ৪৪, ৪৮; 'স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট', পৃঃ ১৮, ১৯, ২০, ২২

১৪। 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, (৩য় সংস্করণ), ৬ষ্ঠ ভাগ' পৃঃ ২৫-২৮

১৫। ডাঃ ফ্রয়েড: 'গ্রুপ সাইকোলজি এ্যাণ্ড দি এ্যানালিসিস অব দি ইগো,' ৩য় সংস্করণ ১৯৪৫), পৃঃ ৮

'চেতন মনের উপযোগীতা অল্প ,আমাদের অবচেতন মনের তুলনায়'। ডাঃ ইয়ুঙ অবচেতন মনের তুলনা করেছেন রাত্রিকালের সঙ্গে ও চেতন মনকে বলেছেন দিনের আলো। ১৬

মোটকথা অবচেতন মন তথা অব্যক্ত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব-সংসার। এই অব্যক্তের অপর নাম সগুণব্রহ্ম যিনি কারণাবস্থায় অব্যক্তচৈতন্ত ঈশ্বর ও কার্য্যাবস্থায় ব্যক্তচৈতন্ত হিরণ্যগর্ভ। ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভে ভেদ কেবল কার্য ও কারণে, কিন্তু একেরই দুটি নাম ও রূপ। এই কার্য-কারণরূপী ঈশ্বর বা ব্রহ্মাকেই বলা হয় বিশ্বস্রষ্টা। সৃষ্টি যতক্ষণ থাকিবে, স্রষ্টার অস্তিত্বকে ততক্ষণ মেনে নিতে হবে। কার্য যেমন কারণ ছাড়া থাকতে পারে না, এই বিরাট বিশ্ববৈচিত্র্য-রূপ কার্যের কারণরূপে স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তেমনি স্বীকার করা হয়। সাংখ্যকার কপিল জগৎকারণ হিসাবে ঈশ্বর স্বীকার করেন নি, তিনি প্রকৃতিকে উপাদান কারণ ও পুরুষকে বলেছেন নিমিত্তকারণ। তবে কপিল কার্য-কারণকে অভেদ বলেছেন: কার্য ব্যক্ত ও কারণ অব্যক্ত। বৈশেষিককার কণাদ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বলেছেন নিমিত্তকারণ আর পরমাণুকে বলেছেন উপাদানকারণ। ন্যায়দর্শনকার গৌতমও জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া-শক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনেছেন। পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনী ও তাঁর অনুবর্তীরা স্বীকার করেছন অদৃষ্ট বা অপূর্ব, ঈশ্বরের উপযোগীতা তাঁর দর্শনেও নাই। এক অদ্বৈতবেদান্তেই ব্রহ্মকে বলা হয়েছে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ দুইই। এই ব্রহ্ম কিন্তু কারণ-উপলক্ষিত সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ। বেদান্তে সৃষ্টিকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের লীলাবিলাস, নিজের মহিমাকে বোঝার জন্তেই তাঁর স্বেচ্ছায় অপ্রযত্নযুক্ত লীলা। ভাগবত ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশ্বের ঐশ্বর্যকে বর্ণনা করা হয়েছে ষড়ৈশ্বর্যশালী সর্বগুণ-কল্যাণকর ভগবানেরই প্রেমের খেলা। লীলাবাদ

অধ্যাপক লো তাঁর সাইকোঅ্যানালিসিস্' (১৯২০) বইয়েও (পৃঃ ৪০) বলেছেন: "* * so large a part of our psychic life remains and operates in the Unconscious that we are perforce unware of it. * *।" এ ছাড়া জে. জ্যাস্ট্রো: 'দি সাব্‌কনসাস্‌নেস' (১৯০৬) দ্রষ্টব্য।

১৬। (ক) "We may call consciousness the daylight realm of the human psyche, and contrast it with the nocturnal realm of unconscious phychic activity which we apprehend as dreamlike fantasy. * * and it is highly probable that the unconscious psyche contains a wealth of contents and living forms equal to or *even greater* that does consciousness' * *."– ডাঃ ইয়ুঙ্: মডার্ন ম্যান্ ইন সার্চ অব এ সোল' (১৯৪৫), পৃঃ ১৩

(খ) অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনও বলেছেন: " * * greater part of our mind is hidden from us. It is burried or repressed and yet affects our waking consciousness.—'এান্ আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অব লাইফ' (১৯৩৭), পৃঃ ২৬৪,২১৫

(গ) (i) এ ছাড়া হার্টম্যান: "দি ফিলজফি অব দি আন্‌কন্‌সাস্‌নেস্' ; (ii) মায়ার্স: 'হিউম্যান্ পারসোন্তালিটি এ্যাণ্ড ইট্‌স্ সার্ভাইভাল্ অব বডিলি ডেথ্' (১৯০৬), ১ম ভাগ পৃঃ ১২ ; (iii) মিস্ সিনক্লেয়ার্: 'এ ডিফেন্স অব আইডিয়ালিজম্' (১৯১৭), পৃঃ ২৫৯ ; (iv) মার্শাল: কর্ণসাস্‌নেস্' (১৯০৯), পৃঃ ২০ ; (v) ড্রিমার: 'বডি এ্যাণ্ড সোল' (১৯০৯), পৃঃ ৩৯ ; (vi) ওর্‌চেস্টার: রিলিজিয়ন্ এ্যাণ্ড মেডিসিন্' (১৯০৮) পৃঃ ৪২ ; (vii) অধ্যাপক প্র্যাট্: 'দি রিলীজিয়াস্ কনসাস্‌নেস্' (১৯৪৫) পৃঃ ৪৮-৫১।

একদিক থেকে বৈষ্ণবদর্শনেরই যেন নিজস্ব জিনিস।[১৭] রামানুজও এই লীলার মাধুর্য স্বীকার করেছেন। শৈবদর্শনের সিদ্ধান্তও তাই। আচার্য শংকরও সৃষ্টির ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের লীলা স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতিও সৃষ্টির দিক থেকে ঈশ্বরের লীলাকে অস্বীকার করেন নি। শ্রীঅরবিন্দও সৃষ্টিকে বলেছেন স্বেচ্ছাকৃত প্রকাশ বা শক্তির খেলা।[১৮] অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের মতবাদের ওপর তন্ত্রসাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। বেদান্তসূত্রে ব্যাসও উল্লেখ করেছেন: "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (২।১।৩৩); —লোকে লীলার জন্যে স্বেচ্ছায় যে কাজ কোরে থাকে, ব্রহ্মও বিনা প্রয়োজনে জগতের আকারে বিবর্তিত হন। ভাষ্যে শংকরও বলেছেন: "কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয় ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তিঃ, যথা চ উচ্ছাসপ্রশ্বাসাদয়ঃ অনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সংভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ-প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি।" চেষ্টা বা পরিশ্রম না কোরেই অনায়াসে যেমন আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি, ঈশ্বরও তেমনি মায়াকে (ইচ্ছাকে) নিজের সম্পূর্ণ বশে রেখে অথচ মায়ার সাহায্যেই বিশ্ববৈচিত্র্যকে 'যেন' সৃষ্টি করেন। আচার্য শংকর গীতাভাষ্যের গোড়াকার দিকে এই 'যেন' (ইব) শব্দের উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যকার লিখেছেন: "স চ ভগবান * * ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলা প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ * *।" টীকাকার আনন্দগিরিও 'ইব' বা 'যেন' শব্দ সম্বন্ধে বলেছেন: "কল্পিত—'ইবকারাভ্যাং * * কল্পিতত্বং দ্যোততে।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও শক্তি স্বীকার কোরে সৃষ্টি বা সংসার সম্বন্ধে বলেছেন: "তিনি লীলাময়ী; এ'সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী আনন্দময়ী।"[১৯] নাথ-যোগিগণ আবার সৃষ্টিকে বলেছেন 'গতি' ও সেই গতির মূল উপাদানকে শক্তি ও স্থিতিকে বলেছেন শিব। তাঁদের মতে শিবের অভিন্ন মূর্তি শক্তির[২০] নিজের পরিণামেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়েছে। কার্যরূপ সৃষ্টি থাকার জন্যেই কারণত্ব ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন, নচেৎ তত্ত্বদৃষ্টিতে সমষ্টি (ব্রহ্মাণ্ড) ও ব্যষ্টি (পিণ্ড)-সৃষ্টির কোন পরমার্থিক সত্তা ও সার্থকতা নেই—"নাস্তি সত্য-বিচারেঽস্মিন্ উৎপত্তিশ্চাণ্ডপিণ্ডয়োঃ, তথাপি লোকবৃত্ত্যর্থং বক্ষ্যে সৎ-সম্প্রদায়তঃ।" অবশ্য অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তও তাই যে, পরমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি নাই, সৃষ্টির উপযোগীতা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই মাত্র আছে। মাণ্ডুক্যকারিকায় গৌড়পাদ, ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ্ভাষ্যে শংকর ও তাঁর অনুবর্তীদের বেশীর ভাগ এই সিদ্ধান্তের অনুগামী।

১৭। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে: 'আর্লি হিষ্ট্রী অব দি বৈষ্ণব ফেথ্ এ্যাণ্ড মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল' (১৯৪২), পৃঃ ২৬০

১৮। 'অরবিন্দ এ্যানুয়েল নাম্বার' (১৯৪২), পৃঃ ৩৩

১৯। শ্রীম: 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', (১ম ভাগ, পৃঃ ৫১

২০। (ক) "স্বাভিন্না স্বস্বরূপভূতা নিত্যা শক্তিঃ"।

(খ) "তস্য ইচ্ছামাত্রধর্মা ধর্মিণী নিজা শক্তিঃ প্রসিদ্ধা"।—সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি ১।৫

তবে জৈনেরা সৃষ্টি ও পালনকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরা বরং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নানান যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁরা বলেন: জগৎ যদি কার্য হয় তাহোলে ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ তা প্রমাণ হয় না। তাছাড়া ঈশ্বর যদি জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী তাদের সৃষ্টি করেন তবে ঈশ্বর যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তাও প্রমাণ করা যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সৃষ্টির সার্থকতা স্বীকার করেছেন, তবে কাণ্ট, ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়-বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক সৃষ্টিকে অদ্বৈত-বেদান্তীদের মতো ব্যবহারিকভাবে আপেক্ষিক সত্য বলেছেন, আর পারমার্থিকভাবে অসত্য বোলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, সৃষ্টি আছে বোলেই স্রষ্টার উপযোগীতা, নচেৎ অদ্বৈতবেদান্তের সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা মোটেই নেই, আর স্রষ্টা ঈশ্বরও সংসারবিরহী শুদ্ধব্রহ্ম নন। স্বামী অভেদানন্দও বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা কোরে বলেছেন: "উদাহরণ-রূপে স্রষ্টার ধারণা সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্। আচ্ছা, স্রষ্টা কি মায়ানির্মুক্ত শুদ্ধব্রহ্ম? না, স্রষ্টা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী, সৃষ্টিকে অপেক্ষা কোরেই স্রষ্টার আসন নির্বাচিত হয়েছে, তাই সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার অবিচ্ছেদ্য ও আপেক্ষিক সম্বন্ধ। সৃষ্টির ধারণা যদি মন থেকে মুছে দেওয়া যায় তবে স্রষ্টারূপ ভগবানের অস্তিত্বও আর থাকে না। তাই 'স্রষ্টা' বা 'ঈশ্বর' এক একটি নামবিশেষ, এই নামের সাথে নামীর থাকে একটি সম্পর্ক, সেই সম্পর্কই বিশেষিত করে নামীকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বোলে—আসলে তা যাই হোক না কেন। সুতরাং একথা সত্যি যে, বিশ্বস্রষ্টা বা ঈশ্বর মায়ানির্মুক্ত শুদ্ধব্রহ্ম নন।"[২১]

এখন—প্রশ্ন সৃষ্টিকারী ঈশ্বর কে? উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "তিনি শুদ্ধব্রহ্মেরই প্রথম প্রকাশ। ব্রহ্মের নিজের ভিতর থেকেই ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন। এই ঈশ্বরই অব্যক্ত বা বিশ্বপ্রকৃতি মহামায়া; সৃষ্টি সেই অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি থেকে ব্যক্ত হয় মাত্র।"[২২] এখন এর পর আর একটি প্রশ্ন ওঠে: যদি সগুণঈশ্বর বা মূলা প্রকৃতি অব্যক্তের গর্ভ থেকেই সমগ্র বিশ্বের অভিব্যক্তি হয় তাহোলে অব্যক্ত বীজের আকারে বিশ্ব-সংসার বা সৃষ্টি নিশ্চয়ই শুদ্ধব্রহ্মের মধ্যে লুকোনো থাকে আর তাহোলেই শুদ্ধব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয়ও বলা যায় না এবং সংসার বা সৃষ্টি যে অনিত্য তারও কোন প্রমাণ হয় না। এ' প্রশ্নের উত্তরও স্বামী অভেদানন্দ সহজ ও সরলভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "সৃষ্টি আরম্ভ হয় সগুণব্রহ্ম থেকে। নির্গুণব্রহ্মে যখন মায়া তথা কোন রকম ইচ্ছা বা কল্পনার লেশমাত্র থাকে না তখন কোন-কিছু ক্রিয়া বা পরিবর্তন সেখানে থাকা অসম্ভব। সৃষ্টির কল্পনা সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর বা অব্যক্ত থেকেই শুরু হয়। সগুণব্রহ্মের রূপকে আসলে দু'রকমভাবে আমরা ভাগ করতে পারি তা আগেও উল্লেখ করেছি। এই দু'রকম যেমন (১) ঈশ্বর ও (২) হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। ঈশ্বরে সৃষ্টির বীজ অজ্ঞান কারণাকারে থাকে, এজন্যে সৃষ্টির প্রকাশ সেখানে হয় না। হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরে কারণ কার্যের আকারে প্রকাশ পায়; তখন সৃষ্টির রূপ মূর্ত।

২১। অভেদানন্দ "আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট," পৃঃ ১৮৮

২২। ঐ, পৃঃ ১৮৮-১৮৯

তাই ঈশ্বর বা বিশ্বস্রষ্টা বলতে আমরা হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরকেই বুঝব। ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভ বস্তুত এক—প্রকাশেই যা ভিন্ন। বেদান্তে তুরীয় বা চতুর্থ ব্রহ্মের কল্পনা করা হয়েছে সৃষ্টির বা অজ্ঞানের এলাকা থেকে ব্রহ্মকে নির্মুক্ত দেখাবার জন্যে, নচেৎ তুরীয় ব্রহ্ম বোলে ব্রহ্মের কোন পদবী বা নাম থাকা যুক্তিসংগত নয়। মোটকথা সৃষ্টির কল্পনা আমরা করি ঈশ্বর তথা অব্যক্ত থেকে আর তা অভিব্যক্ত হয় হিরণ্যগর্ভে।

নব্যবস্তুতন্ত্রবাদী ইংরেজ দার্শনিক আলেক্‌জাণ্ডার বলেছেন: "ঈশ্বর আমাদের উন্নত কল্পনা-প্রসূত বস্তুমাত্র, কল্পনা দিয়েই আমরা বিশ্ব-পরিপোষণকারী ও পবিত্র প্রেরণার উৎসস্বরূপ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি।"[২৩] স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "মায়াবিরহী নির্গুণব্রহ্মকে বুদ্ধি-বিচার দিয়ে বোঝায় পক্ষে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরই তার সর্বোচ্চ সীমা। সুতরাং চেয়ার যতটুকু সত্য, বাস্তবজগৎ যতটুকু সত্য, ঈশ্বরও ততটুকুই সত্য, তার কম-ও বেশী নয়। এই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণ শুদ্ধব্রহ্ম নন্। নিরাকার নির্গুণব্রহ্মের সর্বোচ্চ বিকাশ ঈশ্বর—এই পর্যন্তই বলা যায়। তুমি ও আমি অল্প বিকাশসম্পন্ন, কিন্তু যতটুকু আমরা ধারণা করতে পারি, তার অনুযায়ী সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরের বিকাশই বাস্তবতার চরম-বিকাশ।"[২৪] স্বামী অভেদানন্দও বলেছেন যে, ঈশ্বর শুদ্ধব্রহ্ম নন। মোটকথা ঈশ্বর থেকে জীবজগৎ পর্যন্ত দূরত্ব নিয়ে একটি বৃত্ত-রচনার কল্পনা করলে তা অজ্ঞানের এলাকা বোলেই গণ্য হবে, সেজন্যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও অজ্ঞানের অন্তর্গত। অধ্যাপক সোর্লে'র (Prof. Sorely) বলেছেন: "সুতরাং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে চরমসত্য বোলে আমরা মনে করতে পারি না; কাজেই তাকে পরিশুদ্ধ ব্রহ্ম বোল্লে ভুল করা হবে।"[২৫] গুণ থাকা ও না-থাকা নিয়েই একমাত্র ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য আমরা কল্পনা করি। দার্শনিক আলেকজাণ্ডার বলেছেন: মতবাদের খাতিরেই আমরা একই ব্রহ্মচৈতন্যকে পূর্ণ ও অপূর্ণ—বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বগত (ট্রান্সানডান্ট্ এ্যাণ্ড ইমানান্ট্), নির্গুণ ও সগুণ বলি। "এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।"[২৬]

আসলে এই সব বাদ-প্রতিবাদের কথা ছেড়ে দিলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এক ব্রহ্মই সব-কিছু হয়েছেন: জীব, জগৎ, ঈশ্বর—

২৩। আলেক্‌জাণ্ডার: "স্পেস্, টাইম এ্যাণ্ড ডিটি," ২য় ভাগ পৃঃ ৩৪১-৩৪২

২৪। "Personal god is the highest reading that can be attained to, of that Impersonal, by the human intellect, * * which we can conceive."—*Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I,* p. 377-378.

২৫। অধ্যাপক সোর্লে: "মরাল্ ভ্যালুজ্ এ্যাণ্ড দি আইডিয়া অব গড্" (১৯২১), পৃঃ ৪৮৫

২৬। (ক) আলেক্‌জাণ্ডার: 'স্পেস্ টাইম এণ্ড ডিটি,' (১৯৩৪) ২য় ভাগ, পৃঃ ৯০; (খ) অধ্যাপক হাক্সলি: 'দি পেরিনিয়াল ফিলজফি' (১৯৪৬), পৃঃ ৩০ ও (গ) আর. জি. কলিঙউড: 'দি আইডিয়া অব নেচার' (১৯৪৫), পৃঃ ৫৭-৬৫।

সব। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যে সাপেক্ষিকতা বা নিরপেক্ষিকতার প্রশ্ন তোলাই ভুল। তিনিই জগতের একমাত্র সত্য, তিনি ছাড়া আর সবই পরিবর্তনশীল অনিত্য। দার্শনিক ব্র্যাড্‌লের অভিমতও তাই। তিনিও বলেছেন: 'সসীমতা ও অসীমতা—এ দুটির কোনটিই ব্রহ্মের বিশেষণ বা গুণ হোতে পারে না।'[২৭]

স্বামী অভেদানন্দের সিদ্ধান্তও তাই। সৃষ্টির জন্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব মানুষ স্বীকার করেছে, সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসারে সান্ত্বনা পাবার জন্যে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কোরে তাঁর কাছে প্রাণের বেদনা সে জানায়। তন্ত্রকারও বলেছেন: 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' অনেকে নৈতিক নীতির খাতিরে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন—যেমন ইমানুয়েল কাণ্ট। কাণ্ট বলেছেন: বিচার বা বুদ্ধিই (Reason or Intellect) প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করে। 'পরিচালক' বা 'স্রষ্টা' শব্দগুলিকেও নৈতিক নীতি ও নিয়মের দিক থেকে বিচার করতে হবে। কাণ্ট বিশ্বোত্তীর্ণ পরিপূর্ণ সত্য (Noumenon) ছাড়া বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রতীকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন যুক্তিসিদ্ধ নৈতিক নিয়মেরই ('*categorical imperative*'[২৮] or 'the moral law which is intuited by reason') খাতিরে। এই নৈতিক নিয়মকে কাণ্ট 'ইম্‌পারেটিভ্‌' বা আদেশমূলক অবশ্য-কর্তব্য বোলে উল্লেখ করেছেন; সুখ, ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কোনরকমের পার্থিব ফললাভের সম্ভবনা এতে নেই, একে একমাত্র অবশ্য-পালনীয় নীতি বোলেই গণ্য করতে হবে। এই নৈতিক নিয়ম মানার পিছনে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রশ্ন অথবা কোন সর্ত নেই, মানা কর্তব্য সুতরাং মান্‌তে হবে—এই ভাব। কিন্তু কাণ্টের এই অবশ্য-পালনীয় নৈতিক নীতি বুদ্ধি বা বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোলেও কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা বলা কঠিন; কেননা মানুষ ভগবান মানে বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে তার নিজের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতির ভাব ও প্রেরণা থেকে, বাধ্যবাধকতা বা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার স্থান সেখানে নেই। অথচ কাণ্ট কোন ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে মোটেই রাজী নন। যাই হোক কাণ্ট নৈতিক নিয়মকে (moral law) বলেছেন: ঈশ্বরের প্রথম স্পষ্ট বিকাশ ('the first manifestation of God') বা ঈশ্বরেরই পবিত্র ইচ্ছার অপরিহার্য অভিব্যক্তি ('*necessary revelation*'), মনীষী ওয়েবারের ভাষায় বল্‌তে গেলে কাণ্টের ঈশ্বর অপার্থিব আদর্শেরই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা বা কল্যাণময়ী ইচ্ছা ('Freedom in the service of the ideal or the good will—*der Gute Wille*')।[২৯] ঈশ্বরের প্রকাশ হয় স্বাধীন ইচ্ছার ভিতর দিয়ে, কিন্তু আসলে ইচ্ছাও নৈতিক নিয়মকে তা কোনদিন লঙ্ঘন করতে পারে না। কাণ্ট নিজেও তাই একমাত্র

২৭। "In short, relativity and self-transcendence, or, as we may call it, ideality, cannot as such be the character of Reality." ব্র্যাড্‌লে: 'এ্যাপিয়ারেন্স্‌ এ্যাণ্ড রিয়ালিটি,' (১৯৩০), পৃঃ ৩০৯

২৮। 'ক্যাটিগোরিক্যাল্‌ ইম্‌পারেটিভ্‌ সম্ভব কিনা'—এ সম্বন্ধে টি. কে. এ্যাবোট অনূদিত 'কাণ্টস্‌ ক্রিটিক্‌ অব প্র্যাক্‌টিকাল রিজ্‌ন্‌' (১৯০৯), পৃঃ ৭৩-৭৫

২৯। ওয়েবার: 'হিষ্ট্রী অব ফিলজফি,' পৃঃ ৪৬৬

নীতির অনুরোধেই ('for the moral obligation') বিচার ও ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বর স্বীকার করেছেন। তবে ঈশ্বরকে তিনি প্রাকৃতিক ও নৈতিক জগতের কেন্দ্র ও উৎসরূপেই গণ্য করেছেন। মনীষী সোয়েগ্‌লারও বলেছেন: "কি প্রাকৃতিক, কি নৈতিক—উভয় জগতেই একজন সাধারণ নিয়ন্তার দরকার আছে। এই নিয়ন্তা সকলেরই মন ও বুদ্ধি-সম্বন্ধে সচেতন আর সেই অনুসারে তিনি আমাদের কল্যাণ-আশীর্বাদ বিতরণ করেন। এই রকম গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ঈশ্বর।"[৩০] কাণ্ট নিজেও স্বীকার করেছেন: "সুতরাং জগতে পরমার্থ লাভ একমাত্র সম্ভব হয় যদি আমরা স্বীকার কোরে নিই সর্বশক্তিমান ভগবানকে মহান্ পুরুষরূপে কল্পনা কোরে; অবশ্য নৈতিক প্রকৃতির অনুযায়ী কারণ একটি তার পিছনে নিশ্চয়ই থাক্‌বে।"[৩১] তবে একথা সত্যি যে, কাণ্ট ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি বোলে স্বীকার করতে রাজী নন, তিনি ঈশ্বরকে মেনে নিয়েছেন সকলের জ্ঞাতা বা মানুষেরই দিব্যচিন্তার পরিণতি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী বোলে। অধ্যাপক লেয়ার্ডও উল্লেখ করেছেন যে, কাণ্ট নৈতিক প্রয়োজনে ঈশ্বর স্বীকার করলেও আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের মনের ওপর নির্ভর করে; অথবা বলা যায়, আমাদের নৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্যে আমরাই ঈশ্বর বা একজন ভাগ্য-বিধাতাকে স্বীকার কোরে নিই।[৩২]

পরিশেষে সৃষ্টি বা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "সমস্ত জীব-জগৎই প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীব-জগৎ অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে অসংখ্য বুদ্‌বুদ। * * আমরা বলি: এরা আমার বন্ধু, এই আমার দেশ, এরা আমার আত্মীয় ও পরিজনবর্গ, এরা আমার শত্রু। কিন্তু সবই মায়ার খেলা।"[৩৩] এখানে

৩০। (ক) এ. সোয়েগলার: 'হিষ্টরী অব ফিলজফি,' পৃ: ২৩৭; এছাড়া (খ) ফল্‌কেনবর্গ: 'হিষ্টরী অব মডার্ণ ফিলজফি'' পৃ: ৩৯৩; (গ) অধ্যাপক জেনেট: 'থিওরী অব মরালস্‌', পৃ: ৪৮২; (ঘ) এ. ই. টেলর: 'থিইজ্‌ম্‌', (এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন্ এ্যাণ্ড এথিকস্‌', (১৩শ ভাগ), পৃ: ২৭৪—২৭৬

৩১। 'Therefore, the *Summum bonum* is possible in the world only on the supposition of a Supreme Being having a causality corresponding to moral character. * * therefore the supreme cause of nature, which must be presupposed as a condition of the *Summum bonum* is a being which is the cause of nature by *intelligence* and *will*, consequently its author, that is God. * * that is, it is morally necessary to assume the existence of God."—টি. কে. এ্যাবোট অনুদিত 'কাণ্টাস্ ক্রিটিক্ অব প্র্যাক্‌টিকাল রিজ্‌ন্' (১৯০৯), পৃ: ২২১—২২২

৩২। "Kant's language was bold. He called God the ideal of a substance that we ourselves fashion, * * God is not being outside me, but only a thought within me. * * There is but one God in me, around me and above me"—অধ্যাপক লেয়ার্ড: 'মাইণ্ড এ্যাণ্ড ডিটি', পৃ: ২০৭-২০৮

৩৩। "All these phenomena are nothing but dreams. They are like waves in that eternal ocean. * * All these are *delusions*."—'আত্মার রিলেশান্ টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃ: ১৯১

স্বামী অভেদানন্দ সৃষ্টিকে পরিবর্তনশীল বোলে অনিত্য বা মিথ্যাই বলেছেন। আপেক্ষিক বস্তুমাত্রেই যখন নিরপেক্ষ ও নিত্য নয় তখন ঈশ্বর বা স্রষ্টার সিংহাসনও অবিচল থাকে একমাত্র সৃষ্টিকে অপেক্ষা কোরে, নচেৎ নয়; কাজেই ঈশ্বরকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কখনই নিত্য ও শাশ্বত বলা যায় না। তবে সৃষ্টি চিরদিনই থাকবে সত্য হোয়ে তাদের কাছে যারা নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূর করতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞান ও মোহমুক্ত হোয়ে জীবন্মুক্তির কল্যাণময় আশীর্বাদ যাঁরা পেয়েছেন নিজেদের ভাগবত জীবনে, সৃষ্টি ও স্রষ্টা তাঁদের কাছে প্রতীত হয় মায়িক জগতেরই জিনিস হিসাবে আর সত্য বোলে প্রতিভাত হয় একমাত্র শাশ্বত ব্রহ্মচৈতন্য। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: তাঁরা মনুষ্যসমাজে থাকেন মূর্তিমান দেবতার মতো, হৃদয়গ্রন্থি তাঁদের হয় ছিন্ন, সমস্ত সংশয় হয় দূরীভূত, সকল কর্মের হয় ক্ষয়, সংসারে সকল কর্মের ভিতর বাস করেন তাঁরা নিরাসক্তভাবে।

কিন্তু অজ্ঞানের জগতে যারা বাস করে, অথবা লক্ষ্যের পথে যারা অবিশ্রান্ত গতিতে ছোটে, তাদের পক্ষে পরিপূর্ণ একটি আদর্শকে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা ঈশ্বরকে করে তাদের সান্ত্বনার স্থল, মনের দুঃখ কষ্ট ব্যাকুলতা সকল-কিছুই জানায় নিরাশার ভিতর আশার আলো পাবার জন্যে। তাদের জন্যে আছে সাধনার প্রয়োজন ও সাধনাও করে তারা সেব্য-সেবক—পূজ্য-পূজক সম্বন্ধ নিয়ে। দ্বৈতজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মাটির মূল্যই থাকে বেশী, মমতা থাকে বাসনা-কামনার ওপর, সাধনাও করে মানুষ দেব-দেবী, ইষ্ট, ভগবান এইসবকে নিয়ে। অবশ্য দ্বৈতজ্ঞানে এ'সকলের প্রয়োজনকে স্বীকার কোরেই নিতে হয়। তারপর মানুষ ভগবানের সঙ্গে পাতায় মধুর এক সম্বন্ধ, আত্মনিবেদন করে মায়া-মমতার আকর্ষণকে কিছুটা কমিয়ে দিয়ে, জীব ও জগৎকে ভাবে ঈশ্বরেরই অংশ বোলে, ঈশ্বরের সেবা ও সেবকের ভাবকেই কোরে নেয় জীবনের চরম-লক্ষ্য বোলে। ক্রমে ধারণারও বিকাশ হয় অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে, ঈশ্বর, জীব ও জগতের প্রার্থক্যকে ভোলে মানুষ বিবেক-বিচারের আশ্রয় নিয়ে, বাইরের সকল-কিছু থেকে মনকে কেন্দ্রিভূত করে অন্তরাত্মার দিকে, ঈশ্বরের আসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিজেরই আন্তর ক্ষেত্রে, অজ্ঞানতার অন্ধকার জ্ঞানের শুভ্রতায় হয় উদ্ভাসিত, সৃষ্টির মাধুর্য হয় লীলার সার্থকতাকে নিয়ে পরিপূর্ণ, সংসারের বন্ধন হয় তখন স্বার্থলেশহীন আনন্দেরই অফুরন্ত প্রবাহ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার দূরত্বও হয় একাকার আত্মানুভূতির অমৃতময় পবিত্র আলোকে।

—ষষ্ঠ আলোচনা—

ব্রহ্ম ও মায়া

মায়া বলতে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : যা আমাদের মুগ্ধ করে ও ভুলিয়ে রাখে। আমরা জন্ম-মৃত্যুশীল মানুষ নই, অমরত্বের চির অধিকারী—এরহস্য যে মোহ বা অজ্ঞানের জন্যে আমরা জানতে পারিনি তার নামই 'মায়া'। মোটকথা আমাদের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানের নামই মায়া বা অবিদ্যা। এই মায়ার অপর নাম প্রকৃতি--ইংরেজীতে যাকে 'নেচার' বলে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : " 'নেচার'-কে সংস্কৃত ভাষায় মায়া বলে। নেচার বা প্রকৃতি আমাদের মায়ায় আবদ্ধ করলেও প্রকৃতির পরিবেশেই আমরা বাস করি। আমাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সমস্তই প্রকৃতির অপরিহার্য অংশ। যতই প্রকৃতিকে জানতে চেষ্টা করব ততই এর মোহে আমরা আবদ্ধ হব, কিছুতেই চরম-সমাধান এর আর হবে না। বৈজ্ঞানিকেরা সামান্য-কিছু সমাধান এর করেছেন, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তও যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।"[১] একমাত্র আত্মজ্ঞানই নেচার, প্রকৃতি বা মায়ার প্রহেলিকা-রূপ অন্ধকার দূর করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির আপাতরম্য সৌন্দর্য ও আকর্ষণ আমাদের দিব্যস্বরূপকে সর্বদা ভুলিয়ে রাখে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন : "শরীর ও ইন্দ্রিয় যখন কাজ করে, নেচার বা প্রকৃতি তখন আমাদের ভুল বোঝায় এই বোলে যে, আত্মা কাজ করে, কিন্তু আত্মা সর্বদাই নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল ও নির্লিপ্ত। প্রকৃতি আমাদের বোঝায় যে, আত্মা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, অথচ আত্মা সকলের চেয়ে নিকটে। শরীর ও মন যাদের মনে করি অতি কাছে রয়েছে বোলে; আত্মা সে সকলের চেয়েও অনেক কাছে। উপনিষৎ বলেছে : 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ,[২]—আত্মা সচল আবার নিশ্চল, দূরে আবার নিকটে। আত্মা সর্বদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাইরে আছেন।[৩]

নেচার বা প্রকৃতি বলতে স্বামী অভেদানন্দ চলমান বিশ্বপ্রপঞ্চকেই মনে করেছেন। নেচার বা প্রকৃতি বলতে মানুষ বা প্রাণীর অবচেতন মনকেই বোঝায়। বিশেষতঃ মানুষ তার কল্পনা দিয়েই বিশ্ব-বৈচিত্র্যের অপরূপ রূপ ও সৌন্দর্য গড়ে তোলে, সৃষ্টি তার মনেরই তৈরী। এই মন তার অবচেতন মন যেখানে সঞ্চিত থাকে যুগ-যুগ ধরে অসংখ্য অগণিত কামনার সংস্কাররাশি : এই সংস্কারগুলিই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে গড়ে তোলে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : যে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি সচেতন তা রূপায়িত হয় তোমারই নিজের অনুভূতি, চিন্তা, কামনা, ইচ্ছা, অর্থাৎ সকল-কিছু মানসিক বৃত্তির সমষ্টিতে ; এগুলিই আমাদের দৈনন্দিন চেতন মনের স্তরে খেলা করে।[৪]

১। অভেদানন্দ : "সেলফ্-নলেজ", (১৯৪৪), পৃঃ ৩২
২। ঈশ-উপনিষৎ, ৫
৩। অভেদানন্দ, 'সেলফ্-নলেজ,' পৃঃ ৩৩
৪। ঐ : আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১২৪

অন্তঃকরণের সংস্কারগুলি ইচ্ছার সংঘাতে জাগ্রত হোয়ে বাইরের জগতে বিষয় ও বাস্তব অনুভূতির আকারে প্রকাশ পায়। স্তূপীকৃত সুপ্ত সংস্কারকেই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন 'মায়া'। মায়ার অপর নাম পরিবর্তন বা প্রবাহ, এক মুহূর্তের জন্যও তা স্থির নয়। সমগ্র বিশ্ব-বৈচিত্র্যের বাহ্য রূপ ও সৌন্দর্য আমাদের ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ কোরে অন্তরের পরম-দেবতাকে বুঝতে দেয় না। উপনিষদেও আছে: "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্,[৪]"—আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের জিনিসের রূপে ডুবে থাকে, অন্তরাত্মাকে আর দর্শন করে না। অল্পমাত্র ধীর জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তির আশীর্বাদ পাবার ইচ্ছায় বাইরের বিষয় থেকে মনকে টেনে নিয়ে পরমাত্মাকে জানার জন্যে নিয়োজিত করে। এখানে "কশ্চিদ্ধীর" বলতে মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছেন তেমনি কামনাজয়ী স্থিতপ্রজ্ঞকে বোঝাচ্ছে। কামনাই অব্যক্ত সংস্কারের ফলদানকারী ব্যক্ত বা জাগ্রত রূপ। কামনার সৃষ্টি প্রকৃতির সামগ্রী, এদের ভোগ করি আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে। এদের রূপ-বিবর্তনের আর অন্ত নেই, অন্ত নেই বোলেই প্রতিমুহূর্তে এরা পরিবর্তনশীল, সুতরাং অনিত্য। এই অনিত্য প্রকৃতির বিকাশকেই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন "মায়া"। একে ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লে বলেছেন 'নেচার'। তিনি লিখেছেন: 'নেচার' বা বৈচিত্র্য কখনও সত্য নয়। বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ সত্যের একটি সীমাবদ্ধ বিকাশ অথবা ব্রহ্মের আংশিক ও অসম্পূর্ণ পরিণতি মাত্র।[৫] মোটকথা ব্রাড্‌লে 'নেচার' বলতে বলেছেন বাস্তব জগত—"the physical world."[৬]

মায়াকে বেদান্তে সৎ, অসৎ ও এই উভয়ের সমষ্টি সদসৎ থেকে ভিন্ন অনির্বচনীয় বলা হয়েছে, যদিও মায়া বিশ্ব-বৈচিত্র্যের আকারে ভাবপদার্থরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং মায়া আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের মতন তুচ্ছ বা একেবারে অসৎ নয়। মায়া 'সৎ' নয়, কেননা সৎ বা পারমার্থিক সত্য হোলে সকল সময়েই অবিকৃত হোয়ে একরূপে থাকত, কিন্তু তা থাকে না, কারণ পরিবর্তনই তার স্বভাব। মায়া 'অসৎ' নয়, কেননা একেবারে অসৎ বা অসত্য হোলে ইন্দ্রিয় দিয়ে কখনই তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম না। মায়া 'সদসৎ' নয়, কেননা তাহোলে জগতকে একবার সত্য ও আর একবার অসত্য বোলে আমরা দেখতে পেতাম, কিন্তু তা হয় না, সুতরাং মায়ার যথার্থ স্বরূপ যে কি, তা চিন্তা ও ভাষা দিয়ে মোটেই বর্ণনা করা যায় না, সুতরাং অনির্বচনীয়। ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লে বলেছেন: "The universe in its diversity has been seen to be inexplicable,[৭]" অর্থাৎ বৈচিত্র্যের দিক থেকে জগৎ যে কি তা বলা যায় না। স্বামী অভেদানন্দও জগৎ বা মায়াসম্বন্ধে অনির্বচনীয়তাবাদ স্বীকার করেন ও সাথে সাথে আচার্য শংকর ও শংকরপন্থীদের মতন জগতের তথা মায়ার ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক সত্তা

৪। কঠোপনিষৎ ২।১।১ ৫। ব্রাড্‌লে: 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' (১৯৩৪), পৃঃ ২৩৬

৬। ঐ পৃঃ ৪৩৪-৪৩৬

৭। (ক) ঐ, পৃঃ ৪৫৮ ; (খ) আর. জি. কলিংউড: 'দি আইডিয়া অব্ নেচার' (১৯৪৫)

মেনে নিয়েছেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "মায়া বল্‌তে অসৎ তথা সত্তাহীনতা বোঝায় না, এর অর্থ আপেক্ষিক সত্তা, অর্থাৎ এ থাকে সাময়িক ভাবে, কোন স্থায়ী সত্তা এর নেই। খুব কম লোকই 'মায়া' শব্দটির সঠিক অর্থ জানেন। তাঁরা একে মরুমরীচিকার সাথে তুলনা করেন। কিন্তু যতক্ষণ আমরা মরীচিকার মধ্যে থাকব ততক্ষণ মরীচিকাকে মায়া-মরীচিকা বোলে বুঝ্‌তে পারব না। আমি একে বরং স্বপ্নের মতন বল্‌তে চাই, কেননা স্বপ্ন ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তা থাকে, কিন্তু জাগ্রত হবার সাথে সাথে অসত্য বোলে মনে হয়।"[৮] আচার্য শংকর তাঁর বেদান্তসূত্র-ভাষ্যে বলেছেন: "সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ। স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্‌প্রবোধাৎ। তস্মাৎ প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাদুপপন্নঃ সর্বোলৌকিকী বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।"[৯] যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করার আগে পর্যন্ত মায়িক সংসার সত্য বোলেই প্রতীত হয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের বা অনুভূতির পূর্ব-পর্যন্ত জাগতিক বস্তুগুলি ব্যবহারের কিংবা জীবনে নিত্যকর্মের উপযোগী হয় বোলে জগৎ, সংসার বা মায়ার ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করা হয়। অন্ধকারকে আলোকের অভাবের মতন অজ্ঞানকে অনেকে জ্ঞানের অভাব (ন+জ্ঞান=অজ্ঞান) বলেন, কিন্তু তা ঠিক নয়, কেননা আচার্য চিৎসুখ বলেছেন: অজ্ঞান অনাদি ও ভাবরূপ, তবে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপলব্ধির সাথে সাথে অজ্ঞান বাধিত হয় অর্থাৎ লোপ পায়।[১০] শংকরও বলেছেন: মায়া অনাদি কিন্তু শান্ত। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "শুদ্ধজ্ঞানের আলোক অজ্ঞান-অন্ধকার দূর কোরে দেয়। যে ঘর হাজার বছর ধরে অন্ধকারে ঢাকা থাকে, যে পর্বতগুহায় হাজার বছরের অন্ধকার পুঞ্জীভূত হোয়ে থাকে সেখানে একটিমাত্র দেয়াশালাইয়ের কাঠি জ্বাল্‌লেই নিমেষের মধ্যে তা দূর হয়ে যায়, হাজার বছরের অন্ধকার নষ্ট হয়।"[১১] তিনি বলেছেন: "মায়া-নিদ্রা থেকে জাগরণ আছে, কিন্তু এই জাগরণের নাম পরম-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।"[১২] তিনি আরো বলেছেন: আসলে মায়া মিথ্যাজ্ঞান—"*It is a false knowledge* (*mithyā-pratyaya*)।"[১৩] শংকরও মায়া বা অধ্যাসকে বলেছেন "মিথ্যাপ্রত্যয়" —"এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ * *।"[১৪]

৮। "Delusion does not mean 'non-existence'. It means *relative reality*, that is, it exists for the time being, and has no permanent existence."—'ডক্‌ট্রিন্‌ অব কর্ম' (১৯৪৭), পৃ: ১২৭

৯। শংকরভাষ্য, ২।১।১৪

১০। "অনাদিত্বে সতি ভাবরূপং বিজ্ঞাননিরস্যমজ্ঞানমিতিলক্ষণমিহ বিবক্ষিতম্।"—তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ: ৫৭, ৫৯

১১। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃ: ১৯২

১২। অভেদানন্দ: "ডক্‌ট্রিন্‌ অব কর্ম" (১৯৪৭), পৃ: ১২৮

১৩। ঐ, পৃ: ১৩২; এছাড়া তাঁর "এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্‌ রিলিজিয়ন" বইয়েও (পৃ: ১২) তিনি লিখেছেন: "The ideal of Vedanta is to enrich us with the knowledge of the Atman by which we can make us free from the fetters of false knowledge (*mithya pratyaya*) which is *maya*."

১৪। শংকর: অধ্যাসভাষ্য

অনেকে 'মায়া'-র ইংরেজী প্রতিশব্দ 'আন্‌রিয়েলিটি'-র (unreality) পরিবর্তে 'ইলিউসন্‌' (illusion)-শব্দ ব্যবহার করেন। স্বামী অভেদানন্দ মায়ার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ইলিউসন' ব্যবহার করতে রাজী নন। ইলিউসনের সংস্কৃত বা বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত 'প্রাতিভাসিক সত্তা'; কিন্তু মায়া বল্‌তে কেবল প্রাতিভাসিক সত্তাই বোঝায় না। ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 'মায়া' বোঝাতে ভুল কোরে 'ইলিউসন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এখনো করেন। পশ্চাত্যে দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিকেরা যেমন, সোপেনহাওয়ার, বোসাঁংকে, সোর্লে, রাসেল, এডোয়ার্ডস্‌, আলেকজাণ্ডার, ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, হোয়াইটহেড, ম্যাক্স্‌ প্ল্যাঙ্ক, জিন্স ও এমন কি প্রাচীন ও আধুনিক কবি এবং সাহিত্যিকরাও 'মায়া' শব্দের পরিবর্তে 'ইলিউসন' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। আর্থার. ই. ক্রিষ্টি বলেছেন:[১৫] ওয়াল্ডো ইমার্সনই (১৮০৩-১৮৮২) বোধ হয় প্রথমে (?)'মায়া' বোঝাতে গিয়ে 'ইলিউসন' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, কেননা তাঁর 'মায়া' শীর্ষক কবিতাটি তার চাক্ষুষ প্রমাণ।[১৬] আর্থার ক্রিষ্টি উল্লেখ করেছেন: "In the Journal of 1866 he (Emerson) wrote: 'In the history of intellect, there is no more important fact than the Hindu theology, * * as mayas or illusions. * * Truth is against the Maya which deceives gods and men." মনে হয় শ্রদ্ধেয় ইমার্সনকে অনুসরণ কোরে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ও তাঁদের দেখাদেখি প্রাচ্য-পণ্ডিতদের অনেকে মায়ার[১৭] পরিবর্তে ইংরেজী 'ইলিউসন' শব্দটি ব্যবহার কোরে আস্‌ছেন। রাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো ইমার্সন প্রাচ্য-দর্শন

১৫। 'দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি', ৫ম ভাগ, জানুয়ারী, ১৯২৮ ৪ নং, পৃঃ ৩৬৮

১৬। "Illusion works impenetrable,
Weaving webs innumerable,
Her gay pictures never fail,
Crowds each other, veil on veil,
Charmer who will be believed.
By man who thirst to be deceived."

১৭। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অনেকে শংকরকে মায়াবাদের প্রথম প্রবর্তক বোলে অভিমত প্রকাশ করেন ও সাথে সাথে সমালোচনার দৃষ্টিতে শংকরকে ও শংকর-সম্প্রদায়কে মায়াবাদী বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আচার্য শংকর মায়াবাদের প্রবর্তক নন, তিনি নিজেকে বরং ব্রহ্মবাদী বোলেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া শংকরপূর্ব যুগে বেদান্তাচার্য গৌড়পাদ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যদের লেখায়ও 'মায়া' 'অবিদ্যা', 'সংবৃতি' শব্দগুলি অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মাধ্যমিক বৃত্তিতে নাগার্জুন বলেছেন: (ক) "'মায়ামরীচিসদৃশান (পৃঃ ৩৮), (খ) 'যথা মায়া' (পৃঃ ৫৭) প্রভৃতি। নাগার্জুন মহাযানবিংশকে বলেছেন: (ক) 'জগন্মায়াস্বরূপাং' (১।৯), (খ) 'মায়ৈব দৃশ্যতে মায়ানির্মিতং সংস্কৃতং যদা' (১।১৮) প্রভৃতি। শান্তিদেব শিক্ষাসমুচ্চয়ে বলেছেন: (ক) 'মায়োপম চিত্তমোহনা' (পৃঃ ২৩৮), (খ) 'গতমনাগতং শূন্য মায়োপম যোগি পশ্যতি' (পৃঃ ২৩৯)। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকায় বলেছেন: (ক) 'স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি' (কা-৭), (খ) 'অনাদিমায়য়া সুপ্তো' (কা-১৬), (গ) 'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্‌' (কা-১৭) প্রভৃতি। এ সমস্তই শংকরের পূর্ববর্তী আচার্যদের ব্যবহার ও উল্লেখ। কাজেই শংকরই একমাত্র 'মায়া' শব্দের প্রবর্তক নন।"

উপনিষৎ, গীতা ও বেদান্তসূত্রাদির ইংরেজী অনুবাদের সাথে যে পরিচিত ছিলেন তা তাঁর 'ওভার সোল', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি রচনা ও কবিতা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি একথা তাঁর লেখার কোথাও স্বীকার করেন নি। হেগেল, সোপেনহাওয়ার ও অন্যান্য দার্শনিকেরাও প্রাচ্যদর্শনের কাছে ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মনীষী ইমার্সন তা করার সাহসটুকু কেন গ্রহণ করেন নি তার রহস্য সত্যিই আমাদের কাছে আজো পর্যন্ত অজ্ঞাত।

মায়া বিষয়টি নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর অনেক রচনায়ই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "সাংখ্যের প্রকৃতিকে বেদান্তে মায়া বলে। এই মায়া সগুণব্রহ্মের শক্তি—নিত্যসঙ্গিনী। মায়াকে অনেক পণ্ডিত 'প্রাতিভাসিক সত্তা' বা 'ইলিউসন' বলেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। মায়া আদ্যাশক্তি। এই শক্তি থেকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, আপেক্ষিক বিশ্বপ্রপঞ্চও তা থেকে উৎপন্ন।"[১৮]

মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি একথা শংকর ও অন্যান্য অদ্বৈতবেদান্তের অনুবর্তীরা স্বীকার করেছেন। যেমন আচার্য শংকর বলেছেন: 'অবিদ্যানাম্নী পরমেশশক্তিঃ'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (১।৩) শ্লোকের ভাষ্যেও শংকর "দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং * * " প্রভৃতি কথায় শক্তিমান ঈশ্বরের সার্থকতা স্বীকার করেছেন, যদিও মায়িক সৃষ্টির দিক থেকে তাকে অঙ্গীকার করেছেন। আচার্য চিৎসুখীও উল্লেখ করেছেন: "মায়াশব্দেন চ পরমেশ্বরজ্ঞানশক্তেরেব তৎস্বরূপভূতায়াঃ সংকীর্তনাৎ।"[১৯] ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মায়াকে বলেছেন মহামায়া জগৎপ্রসবিনী, কিন্তু মহামায়ার মুক্তি বা আত্মজ্ঞান দেবার সামর্থ্য নেই।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর অলৌকিক আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতন মায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যা দুটি বিকাশ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "বিরাট অব্যক্ত প্রকৃতি দুটি বিভিন্ন বিকাশে অভিব্যক্ত হয়। একটি ঈশ্বরাভিমুখী বা ঈশ্বরাশ্রিতা বিদ্যা ও অপরটি জীবাশ্রিতা অবিদ্যা। একটি মুক্তি ও শাশ্বত শান্তি দান করে ও অপরটি বন্ধনে ও দুঃখ-শোকে নিমজ্জিত করে; একটি জ্ঞান, অপরটি অজ্ঞান; একটি আলো ও অপরটি অন্ধকার। বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাণী এই দুটি বিকাশের কেন্দ্রস্থানীয়, এই কেন্দ্রকে আশ্রয় কোরেই বিপরীতগামী বিকাশ দুটি পরস্পরে কাজ ও সংগ্রাম করছে। যখনই ঈশ্বরাশ্রিত বিদ্যাশক্তি প্রবল ও ক্রিয়াচঞ্চল হয় তখনই আমরা ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর হই; ধার্মিক, আধ্যাত্মিক, স্বার্থগন্ধহীন হই।

১৮। অধ্যাপক মুরহেড ও রাধাকৃষ্ণন্ :, কন্‌টেম্পোরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (১৯৩৬), পৃঃ ৫৭। এছাড়া স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'লেকচার্স ইন্ ইণ্ডিয়া' (১৯০৬) বইয়েও (পৃঃ ১১৮) উল্লেখ করেছেন: "Maya did not mean illusion. Illusion was a word wrongly adopted in translation. This word gave a false idea to the Western mind. Maya was the invisible energy which was inseparable from God."

১৯। তত্ত্বপ্রদীপিকা (নির্ণয়সাগর সং), পৃঃ ৭৮

কিন্তু অবিদ্যা প্রবল হোলে মানুষ হয় সংসারাসক্ত ও দুর্মনা। তবে বিদ্যার প্রকাশের সাথে সাথে অবিদ্যার প্রভাব বিনষ্ট হয়।"[২০]

বাচস্পতি মিশ্র ও তাঁর মতানুবর্তীরা মায়ার দুটি বিকাশ স্বীকার করেন। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যও এই বিভাগ মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা, সত্ত্বশুদ্ধ্যশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে" (১।১৫-১৬); অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা অভিভূত হোলে প্রকৃতির বিদ্যামায়ারূপে প্রকাশ হয়, কিন্তু এ দুটি গুণের দ্বারা সত্ত্বগুণ যখন অভিভূত হয় তখন প্রকৃতির অবিদ্যামায়ারূপে অভিব্যক্তি হয়। তাছাড়া মনীষী বিদ্যারণ্য আরও বলেছেন: মায়া-বিম্বকে বশীভূত কোরে শুদ্ধব্রহ্ম ঈশ্বর-রূপে পরিচিত হন, আর অবিদ্যার বশে তিনি হন পাশবদ্ধ জীব।[২১] আচার্য শংকর ও পরবর্তী অনেক অদ্বৈতবেদান্তের অনুরাগী মায়ার এই বিভাগকে ঠিক স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি, যদিও জায়গায় জায়গায় তাঁরা বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন।[২২] যেমন বেদান্তসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে শংকর উল্লেখ করেছেন: (ক) "তমোতমেবংলক্ষণমধ্যাসং পাণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে। তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ।" (খ) 'তমেতমাবিদ্যাখ্যং * *।" কিন্তু বস্তুত বিদ্যা ও অবিদ্যা সত্য নয়, মিথ্যা। স্বামী অভেদানন্দও মায়াকে মিথ্যা বলেছেন পরিপূর্ণ শাশ্বত শুদ্ধব্রহ্মের দিক থেকে তুলনা কোরে, কিন্তু সৃষ্টি বা বৈচিত্র্যের দিক থেকে তিনি বিদ্যামায়ার বিশ্বপ্রকৃতিকে সাংখ্যকার কপিলের মতন জড়া ও অচেতন বলেন নি। তিনি বলেছেন: "সেই অনন্ত আদ্যাশক্তি অচেতন নন, কিন্তু চেতন। * * আমরা সেই শক্তিকে বিশ্বের নিরপেক্ষ চৈতন্যময়ী অনাদি অনন্ত আদ্যাশক্তি জননী বলতে পারি।"[২৩] অব্যক্ত মূলাপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গী যেন অনেকটা তান্ত্রিকী বোলে মনে হয়, কেননা তন্ত্রে শক্তিরূপিণী কালী নিত্যা চৈতন্যরূপিণী জগৎপ্রসবিনী। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের মতন আচার্য শংকরকেও আমরা বলতে দেখি: "ন সাংখ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্। * * কোঽসৌ দেবঃ? যস্যেয়ং বিশ্বজননী শক্তিরভ্যুপগম্যতে?"[২৪] স্বামী বিবেকানন্দ মূলা-প্রকৃতিকে আদ্যাশক্তি বোলে স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে ব্রহ্মাশ্রিত মায়া পরম-কবি ও শিল্পী সত্য-শিব-সুন্দর ভগবানের নিত্য লীলাবিভূতি।[২৫] এছাড়া প্রাচীন আচার্যদের ভিতর রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক, বল্লভ ও বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও মায়াকে মিথ্যা বলেন

২০। অভেদানন্দ: 'ডিভাইন্ হেরিটেজ্ অব ম্যান্' (১৯৪৭), পৃঃ ১০৩

২১। "মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্‌বৈচিত্র্যাদনেকধা —পঞ্চদশী ১।১৬-১৭

২২। অপ্পয়দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ' ও ঃ মাধবন্ প্রণীত 'দি ফিলজফি অব অদ্বৈত' পৃঃ ২১৪ দ্রষ্টব্য

২৩। অভেদানন্দ: 'ডিভাইন্ হেরিটেজ্ অব ম্যান্' (১৯৪৭), পৃঃ ৯৯

২৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ভাষ্য ১।৩

২৫। অধ্যাপক মুরহেড ও রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত 'কন্‌টেম্পোরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি'-তে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দি রিলিজিয়ন্ অব এ্যান্ আর্টিষ্ট', পৃঃ ৩৭-৩৮

নি, তাঁরা মায়াকে ঈশ্বরের নিত্য ও সত্য শক্তি বোলে স্বীকার করেছেন। জীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে শক্তির বিচিত্র বিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: মায়া সাধারণত দু'রকম: জীবমায়া বা নিমিত্তমায়া ও গুণমায়া বা উপাদান মায়া। এ'দুটি মায়া আবার প্রকাশ ও প্রয়োজনের দিক থেকে দু'রকম ভাবে অভিব্যক্ত হয়।

স্বামী অভেদানন্দ মায়াকে যেমন 'ইলিউসন' বলতে রাজী নন, স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও তাই। স্বামী বিবেকানন্দ এসম্বন্ধে বলেছেন: "আপনারা সকলেই মায়া বলতে যা বোঝায় তা বুঝতে পেরেছেন; আপনারা একথাও জানেন যে, মায়াকে কখনও কখনও ভুল কোরে ইলিউসন বলা হয়।"[২৬] মায়ার যথার্থ রূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আবার বলেছেন: 'The maya on the Vedanta, in its latest development, is a simple *statement of facts*—what we are, and what we see around us." মায়া তথা জগৎ যে ভাবে আমাদের সাম্‌নে প্রতিভাত হয় তাই তার রূপ ও স্থায়িত্ব, এটি কোন একটি মতবাদ বা যুক্তি নয়—"This is a statement of fact, not a theory." অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন: "The doctrine of avidya with its subjective note suggests a misleading view of the nature of the phenomenal world that *it is an* illusion, a creation of the mind."[২৭] "Unreal the world is, illusory it is not."[২৮] ডা: হীরালাল হালদারের অভিমতও তাই। তিনিও স্বীকার করেছেন: "Samkara, for example, who is commonly but *wrongly* supposed to be an illusionist * *.[২৯] অধ্যাপক হিরণ্যও ঠিক একথাই বলেছেন।[৩০] ডা: পি. টি. রাজু বলেছেন: "A very common misunderstanding of the doctrine of Maya is that it teaches that the world is a mere illusion, a shadow, * *".[৩১] মোটকথা মায়া, সৃষ্টি বা জগতের ইংরেজী শব্দ 'ইলিউসন' বা প্রাতিভাসিক সত্তা নয়, কেননা সত্যনিশ্চয় বা ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বপর্যন্ত মায়া বা জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকে, সুতরাং মায়া বলতে ইলিউসন-এর পরিবর্তে 'আন্‌রিয়ালিটি'

২৬। "Most of you are by this time familiar with the Idea of Maya * * as being illusion."—'কম্‌প্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২য় ভাগ, পৃ: ১০৫

ভগ্নি নিবেদিতা তাঁর 'দি মাষ্টার এ্যাজ আই শ হিম্' (১৯৩৯) বইয়ে (পৃ: ১৯-২২) স্বামী বিবেকানন্দের মতানুযায়ী মায়ার যে পরিচয় দিয়েছেন তা দ্রষ্টব্য।

২৭। রাধাকৃষ্ণন্: 'ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (৩য় সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃ: ৫৭৮

২৮। ঐ, পৃ: ৫৮৩

২৯। অধ্যাপক মুরহেড ও রাধাকৃষ্ণন্ সম্পাদিত 'কন্‌টেম্‌পোরারী ইণ্ডিয়ান্ ফিলজফি'-তে ডা: হীরালাল হালদার লিখিত 'রিয়ালিষ্টিক্ আইডিয়ালিজম্', পৃ: ২১৯

৩০। ঐ, 'দি প্রব্‌লেম্ অব ট্রুথ্' পৃ: ৫০৬

৩১। 'বেদান্ত কেশরী' (ইংরেজী) পত্রিকা, জুলাই, ১৯৬৭, পৃ: ৯১

(unreality) শব্দ ব্যবহার করাই সমীচীন। মনোবৈজ্ঞানিক ডক্‌ম্যান্‌, ষ্টাউট,[৩২] নব্য-বাস্তবতন্ত্রবাদী আলেক্‌জাণ্ডারও[৩৩] 'ইলিউসন' ও 'আন্‌রিয়ালিটি' শব্দ দুটির বস্তুগত ও অর্থগত পার্থক্য দেখিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দও মায়া স্বীকার করেছেন, কিন্তু মায়া বল্‌তে অসত্য, মিথ্যা বা তুচ্ছ কোনটাই বলেন নি। তিনি বিরাট ইচ্ছার বা প্রকৃতির যন্ত্ররূপে মায়ার অভিধান দিয়েছেন। তাঁর মতে মায়া আংশিক জ্ঞানবিশেষ। অবশ্য আচার্য শংকরও একদিক থেকে মায়া বা অজ্ঞানকে জ্ঞানবিশেষ বলেছেন, যেমন অজ্ঞান বল্‌তে তাঁর মতে ব্রহ্ম বা সত্যজ্ঞান সম্বন্ধে 'না-জানা'-রূপ জ্ঞান। কোথাও কোথাও মায়াকে তিনি মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাপ্রত্যয় বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "Ignorance must be part of the movement of the One, a development of its consciousness knowingly adopted, to which it is not forcibly subjected but which it uses for its cosmic purpose". মোটকথা মায়াকে তিনি 'a part of a movement of knowledge' বল্‌তে গিয়ে ব্রহ্মের সচঞ্চল সগুণ বিকাশ তথা শক্তিই স্বীকার করেছেন। মায়া বা অজ্ঞান শ্রীঅরবিন্দের মতে তাই অনির্বচনীয় মিথ্যা নয়, পরন্তু সত্য। শ্রীঅরবিন্দ এজন্তে মায়াবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোরে ব্রহ্মবাদী আচার্য শংকরকে ও শংকরানুবর্তীদের মায়াবাদী বোলে দোষারোপ করতে ছাড়েন নি। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'লাইফ ডিভাইন' বইয়ের জায়গায় জায়গায় লিখেছেন: (১) 'But for the Illusionist, the individual soul is an *illusion* and non-existent",[৩৪] (২) "Such is the cosmic God of Tantrikas and the Mayavadins," (৩) "Many are an Illusion". অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদকে 'ইলিউসন্‌' বলেছেন[৩৫] যা নিতান্ত অসঙ্গত, কেননা 'ডেলিউসন্‌' ও 'ইলুউসন্‌' অথবা মায়ার ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার মধ্যে ভেদ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। শ্রীশংকর বলেছেন: 'মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতং নানাত্বম্‌' (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪), আর মায়া বা

৩২। 'মাইণ্ড' (ইংরেজী পত্রিকা), ৬০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৮৯০, পৃঃ ৪৯৫-৫২৬

৩৩। ইংরেজ দার্শনিক এস, আলেক্‌জাণ্ডার বৈচিত্র্য বা মায়াকে তিন রকমভাবে ভাগ করেছেন, যেমন—'রিয়েল এ্যাপিয়ারেন্স', 'মিয়ার এ্যাপিয়ারেন্স' ও 'ইলিউসরি এ্যাপিয়ারেন্স'। তিনটির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "* * real appearances are indeed selected by the subject but are really contained in the thing ; that mere appearances arise from the failure to separate the thing from other things with which it is combined as apprehended ; while illusory appearances arise from the introduction by the mind of new objects into the thing, * *. The real point of distinction is that a real appearance and a mere appearance really do belong to the things apprehended * * while an illusory appearance does not."—'স্পেস্‌ টাইম এ্যাণ্ড ডিটি', ২য় ভাগ, (১৯৩৪), পৃঃ ১৮৬

৩৪। 'দি লাইফ ডিভাইন' (২য় সংস্করণ), ১ম ভাগ, পৃঃ ৪২-৪৩

৩৫। শ্রীঅরবিন্দ: 'দি লাইফ ডিভাইন' (২য় সংস্করণ), ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৯

অধ্যাস বল্‌তে বোঝায় "অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধি" (১।১।১)। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ আচার্য শংকরকে যে মায়াবাদী আখ্যা দিয়েছেন তাও তাঁর ঠিক হয় নি, কেননা শ্রীশংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মবাদী বোলে উল্লেখ করেছেন, যেমন (১) "কিং হি যচ্চৈচন্তেনানম্বিতং তদ্‌ ব্রহ্মপ্রকৃতিকং ব্রহ্মবাদিনঃ প্রত্যুদাহ্রিয়তে" (২।১।৬), (২) "তাস্তু ব্রহ্মবাদিনোঽপ্য-বিশিষ্টাঃ" (২।১।২৯); (৩) "পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষে দোষঃ" (২।১।১৯)। প্রকৃত-পক্ষে আচার্য শংকর পূর্বপ্রচলিত মায়াবাদকে অবলম্বন কোরে বিশ্ববৈচিত্র্যের রহস্য সমাধান করেছেন। মায়া অর্থে তিনি মিথ্যা তথা একেবারে অসৎ বলেন নি, তার আপেক্ষিক অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন ও বলেছেন মায়া অর্থে ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান। নাম-রূপ থাকার জন্যে তা শ্রীঅরবিন্দ কথিত "desparate and irreconcible entities and illusion"[৩৫] মোটেই নয়, অথবা শ্রীঅরবিন্দ যে বলেছেন—"but we see that these words dream, illusion, are tricks of speech, habits of our relative consciousness",[৩৬] এসব কথারও কোন সার্থকতা তাতে নেই। তবে মায়া যে আমাদের আপেক্ষিক জগতে অভ্যাস বা সংস্কার থেকে সৃষ্টি হয় একথা মিথ্যা নয়! সংস্কার, অভ্যাস, প্রকৃতি এসমস্তই আপেক্ষিক বা মায়িক জগতের জিনিস, মায়াতীত শুদ্ধচৈতন্যে সংস্কারের লেশমাত্র নাই, কেননা সংস্কার কিভাবে বা কে সেখানে সৃষ্টি করবে? শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মকে শক্তিযুক্ত বোলে স্বীকার করায় তাঁর পক্ষে মায়াকে সৃষ্টি, আনন্দশক্তি ও নিত্য বলায় কোন বাধা নাই। শ্রীঅরবিন্দের ব্রহ্ম বিশ্ব-প্রকৃতিকে ছেড়ে পূর্ণ নন, তিনি সশক্তিক আর সেজন্যে তিনি শাক্তাদ্বৈত শ্রেণীভুক্ত। তিনি তাঁর 'যৌগিক সাধনা' বইয়েও (পৃঃ ৫৭-৫৮) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: "Again if you think with the Buddhists * *, or if you think with the Mayavadins * *. I am a Tantric. I regard the world as born of Ananda and living by Ananda, wheeling from Ananda to Ananda. Ananda and Shakti, there are the two real terms of existence". সুতরাং আচার্য শংকরের মতবাদের সাথে তাঁর অমিল যথেষ্ট, আর বিশ্বমায়াকে আংশিক জ্ঞান ও সত্য বোলে স্বীকার করায়ও তাঁর কোন আপত্তি নাই।

মায়ার প্রধানত দু'রকম সত্তাঃ ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক বা প্রাতীতিক। জগৎ বা পার্থিব বিষয়মাত্রেই আপাততঃ কার্যের ব্যবহার-উপযোগী হয় বোলে আমরা জগৎকে বা জাগতিক সকল জিনিসকে 'ব্যবহারিক সৎ' বলি। এই সত্তা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ের সাথে সাথে নষ্ট হোয়ে যায়—"ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বং ব্যবহারিকত্বম্", আর প্রাতিভাসিক সত্তার ব্যবহারিক উপযোগীতা কিছুমাত্র নেই, প্রতীত হয় এই মাত্র, যথার্থ নয়; এই সত্তা অজ্ঞান থাকার অবস্থায়ই যথার্থ বস্তু দর্শনের পর নষ্ট হোয়ে যায়—"ব্রহ্মজ্ঞানেতরজ্ঞানবাধ্যত্বং প্রাতিভাসিকত্বম্"।[৩৭]

৩৬। ঐ, পৃঃ ৩৯-৪০

৩৭। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বইগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া আছেঃ (ক) রাধাকৃষ্ণনঃ 'ইষ্টার্ণ রিলিজিয়ন্‌স্‌ এ্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ থট' (১৯৪০), পৃঃ ৮৬,; (খ) ডাঃ দাশগুপ্তঃ 'এ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়ান

মায়া বা বিশ্বপ্রপঞ্চের এই দুটিমাত্র সত্তা আছে; পারমার্থিক সত্তা এর নাই, পারমার্থিক সত্তা একমাত্র শুদ্ধ ও মায়ানির্মুক্ত ব্রহ্মেরই আছে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "সুতরাং ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা দুটি একমাত্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের জগতেই আছে, ইন্দ্রিয়াতীত ও দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত ব্রহ্মচৈতন্যে নাই।"[৩৮] মায়া সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন: 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মায়া কি? মায়া কি নিছক প্রাতিভাসিক? না, মায়ার অর্থ আপেক্ষিক সত্তা, অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত।"[৩৯]

এই দেশ, কাল ও নিমিত্তকে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন 'মায়া' বা সৃষ্টি। 'দেশ' বলতে বোঝায় বাধাহীন বিস্তৃতি, আর 'সময়' অর্থে আমাদের চিন্তার ধারাবাহিকতা। আসলে সময় আমাদের মনের অবস্থামাত্র। দুটিক্ষণ বা মুহূর্তের ব্যবধানকে যে ভাগ কোরে দেয় তাই 'দেশ'। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "আমাদের মনের গতি বা বৃত্তিগুলি ধারাবাহিক ভাবে অথবা একসাথে ছন্দায়িত ও প্রবাহিত হোলে তাদের থেকে দেশ ও কালের ধারণা রূপায়িত হয়। ইমানুয়েল কাণ্ট এদের মনের অবস্থা বা 'চিন্তার আকার বিশেষ' (forms of thought) বলেছেন। আমাদের একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তা যখন মনে ওঠে তখনি একটি অপরটির মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে—তার নাম 'সময়', আর দুটি চিন্তা বা ধারণা একসাথে মনের মধ্যে অভিব্যক্ত হোলে বা একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করলে যে বিস্তৃতি বা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়—তার নাম 'দেশ'। সুতরাং 'আমি' ও 'সূর্য' এই দুটি ধারণার মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাই দেশ। দেশ ও সময় সম্পূর্ণ আন্তর সামগ্রী, মনেই এদের উৎপত্তি, মনেই লয়।"[৪০] কাণ্ট তাঁর "ক্রিটিক্ অব্ পিওর রিজ্‌ন" বইয়ে দেশ ও কালকে আমাদের চিন্তা তথা মনের পরিণতি বলেছেন ('a representation *á priori*)।[৪১] ডাঃ নর্মান কেম্প্ স্মিথ; অধ্যাপক এচ্. জে. পেটন; এ. সি. ইয়ুঙ্; টি. ডি. ওয়েলডন্;

ফিলজফি,' ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৮৬-৪৮৭, (গ) ডাঃ যদুনাথ সিহ: 'ইণ্ডিয়ান রিয়ালিজ্‌ম্,' পৃঃ ২০১-২০২; (ঘ) অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য: 'দি সাবজেক্ট এ্যাজ্ ফ্রিডম্' (১৯৩০), পৃঃ ১৬২; (ঙ) অধ্যাপক হরিমোহন ভট্টাচার্য: 'ষ্টাডিজ্ ইন্ ফিলজফি' (১৯৩৩), পৃঃ ৬; (চ) ডাঃ উমেশ মিশ্র: 'কন্‌সেপ্‌সান অব ম্যাটার' (১৯৩৬), পৃঃ ৩১-৩২ প্রভৃতি।

৩৮। (ক) "So, the apparent reality (*pratitika* বা *pratibhasika satta*) is on the sense-plane, and the Absolute Reality (*paramarthika satta*) is beyond time and space, * *" —'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১৬৮

(খ) স্বামী অভেদানন্দ মায়ার আপেক্ষিক তথা ব্যবহারিক সত্তা সম্বন্ধে বলেছেন: "We must not consider that *maya* means absolute illusion. It means phenomenal existence, conditional or relative existence,"—'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টু ওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন্', পৃঃ ১৪৮

৩৯। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন, পৃঃ ১৪৭

৪০। অভেদানন্দ: (ক) 'ডক্‌ট্রিন অব কর্ম' (১৯৪৭), পৃঃ ৫৩, (খ) "পাথ অব্ রিয়্যালিজেসন্' (১৯৪৬), পৃঃ ১১, (গ) 'আওয়ার রিলেসান টু দি 'এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৮৫

৪১। কাণ্ট: 'ক্রিটিক্ অব্ পিওর রিজন্' (পণ্ডিত মোক্ষমুলার সম্পাদিত, (১৯০২) পৃঃ ১৯, ২৮

অধ্যাপক লিন্ড্‌সে, এবং ডব্লিউ কেসিয়ার প্রভৃতি কাণ্টের ভাষ্যকার ও অনুবাদকগণ সকলেই দেশ ও কাল সম্বন্ধে একমত যে, এরা বৈচিত্র্যের উপাদান ও আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আকার বা রূপ (*'forms of sensibility'*)। [৫২]

বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস্ জিন্‌স তাঁর 'ফিজিক্স এ্যাণ্ড ফিলজফি' (১৯৪৩) বইয়ে (পৃঃ ৫০) দেশ ও কালের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "* * space is merely the arrangement of things that co-exist, and time the arrangement of things that succeed one another". তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন এই উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশ ও কালের চার রকম বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ও কালের চার রকম বিকাশ; যেমন, (১) অনুভবাত্মক (কন্‌সেপ্‌চুয়াল), (২) ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষমূলক (পারসেপ্‌চুয়াল), (৩) বাহ্য (ফিজিক্যাল), (৪) বিরাট বিস্তৃত (এ্যাব্‌সোলিউট) দেশ ও কাল। অনুভবাত্মক দেশ ও কাল মানুষের বা যেকোন প্রাণীর মনে থাকে এবং ব্যবহার হয় তাদের জ্যামিতিশাস্ত্রে গতি ও পরিবর্তনের আকারে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষমূলক দেশ ও কাল ব্যক্তিগত জ্ঞানের এলাকায় আসে একটির পর আর একটি, একই সাথে নয়। বাহ্য দেশ ও কালের ব্যবহার দেখি আমরা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায়, বিরাট দেশ ও কালের ব্যবহার হয় বিজ্ঞানে। নিউটন থেকে আইনষ্টাইন্ এই দুই মণীষীর সময়ের ব্যবধান-কালের মধ্যে যত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন তাঁরা এই বিরাট দেশ ও কালকে তাঁদের অনুশীলনের কাজে লাগিয়েছেন।

অধ্যাপক আর. ডব্লিউ. সেলার্স তাঁর 'দি এসেন্সিয়ালস্ অব্ ফিলজফি' (১৯১৭) বইয়ে (পৃঃ ১৯৬-২১৫) দেশ ও কাল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন: দেশ পাঁচ রকম ও কাল তিন রকম। পাঁচ রকম দেশ যেমন—সংবেদনাত্মক (সেন্‌সেসন্তাল্), প্রত্যক্ষমূলক (পার্‌সেপ্‌চুয়াল), মননাত্মক (কন্‌সেপ্‌চুয়াল), গণিতশাস্ত্রাত্মক (এ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ ম্যাথেমেটিক্যাল) ও জড়বিজ্ঞানের উপাদানাত্মক (এ্যাজ্ এ ক্যাটিগরি অব ফিজিক্যাল সায়েন্স্)। তিন রকম কাল যেমন—প্রত্যক্ষমূলক (পার্‌সেপ্‌চুয়াল), গণিত-শাস্ত্রাত্মক (ম্যাথেমেটিক্যাল) ও উপাদান বা গুণাত্মক সময় (টাইম্ এ্যাজ্ এ ক্যাটিগরি)।

প্রকৃতপক্ষে দেশ ও কাল ইন্দ্রিয়-এলাকারই উপাদান, সুতরাং তারা মায়িক ও চিরপরি-বর্তনশীল। ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যের সকল দেশে দেশ-কালের সমস্যা নিয়ে অনুশীলন হয়েছে ও তার সমাধানেরও চেষ্টা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'ইউরোপীয় দার্শনিকেরা মনে করেন যে, কাণ্টই সর্বপ্রথম দেশ, কাল ও নিমিত্তকে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের উপাদান বোলে আবিষ্কার করেছেন; কিন্তু সেকথা ঠিক নয়, কারণ কাণ্টের আবির্ভাবের অনেক আগেই

৫২। (ক) পেটন: 'কাণ্টস্ মেটাফিজিক অব এক্সপিরিয়েন্স,' ১ম ভাগ, পৃঃ ১০২; (খ) কেম্প্ স্মিথ: 'এ কমেন্টারি টু কাণ্ট্‌স্ ক্রিটিক্ অব্ পিওর রিজন্,' পৃঃ ১১২-১১৪, (গ) ইয়ুঙ্: "এ সর্ট কমেন্টারি অন্ কাণ্টস্ ক্রিটিক অব পিওর রিজন্,' পৃঃ ২৯, ৩১, (ঘ) অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১৮৭

ভারতবর্ষে হিন্দুরা দেশ, কাল ও নিমিত্তের কথা ভালভাবে জানতেন। শংকরাচার্য অনেকবার তাঁর উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এগুলির নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং কাণ্টের জন্মাবার অনেক আগে অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য শংকরের সময় থেকে হিন্দুরা দেশ ও কাল সম্বন্ধে জানতেন। এই দেশ ও কালের ধারণা বীজাকারে উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যায়। উপনিষৎ খৃষ্ট-অব্দ আরম্ভ হবারও হাজার হাজার বছরের আগে রচিত।"[৪৩] 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ব্রহ্মসূত্রের এই দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শংকর জগৎ বা মায়াকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অধীন বলেছেন: "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য * *, কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। * * ন চ স্বভাবতঃ, বিশিষ্টদেশকালনিমিত্তানামিহোপাদানাৎ।"

দেশ, কাল ও নিমিত্তকে ভারতীয় দর্শনে 'মায়ার উপাদান' বোলে গণ্য করা হোয়েছে, কেননা সকল-কিছু পার্থিব বস্তুর নাম রূপই এই দেশ, কাল ও নিমিত্তের এলাকার মধ্যে পড়ে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "এখন তোমরা বিশ্ববৈচিত্র্যের অর্থ অবশ্যই বুঝেছ। ব্রহ্মসত্তা যখনি দেশ ও কালের এলাকার মধ্যে থাকে, তখনি তাকে আমরা বলি ব্রহ্মের বিকাশ। * * বিশ্বের প্রত্যেক জিনিসই দেশ ও কালের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৪] মোটকথা দেশ, কাল ও নিমিত্ত দিয়েই পার্থিব বস্তুমাত্রের আমরা পরিমাপ করি। কাণ্টও বলেছেন: যে কোন বাহ্যবস্তুর প্রতীতি (idea) হোক না কেন, তাকে দেশ-কাল-রূপ মনের দুটি প্রত্যক্ষানুভূতির আকার (forms of intuition)-এর ভেতর দিয়ে আসতে হবে। দৈশিক ও কালিক আকার দুটি আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আকার; মনের বাইরে এদের কোন নিজেদের অস্তিত্ব নেই। সকল বাস্তব বস্তু থেকে উৎপন্ন জ্ঞান বা সংবেদনই দেশ ও কালের ভিতর দিয়ে রূপান্তরিত হোয়ে যখন প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির (understanding) সামনে এসে দাঁড়ায় তখনো তা অস্পষ্ট ও এলোমেলো প্রতীতির আকারে থাকে। এরপর প্রজ্ঞা সেই অসম্বদ্ধ প্রতীতি বা জ্ঞানকে সুসম্বদ্ধ (synthesised) করে ও তখনি তার যথার্থ রূপান্তর ঘটে। এই একত্রীকরণ বা সংশ্লেষণের কাজ (synthesis) হয় প্রজ্ঞার কতকগুলি পদার্থ বা ক্যাটিগরিজ (categories of understanding)-এর ভেতর দিয়ে। কাণ্টের মতে পদার্থ বারটি: একত্ব, বহুত্ব, সমষ্টি, ভাব, অভাব, সীমা, দ্রব্য, কারণ, পারস্পরিকতা, সম্ভাবনা, সত্তা ও প্রয়োজন। গ্রীসিয় দার্শনিক এরিষ্টোটেল-এর মতে পদার্থের সংখ্যা ও নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি দশটি মাত্র পদার্থ স্বীকার করেছেন; তাদের নাম: দ্রব্য, গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ, স্থান, সময়, অবস্থিতি, অবস্থা, কর্ম ও আকর্ষণ। হেগেল পদার্থ-

৪৩। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন,' পৃঃ ১৪৮

৪৪। "Now, you understand the meaning of *appearance*. When this existence works within the limitations of time and space, it becomes an *appearance* of that existence: * * every thing exists in time and space."—'আত্মার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট,', পৃঃ ১৪০-১৪৪

গুলিকে স্যায় ও যুক্তির দিক থেকে গ্রহণ করেছেন। হেগেলের মতে পদার্থগুলির নাম : জন্ম, স্থিতি, গুণ, পরিমাণ, ধর্ম বা প্রকৃতি, বিকাশ, সম্ভাবনা, আকস্মিকতা, প্রয়োজন, সত্তা প্রভৃতি। এছাড়া আলেক্‌জাণ্ডারের পার্থিব ও বিষয়গত ষোলটি পদার্থ গৌতমের পদার্থগুলির সাথে সমান না হোলেও সংখ্যায় প্রায় সমান।[৪৫] হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রধান চার রকমের পদার্থ স্বীকার করলেও সে চারটির মধ্যে আবার অনেক ভাগ মেনেছেন।. যেমন (ক) চরম পদার্থগত পদার্থ (the category of the ultimate), (খ) সত্তামূলক পদার্থ (the category of existence), তাও আবার আট রকমের, (গ) বিশ্লেষণমূলক পদার্থ (the category of explanation), তাও সাতাশ রকমের ও (ঘ) পদার্থগত বাধ্যবাধকতা (categorical obligations), [৪৫] যা নয় রকমের।[৪৬] এ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক স্পেঙ্গলার শৈশব, পরিণতাবস্থা, বার্ধক্য ও মৃত্যু (যা বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীতঋতুর সমতুল্য) এই চার পদার্থ স্বীকার করেছেন। পিটি্রম সোরোকিন্‌ ঐন্দ্রিয়িক, ভাবমূলক ও আদর্শ এই তিন রকমের পদার্থ স্বীকার করেছেন।[৪৭] ভারতীয় দর্শনে কণাদ ছয়টি, নব্য-নৈয়ায়িকেরা সাতটি ও গৌতম ষোলটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৮] দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছটি পদার্থ কণাদ স্বীকার করেছেন। তিনি এই পদার্থগুলিকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিঃশ্রেয়স লাভের কারণ স্বরূপ বলেছেন, যেমন—"ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্‌দ্রব্যগুণকর্ম-সামান্য-বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং-সাধর্ম-বৈধর্মাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সঃ" (১।১।৪)। নব্যনৈয়ায়িকেরা এর চেয়ে একটি বেশী 'অভাব' পদার্থ স্বীকার করেছেন। নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ বলেছেন : "দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্‌, সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ। গৌতম ষোলটি পদার্থের সম্যকজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স-রূপ মুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন : "প্রমাণ-প্রমেয়সংশয়সংশয়-প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃ-শ্রেয়সাধিগমঃ" (১।১)। পদার্থগুলি অবশ্য পার্থিব বিষয়, কিন্তু পদার্থগুলির স্বভাব ও স্বরূপ জানা থাকলে তবেই তাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে তাদের থেকে ভিন্ন শাশ্বত বস্তু মুক্তিকে লাভ করায় মানুষের প্রবৃত্তি জাগে; কাজেই সেদিক থেকে পদার্থগুলি মুক্তিলাভের দ্বার বা উপায় (medium)-স্বরূপ। প্লেটো, কাণ্ট, হেগেল এঁরাও পদার্থ বা ক্যাটিগরিগুলিকে জ্ঞানলাভের উপায় বোলে স্বীকার করেছেন।

দেশের প্রত্যক্ষ করি আমরা পরিমাণ দিয়ে, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব, নৈকট্য, ঘনত্ব, প্রভৃতি। কালের প্রত্যক্ষ হয় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-এ তিনটি কালিক

৪৫। অধ্যাপক কলিংউড : 'দি আইডিয়া অব নেচার' (১৯৪৫), পৃঃ ১৬২

৪৬। অধ্যাপক হোয়াইটহেড : 'প্রোসেস্‌ এ্যাণ্ড রিয়্যালিটি,' পৃঃ ২৭-২৮

৪৭। ডাঃ বিনয় কুমার সরকার : 'ভিলেজেস্‌ এ্যাণ্ড টাউনস্‌ এ্যাজ সোসাল প্যাটার্নস্‌,' পৃঃ ৪৯২

৪৮। (ক) বৈশেষিক সূত্র ১।৪ ; (খ) বিদ্যাভূষণ : 'হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান লজিক্‌', (১৯২১), পৃঃ ৫৪ ; (গ) এ্যাডামসন্‌ : 'হিষ্টরী অব লজিক', পৃঃ ১৭২, (ঘ) ম্যাসন-আওয়ারসেল : 'কম্পারেটিভ্‌ ফিলজফি', পৃঃ ৭৯-৮০ ; (ঙ) বার্টণ্ড রাসেল : 'হিষ্টরী অফ ওয়েষ্টার্ণ ফিলজফি' (১৯৪৬), পৃঃ ২২২, (চ) সেলার্স : 'দি, এসেন্সিয়ালস্‌ অব ফিলজফি', পৃঃ ৭৯-৮০, (ছ) অধ্যাপক জোসেফ : 'লজিক', পৃঃ ৬৩-৬৫

বিকাশের মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা দেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন: সংবেদনমূলক, প্রত্যয়মূলক, মানসিক, গণিতমূলক, জড়বিজ্ঞানের উপাদানমূলক।[৪৯] দেশের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ভারতীয় দর্শনে আমরা পাই প্রজ্ঞা বা ঈশ্বরে এবং কালের পরিপূর্ণতা রূপায়িত হয়েছে অচঞ্চল মহাকালের মধ্যে, যিনি নৃত্যচঞ্চলা কালীরূপিণী প্রবহমানা কালধারার আধার বা অধিষ্ঠান। তন্ত্রে দেশ ও কালকে আদ্যাশক্তি কালীরূপে চিন্তা করা হয়েছে। এই কাল বা মহাকালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, কাজেই দেশ ও কালের পরিপূর্ণ রূপকে মূলাপ্রকৃতিও বলা যায়। দার্শনিক আলেক্জাণ্ডার দেশ-কালকে জগৎকারণের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হেরাক্লিটাসের চির-ছন্দায়িত কালপ্রবাহও অনন্ত। ফরাসী দর্শনিক বের্গসেঁার কালধারা অনন্ত সৃষ্টিশক্তিরূপিণী (creative time-process)। হেরাক্লিটাস, বের্গসেঁা বা আলেক-জাণ্ডারে অনন্ত কালপ্রবাহ অনেকটা তন্ত্রের কালী বা আদ্যশক্তির মতন নিত্য ও শাশ্বত, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে দেশ ও কাল অনন্তপ্রসারী হোলেও নিত্য নয়। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "শুদ্ধব্রহ্মের উপলব্ধি হোলে দেশ ও কাল আর থাকে না, নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে যে অবস্থা হয়, মায়ারূপী দেশ ও কালের পরিণতিও তাই হয়।"

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: বিজ্ঞানেও দেশ ও কালকে চরমসত্য বোলে স্বীকার করা হয় না। অধ্যাপক ম্যাক্স প্লাঙ্ক, স্যার জেমস্ জিন্স্, মনীষী আইনষ্টাইন, এডিংটন-প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা দেশ ও কাল সম্বন্ধে ঠিক একমত। মনীষী আইনষ্টাইন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতাবাদের মারফতে প্রমাণ করেছেন যে, দেশ ও কাল দুটি আলাদা জিনিস নয়, যার নাম দেশ তারই নাম কাল; আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ ও অপরিচ্ছিন্ন বোলে একই জিনিসকে এক অবস্থায় দেশ ও আর এক অবস্থায় কাল বোলে দেখি। কালের প্রবাহ থাকে দেশের মধ্যে আর দেশের সমনিয়ততা থাকে কালের মধ্যে। দেশ-কালের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এতদিন ছিল তিনটি পরিমাণবিশিষ্ট গতিহীন বস্তু, আইনষ্টাইন প্রমাণ করলেন তাকে পরিমাণ-চতুষ্টয়বিশিষ্ট গতিচঞ্চল জিনিস বোলে। সময়কে তিনি চতুর্পরিমাণযুক্ত দেশ ('time is fourth demension of space')

৪৯। 'Sensational space, perceptual space, conceptual space, mathematical space, space as a category of physical science.'—স্যার জেমস্ জেন্স্: 'ফিজিক্স্ এণ্ড ফিলজফি', পৃঃ ৫৫-৫৮; অধ্যাপক সেলার্স: 'দি এসেন্সিয়ালস্ অব ফিলজফি,' পৃঃ ১৯৫-২১৩

৫০। "Then when we think of the Absolute, time and space will vanish. There will be no more time, no more space. Time and space exist in relation to our thought, the modes of our thought, of our conscious life."—'আত্মার রিলেশান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৮৬

বলেছেন।[৫১] এই দেশ ও কাল অবস্থাবিশেষে ভিন্ন হোলেও একই জিনিস, কিন্তু তাহোলেও এরা বিশ্বসৃষ্টির মূল-উপাদান। গতি ও চলমানতা এদের ধর্ম, সুতরাং নিত্য ও অপরিবর্তনীয় এরা মোটেই নয়। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই চলমানতা মায়ার নামান্তর।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুইই। সৃষ্টিময়ী মায়াকে নিয়ে যখন ব্রহ্মচৈতন্য ঈশ্বরের আসনে সমাসীন থাকেন তখন তিনি সগুণব্রহ্ম, আবার সকল কল্পনা ও বাক্য-মনের বাইরে যখন 'সৎ' বা অনুভূতিমাত্র-রূপে প্রকাশ পান তখন তিনি নির্গুণ-ব্রহ্ম। তাই তিনি বলেছেন: চিন্তার এলাকার ভিতর নির্গুণব্রহ্মকে আমরা সগুণ অর্থাৎ গুণযুক্ত কোরে ফেলি। গুণ ও কর্মের স্বভাব হোল বস্তুকে সীমাবদ্ধ করা। সীমাই পরিচ্ছিন্নতা। অসীম ও অনন্তকে সসীম ও সান্ত করার নাম সীমা। সীমার অপর নাম আপেক্ষিকতা (রিলেটিভিটি)। এই আপেক্ষিকতাই জগৎ; ব্রহ্ম এসবের বাইরে।

স্বামী অভেদানন্দ যখন ব্যবহারিকভাবে সৃষ্টির উপযোগিতা স্বীকার করেছেন তখন সৃষ্টিরূপ কার্যের একটি কারণকেও তিনি মেনে নিয়েছেন। এই কারণ লীলারূপী ঈশ্বর। ঈশ্বর নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ দুইই। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "সৃষ্টিতে আপেক্ষিকতা আছে। যতক্ষণ সৃষ্টি থাকবে ততক্ষণ তার স্রষ্টাও থাকবে। সৃষ্টি না থাকলে স্রষ্টার অস্তিত্ব আর থাকবে কি কোরে? সুতরাং ঈশ্বর আছেন। কিন্তু 'ঈশ্বর আছেন' একথার অর্থ কি? ঈশ্বর বলতে বুঝব শাসক বা নিয়ামক। * * * সুতরাং বাস্তব জগৎ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম থাকবেন।"[৫২] পুনরায় ব্রহ্মের সত্যিকারের স্বরূপ কি তার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আবার বলেছেন: "কিন্তু আমাদের ঈশ্বর কেবলই সগুণ নন, তিনি নির্গুণ নিরাকারও। কাজেই ঈশ্বরকে মাত্র সগুণ ও সাকার বোলে কল্পনা করলে তাঁর অনন্ত মহিমার দৈন্য দেখানো হবে। সগুণ ঈশ্বর কল্পনার জগতে প্রাথমিক বিকাশ মাত্র। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণার বিকাশক্ষেত্রে ক্রমোচ্চসোপান-রূপ আরোহণ স্বীকার করা উচিত, তাহোলেই আমরা দেখতে পাব যে, ঈশ্বর অনির্বচনীয় অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ কোন-কিছুর প্রথমাভিব্যক্তি বা আদিবিকাশ। সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ 'কোন-কিছুর' নাম শুদ্ধ-ব্রহ্ম।"[৫৩] শুদ্ধব্রহ্মকে 'কোন-কিছু' ('*something*') বলার অর্থ—তিনি সমস্ত নাম-রূপ ও বাক্য-মনের অতীত বোলে কোন রকমের নাম বা অভিধান তাঁর সম্বন্ধে ব্যবহার করা অসঙ্গত, অথচ দেশ-কালবিশিষ্ট মায়িক জগতে কোন-না-কোন নাম, শব্দ বা সংজ্ঞা না

৫১। 'দর্শন' (পত্রিকা, ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংপাদিত), ৩য় বর্ষ, প্রথম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬০

৫২। "In manifestations there is relativity. * * which is called Isvara or personal God."—'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ বেদান্ত', পৃঃ ১৪৬

৫৩। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন' পৃঃ ১৪৬-৪৭

কাণ্টও বৈচিত্র্য (appearance) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'an appearance to *something*' বলেছেন। এই 'something" বা 'কোন-কিছু'-ই কাণ্টের 'permanent substance' বা 'thing-in-itself", যা অতীন্দ্রিয় ও দেশ-কালের অতীত অজ্ঞেয় ব্রহ্ম।

দিলে মানুষের মন ও বুদ্ধি কোনরকমেই তাঁর সম্বন্ধে ধারণা ও অনুভব করতে পারে না, তাই তাঁকে নির্দেশ করার জন্যে বলা হয়েছে 'কোন-কিছু'—'সামথিঙ্' বা 'যদ্'। কিন্তু আসলে ব্রহ্মকে বর্ণনা বা নির্বচন করা যায় না। স্বামী অভেদানন্দ সে সম্বন্ধেও উল্লেখ কোরে বলেছেন—নাসদীয়সূক্তে সৃষ্টির আগে সৎ ও অসৎ কিছুই ছিল না বোলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সৎ ও অসৎ অথবা 'অস্তি ও নাস্তি' এই দুটি শব্দ আপেক্ষিক, একটি থাকলে অপরটির থাকা বোঝায়; সুতরাং 'আছে' ও 'আছে না' শব্দ দুটি দিয়ে যদি শুদ্ধব্রহ্মকে বোঝানো যায় তবে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও আত্মবিরোধী হয়।"[৫৪] অথচ শুদ্ধব্রহ্ম কোন-কিছু সত্তাবান একটি বস্তু—যাকে 'যদ্'-ও বলা যায় না, 'তদ্'-ও বলা যায় না, কিন্তু 'যদ্'-রূপী জীবজগৎ ও 'তদ্'-রূপী সগুণব্রহ্ম এই উভয়েরই কারণস্বরূপ।"[৫৫] "এই কারণ অর্থাৎ মহাকারণরূপী শুদ্ধব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত, যে কোন মানবীয় চিন্তা ও ধারণার তিনি বহির্ভূত; সুতরাং সগুণব্রহ্ম ঠিক শুদ্ধ তুরীয় ও কুটস্থ ব্রহ্ম নন। সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ) শুদ্ধব্রহ্মের একটি প্রকাশ মাত্র (It is a phase or the expression of the Absolute expression * *)।"[৫৬] দার্শনিক ব্রাড্‌লেও বলেছেন: "God is but an aspect, and that must mean but an appearance, of the Absolute."[৫৭] শুদ্ধব্রহ্মে বৈচিত্র্য, দেশ, কাল ও নিমিত্ত নেই। কার্য-কারণ নিয়মও সেখানে শিথিল ও অচল ("We transcend then the *law of causality*")। যদিও জগৎ বা দৃষ্টিকে অপেক্ষা কোরে শুদ্ধব্রহ্মকে অধিষ্ঠান ও কারণ বলা হয় তবুও এগুলি বিশেষণ-স্বরূপ; শুদ্ধ ও দ্বৈতলেশহীন ব্রহ্মে কোন বিশেষণই আরোপিত হোতে পারে না। জগৎকারণতার বিচার করতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "এঁকে (ব্রহ্মকে) কখনো কখনো 'কারণবিরহী কারণ' বলা হয়। কিন্তু তবুও 'কারণ' শব্দটি আপেক্ষিক। যখন কোন জিনিস তার কাজ বা ফলের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তখনি তাকে 'কারণ' বলা যেতে পারে, সুতরাং 'কারণবিরহী কারণ' বা 'নিষ্কারণ কারণ' নিয়ম-বিরুদ্ধ শব্দ। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের উদ্দেশ্যে এই 'কারণ' শব্দ ব্যবহার করা যায় না।"[৫৮]

৫৪। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন,' পৃ: ১২০

"If one exists it presupposes the existence of the other, and therefore, it would be a relative thing. So, when they are describing the Absolute, they must describe in paradoxes."

৫৫। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃ: ১২০

৫৬। ঐ, পৃ: ১২৯

৫৭। ব্রাড্‌লে: 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' (১৯৩০), পৃ: ৩৯৭

৫৮। "It is sometimes called the causeless cause. But even that term *cause* is relative term. The term *cause* can be applied to a thing only when it is related to the effect, so causeless cause or uncaused cause is an anomalous term. It does not refer to the Absolute."—'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃ: ১২৯

প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধব্রহ্মকে জগৎকারণ ও জগতের আধার বা অধিষ্ঠান বলা অসঙ্গত, কেননা কারণতা বলতে কোন-কিছু সম্বন্ধ ও আপেক্ষিকতা বোঝায়। এই আপেক্ষিকতা আবার গতিরুচ্ছলতা বা বিকাশোন্মুখী শক্তির ছন্দায়িত গতিকে ('force or power operating') বোঝায়। সকল রকম গতির পিছনে থাকে পরিবর্তনশীল প্রবাহ, অথচ মায়ালেশহীন ব্রহ্মসমুদ্রে তরঙ্গ বিন্দুমাত্রও থাকে না। তরঙ্গ বা গতিই মায়া, সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মকে কারণ বলার অর্থই তাঁকে মায়াবী নামে অভিহিত করা। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কাণ্ট দেশ ও কালের মতন কারণতাকেও আন্তর উপাদান (*a priori*) বোলে গণ্য করেছেন। বৈজ্ঞানিক হোয়াইটহেড কারণতাকে মনেরই দুটি ভাগের অন্যতম বলেছেন।[৫৯] কারণতার পরিচয় দিতে গিয়ে কাণ্ট বলেছেন: 'বিশ্বসংসারে যা-কিছু ঘটনা ঘটে, তার পিছনে এমন কিছু থাকে যা কোন একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এই নিয়মটি কি?' স্বামী অভেদানন্দ তাঁর "ডিভাইন্ হেরিটেজ অব ম্যান্" বইয়েও (পৃ: ১৩) ঠিক এই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন: "প্রাকৃতিক শক্তি কোন-না-কোন আকারে পৃথিবীর বুকে খেলা করছে; কিন্তু যখন সেই আকার বা প্রবাহের সুসংগত ও ঐক্যগত রূপ আমাদের চোখে পড়ে তখনি তাকে আমরা বলি 'নিয়ম' বা 'ল' (law)।" স্বামী অভেদানন্দ কাণ্টের মতন নিয়মকে মনের বাইরের তথা বিশ্বসংসারে উপাদান বলতে চাননি। মানুষের মনে এই নিয়ম অনন্ত কাল ধরে রয়েছে। সুতরাং কারণতা পার্থিব সীমানারই গুণ, বিশ্বোত্তীর্ণ মায়ানির্মুক্ত ব্রহ্মের বুকে এর স্থান নেই এবং স্থান নেই বোলে শুদ্ধব্রহ্মে দেশ-কালের মতন নিয়মনিয়ন্ত্রিত কারণতা-গুণটিও থাকতে পারে না,[৬০] থাকলে ব্রহ্ম মায়ারই অধীন হোয়ে থাকবেন। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন—"the *law causation* does not work there."[৬১]

এইরকম ভাবে আমরা ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান বলি জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত-বিকাশ বোলে। অজ্ঞান যেমন জ্ঞানের ওপর থাকে, জগৎ তেমনি ব্রহ্মের ওপর অধিষ্ঠিত, অথচ জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে দেখি আমরা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ। স্বামী অভেদানন্দ ঠিক এই ধারণা নিয়ে বলেছেন: "* * and that Absolute is like the background of all phenomena. It is the *substratum*."[৬২]

৫৯। হোয়াইটহেড: 'দি কনসেপ্ট অব নেচার' (১৯৩০), পৃ: ৩১

৬০। ডা: ব্রহ্ম বলেছেন: "The category of causation is an imperfect category not applicable to the transcedent notion of the Absolute Ground"—'রিয়্যালিটি এ্যাণ্ড সায়েন্স', পৃ: ৭৮-৭৯

৬১। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃ: ১৮৯। ডা: মহেন্দ্র নাথ সরকার বলেছেন: 'Causation is a dynamic concept, * *, and so long as maya operates we have a causation in dynamic sense, operative only in the phenomenal universe, and this phenomenal universe has identity but no reality. * * and causality is a cencept of them; immanent order".—'কম্পারেটিভ ষ্টাডিজ, ইন্ বেদান্তিজিম্', পৃ: ১০৬-১০৭

৬২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসন টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃ: ১৯৪

তিনি এই অধিষ্ঠানের উপমা দিয়েছেন চলচ্চিত্রের ছবির পর্দার সাথে ও সেই পর্দার ঐক্য দেখিয়েছেন আত্মস্বরূপের উপলব্ধির সাথে। চলচ্চিত্রের ছবি চলমান, কিন্তু যে পর্দার ওপর ছবিগুলি প্রকাশ পায়, তা অচল ও স্থির, অথচ লক্ষ্যের বিষয় যে, চলমান ছবিকে উপলক্ষ্য কোরেই অচঞ্চল পর্দার অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা করা হয়; সুতরাং কূটস্থ শুদ্ধব্রহ্ম যে চিরচঞ্চল সৃষ্টির অধিষ্ঠান তাও কেবল সৃষ্টিকে অপেক্ষা কোরে সম্ভব হয়। আপেক্ষিকতা (relativity) তাহোলে শুদ্ধব্রহ্মেও থাকে, থাকে বোলেই শুদ্ধব্রহ্ম তাঁকে বলা যায় না, অথচ আপেক্ষিকতা বা পারম্পরিকতা-রূপ দৈন্য শুদ্ধব্রহ্মে কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধব্রহ্ম চঞ্চল ও অচঞ্চল এই উভয় ভাবের অতীত, কেননা একটি থাকলে অপরটির অপেক্ষা স্বভাবতই থাকে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: ব্রহ্মকে এক বা অদ্বিতীয় বলাও ভুল, কেননা দ্বিতীয় বা দুইয়ের কল্পনাকে বাদ দিয়ে একের ধারণা থাকতে পারে না; কাজেই "It is neither *one* nor *many*; [৬৩] যদিও অন্য জায়গায় তিনি আবার বলেছেন: "The unchangeable Reality of the universe cannot be many. It is one."[৬৪] আচার্য শংকর বলেছেন: 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্', একমাত্র উপলব্ধিযুক্ত সত্তাই ব্রহ্মে বর্তমান, উপলব্ধির কর্তা বা বিষয়ও সেখানে নাই, অথচ বিষয় না থাকলে উপলব্ধি হয় না। তাই ব্রহ্মোপলব্ধিকে বিষয়-বিষয়ীবিহীন উপলব্ধি বা অনুভূতি বলা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "It is the *feeling*. It is the Realization, the Divine realization."[৬৫] অপরোক্ষানুভূতিই ব্রহ্মের সত্তা ও রূপ। দার্শনিক ব্রাড্‌লে বলেছেন: "Everything is experience, and also experience is one."[৬৬] "We have found that Reality is one, that it essentially is experience and that it owns a balance of pleasure." শংকরও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: "অনুভবাবসানত্বাদ্ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য।"[৬৭] এই অনুভব জ্ঞানস্বরূপ, এইটি বুদ্ধি, বিচার বা তর্কের পরিণতি বা ফলস্বরূপ নয়। যদিও উপনিষদে বলা হয়েছে: (ক) "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ;"[৬৮]—'আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্য সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায় সাধারণভাবে তিনি প্রকাশ পান না, কিন্তু একান্ত সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত পরিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা সেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন'; (খ) "ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ",[৬৯]—'মন প্রভৃতি ধাতু বা ইন্দ্রিয় প্রসন্ন (শান্ত) হোলে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করা যায়'। এখানে 'অগ্রবুদ্ধি' ও 'ধাতুপ্রসাদ'

৬৩।* অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৮৫

৬৪। ঐ, পৃঃ ১৮৩

৬৫। ঐ, পৃঃ ১৮৫

৬৬। ব্র্যাড্‌লে: 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' (১৯৩০), পৃঃ ৪০৫

৬৭। ঐ, পৃঃ ৪৫৩

৬৮। কঠোপনিষৎ ১।৩।১২

৬৯। ঐ ১।২।২০

বল্‌তে আমরা বুঝি পরিশুদ্ধ বা সংকল্প-বিকল্পহীন মন বা বুদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেনঃ 'ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর'। শুদ্ধবুদ্ধি বা শুদ্ধমন আর বুদ্ধি বা মনের চঞ্চল স্বভাবে থাকে না। বুদ্ধির অপর নাম নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি ও মন বল্‌তে সংকল্প-বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। আসলে একই অন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি তরঙ্গ-রূপে কল্পিত হয় বিভিন্ন বিষয় অনুভব করার জন্যে। অন্তঃকরণ তেজোময় প্রকাশস্বভাব। অন্তঃকরণের যথার্থ রূপ ব্রহ্মচৈতন্য, অর্থাৎ নিশ্চল নিস্তরঙ্গ অন্তঃকরণ ব্রহ্মসত্তা থেকে ভিন্ন বস্তু নয়, কিন্তু ভিন্ন বোলে প্রত্যক্ষ হয় বৃত্তি বা তরঙ্গরূপে সৃষ্টি হওয়ার জন্যে। বৃত্তিকে অজ্ঞানের পরিণাম বলা হয়। কর্মচাঞ্চল্য, চলমানতা, গতি, কম্পন—এ সমস্তই বৈচিত্র্য তথা অজ্ঞানতার কোঠায় পড়ে, অচঞ্চলতা ও স্থিরতা ব্রহ্মের স্বভাব, সুতরাং মন, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ যখন বৃত্তিহীন হয় তখন ব্রহ্ম থেকে তাদের আর পৃথক সত্তা থাকে না, তাই শুদ্ধবুদ্ধি বা শুদ্ধমন অথবা পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্রহ্মোপলব্ধির সমান। তবে সাধারণ বৃত্তিযুক্ত মন বা বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মের নিরাবরণ রূপ কখনো প্রত্যক্ষ করা যায় না। উপনিষদেও বলা হয়েছেঃ 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া',[৭০] তর্ক বা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বেশীর ভাগই বুদ্ধি বা বিচারকে বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। কাণ্ট বুদ্ধি বা বিচারকে ঈশ্বরের আসনে বসাতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ বলেছেনঃ মন, বুদ্ধি, বিচার এসবই অজ্ঞানের এলাকায় পড়ে, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপায় একমাত্র উপলব্ধি বা পরিশুদ্ধজ্ঞান—'বোধে বোধ'। তবে একথাও আবার অস্বীকার করা যায় না যে, বুদ্ধি বা বিচারের দ্বারাই আমাদের সত্য-নির্ধারণ করতে হয়, যদিও ব্রহ্ম বস্তুতন্ত্র বোলে তিনি বুদ্ধি বা বিচারলভ্য নন। বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য স্বীকার করেছেনঃ 'ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্, ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা",—'ব্রহ্মোপলব্ধির ফলব্যাপ্যত্বই নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু বৃত্তিব্যাপ্তি নিষেধ করা হয় নি'। 'ফলব্যাপ্যত্ব' বল্‌তে অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা উপলব্ধি; এর দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে দূর করার জন্যে বুদ্ধি বা চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন হয়। 'বৃত্তিব্যাপ্তি' বল্‌তে বুদ্ধি, মন বা চিত্তের ব্রহ্মাকারতা। বেদান্তসারপ্রণেতা সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেনঃ "এবং চ সতি 'মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্' (বৃহ উঃ ৪।৪।১৯), 'যৎ মনসা ন মনুতে' (কেন উঃ ১।৫) ইতি অনয়োঃ শ্রুত্যোঃ অবিরোধঃ, বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকারেণ ফলব্যাপ্যত্ব-প্রতিষেধ-প্রতিপাদনাৎ।" পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য উল্লেখ করেছেনঃ (ক) "স্বয়ংপ্রকাশমানত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে" (শ্লোঃ ১৭৬), (খ) "বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্, তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ" (শ্লোঃ ১৭৯)"; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সময় অন্তঃকরণ ব্রহ্ম-রূপ বিষয়ের ('অহং ব্রহ্মাস্মি'-রূপ বিষয়ের) আকারে আকারিত হয়, ব্রহ্মসম্বন্ধে আমাদের যে অজ্ঞান তা অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে অবস্থিত চৈতন্যের দ্বারা নষ্ট হয় ও চিদাভাসের দ্বারা শুদ্ধব্রহ্ম নিজেই প্রকাশিত হন।

৭০। কঠোপনিষৎ, ১।২।৯

এইটি যেন প্রথমক্ষণে অজ্ঞাননাশ ও দ্বিতীয়ক্ষণে ব্রহ্মের প্রকাশ বোলে মনে হয়। কিন্তু মুহূর্তভেদ বা কোন-কিছু ব্যবধান এই অজ্ঞান-নাশ ও ব্রহ্মপ্রকাশের মধ্যে নেই, উভয় কাজই একসাথে হয়। যাইহোক এই অজ্ঞান-নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশের জন্যেই অন্তঃকরণ-বৃত্তির দরকার হয়, আর তাই বুদ্ধি বা বিচারের প্রয়োজনীয়তাকেও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। আচার্য শংকর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি সূক্ষ্মবিচার বা বুদ্ধিকে এজন্যে আত্মজ্ঞান-লাভের পথে একেবারে অন্তরায় বলেন নি। মনীষী ব্র্যাড্‌লে-এর স্বীকৃতিও তাই, তিনিও চরমানুভূতির পথে বিচার-বুদ্ধিকে একমাত্র উপায় বোলে স্বীকার করেন নি, তবে একেবারে অস্বীকারও করতে পারেন নি। যেমন তিনি বলেছেন: "The intellect, if you please, is but a miserable fragment of our nature ; but in the intellectual world it, none the less, must remain supreme."[১১]। তবে একথা সত্যি যে, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ একমাত্র অনুপলব্ধির স্বরূপ। বাক্য, মন বা বুদ্ধি দিয়ে তার ইতি করা অর্থাৎ তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপকে ভাষায় ব্যক্ত করা কিংবা চিন্তার দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না, তিনি 'অবাঙমনসোগোচরম্'।[১২] গ্রীক মরমী দার্শনিক প্লটিনাস ঠিক এই কথাই বলেছেন: "God is neither to be expressed in speech nor in written discourses, * *;" তা একমাত্র "flight of the alone to the Alone." মরমী এক্‌হার্ট বলেছেন—ব্রহ্ম 'অজানার জানা' (*unknowing knowing*), অথবা "God is silence rather than speech." অধ্যাপক র‍্যাডলফ অটো বলেছেন, ব্রহ্ম 'একান্তবিরহী' ('Wholly-other')।

যাই হোক উপলব্ধিই মুক্তির স্বরূপ। এই উপলব্ধি বা মুক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "সত্যকে জানা বল্‌তে সত্যের সাথে একীভূত হোয়ে যাওয়া।" এরি নাম উপলব্ধি—"So, knowing Truth means to be one with the Truth. This is what is meant by *realization.*"[১৩] উপলব্ধি তথা ব্রহ্মোপলব্ধি এই বর্তমান জীবনেই লাভ করা যায়, তার জন্যে পরলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "Godconsciousness can be attained in this life and not after the grave".[১৪] তিনি আচার্য শংকরের মতন জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন। শংকর বলেছেন: "তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎসশরীরত্বস্য সিদ্ধং জীবতোঽপি বিদুষোঽশরীরত্বম্।" অশরীরত্ব জীবন্মুক্তির লক্ষণ। শরীরের অভিমানই ভ্রান্তি বা অজ্ঞান—"ভ্রান্তিপ্রযুক্তত্বাৎ সশরীরত্বম্"। ভ্রান্তি বা অজ্ঞানকে দূর করার নাম উপলব্ধি, মুক্তি বা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান—"মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদ্ভবতি"।[১৫] অবশ্য

১১। ব্র্যাড্‌লে: 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' (১৯৩০) পৃ: ৪৫৫

১২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃ: ১৮৯

১৩। অভেদানন্দ: "এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন", পৃ: ১৮৪

১৪। ঐ, পৃ: ১৮১

১৫। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।১।৪

শরীর অজ্ঞানের পরিণাম, সুতরাং জীবন্মুক্তের বাস্তব শরীর থাকার জন্যে অজ্ঞানলেশ থাকে, এবং অজ্ঞানলেশ থাকায় ব্রহ্মজ্ঞান কখনো শরীর থাকা কালে মানুষের হোতে পারে না একথা সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমহামুনি ও ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডন মিশ্র[১৬] উল্লেখ করেছেন। কর্মকাণ্ডবাদী মণ্ডন মিশ্র বলেছেন: গীতায় যখন আছে যে, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা', অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম বা অজ্ঞান ধ্বংস কোরে দেয়, তখন শরীর থাকার সময় মুক্তি লাভ করার কোন অর্থ হয় না, কেননা শরীর তো অজ্ঞানের কার্য, সুতরাং জীবদ্দশায় জ্ঞান হোলে শরীর-রূপ অজ্ঞান আর থাকতে পারে না, অথচ তা থাকে। এজন্যে সর্বজ্ঞাত্মমহামুনি ও মণ্ডনমিশ্রের মতে বিদেহমুক্তিই ব্রহ্মোপলব্ধির স্বরূপ। মণ্ডনমিশ্র তাঁর 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-তে ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।১৪।২) "তস্য তাবদেব চিরম যাবন্ন বিমোক্ষে। অথ সম্পৎস্যে" কথাগুলির অর্থ করেছেন—"দেহপাতপ্রতীক্ষাশ্রুতির্বাধ্যতে"। কিন্তু আচার্য শংকর তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন: শরীর থাকা বা না-থাকা নিয়ে কোন মতভেদ অথবা বাক্‌বিতণ্ডাই উঠ্‌তে পারে না—"অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কিঞ্চিৎ কালং ধ্রিয়তে ন ধ্রিয়ত ইতি" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ৪।১।১৫)। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনি, নৈষ্কর্মসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্য, অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী এবং এছাড়া ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র, কল্পতরু ও পরিমলকার সকলেই একবাক্যে জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন। মধুসূদন সরস্বতী[১৭] ও বিদ্যারণ্যমুনি এ'সম্বন্ধে কুম্ভকারের চক্রভ্রমণের উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন: ঘট তৈরী হোয়ে যাবার পরও কুম্ভকারের চাকা (চক্র) যেমন কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঘুরতে থাকে তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির পরেও প্রারব্ধকর্মের জন্যে জ্ঞানীর বাস্তব শরীর কিছুকাল পর্যন্ত থাকে। প্রারব্ধকর্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়, কিন্তু ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম-সকল আত্মজ্ঞানের সাথে সাথে ধ্বংস হোয়ে যায়; অথবা পোড়া দড়ির মতন প্রারব্ধকর্ম থাকে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানীকে আর তা মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না। জ্ঞানী তখন নিরাসক্তভাবে সংসারে থাকেন।[১৮] নৈষ্কর্মসিদ্ধিতে সুরেশ্বরাচার্য মিথ্যা সাপ দেখে মানুষের যে সাময়িক ভয় হয় জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ থাকার স্বপক্ষে তারই উদাহরণ দিয়েছেন।[১৯] গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে

১৬। এই মণ্ডনমিশ্রই বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য একথা অনেকে স্বীকার করেন। আবার অনেকের মতে উভয়ে ভিন্ন লোক।

১৭। "দণ্ডসংযোগনাশেঽপি চক্রভ্রমণবচ্চ সংস্কারানুবৃত্তেরবিদ্যানিবৃত্তাবপি তৎ কার্যানুবৃত্তিসংভবাৎ।"—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৮৯০

১৮। 'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥'—গীতা ৪।২০

১৯। 'নিবৃত্তসর্পঃ সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি।
বিধ্বস্তাখিলমোহোঽপি মোহকার্যং তথাত্মবিৎ॥'—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪।০
চিৎসুখাচার্যও চিৎসুখীতে 'উৎপন্নাত্মাববোধস্য জীবন্মুক্তিঃ প্রসিধ্যতি' বোলে জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন।
—চিৎসুখী ৪।১২

স্থিতপ্রজ্ঞের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষ। জীবন্মুক্ত 'পশ্যতি মিথ্যৈব' বোলে সুরেশ্বরাচার্য ব্রহ্মবিজ্ঞানীকে[৮০] সাক্ষীস্বরূপ উদাসীন বলেছেন। নারায়ণেন্দ্র সরস্বতী তাঁর বার্তিকাভরণে জীবন্মুক্তের উদাসীনতা ও নিরাসক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৮১] স্বামী অভেদানন্দ এই ধরণের জীবন্মুক্তি স্বীকার কোরে বলেছেন: "সেই মুক্তি বা মোক্ষের আনন্দ এই বর্তমান জীবনেই লাভ করা যায় এবং শরীরের মৃত্যুর পর সেই জ্ঞানী অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সাথে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করেন।"[৮২] স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "এমন কি এই বর্তমান জীবনেই জ্ঞানী সমগ্র বিশ্বের সাথে নিজেকে একাত্ম বোলে অনুভব করেন। * * * কিন্তু যতক্ষণ প্রারব্ধ থাকে ততক্ষণ জ্ঞানীর পার্থিব শরীর নষ্ট হয় না। অজ্ঞান-আবরণ দূর হয় অথচ শরীর থাকে, ঠিক এই অবস্থাকে বেদান্তীরা জীবন্মুক্তি বলেন।"[৮৩] শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরও সংসারে জীবন্মুক্ত হোয়ে থাকা যায়।"[৮৪] দার্শনিক সোপেনহায়ারও এই জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন।[৮৫]

৮০। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞান বস্তুত এক। তত্ত্বম্-পদার্থ পরিশুদ্ধ হোলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান ও ঠিক তারই সাথে সাথে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হয়। একেই ব্রহ্মবিজ্ঞান বলা হয়। এই দুটি জ্ঞানের উদয়ের বা অনুভূতির মধ্যে কোন সময় ও দেশের ব্যবধান নেই, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জ্ঞান একসাথে (simultaneously) অনুভূত হয়। অনেকে জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। যদিও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: আগে জ্ঞান, পরে বিজ্ঞান। তিনি জ্ঞানকে বলেছেন দেখা ও বিজ্ঞানকে বলেছেন খাওয়া; (যেমন কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়েছে। যে দেখেছে সেই জ্ঞানী ও যে দুধ খেয়েছে সেই বিজ্ঞানী)। কিন্তু তবুও তিনি বলেছেন যে, চুণ সুরকি ইট দিয়ে বাড়ীর সিঁড়ি তৈরী হয়, সেই চুণ সুরকি ও ইট দিয়ে আবার বাড়ীর ছাদও তৈরী হয়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা জ্ঞান আর ছাদে ওঠার নাম বিজ্ঞান কিনা বিশেষজ্ঞান। এই জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞানের বা বিজ্ঞানের পার্থক্য আমাদের মতন অজ্ঞানীদের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ বোলে ভ্রমে মনে হোলেও আসলে এই দুটি জ্ঞানের মধ্যে কোন তর-তম-ভেদ বা বিশেষ-অবিশেষ পার্থক্য নেই, দুটিই এক ও অখণ্ড জ্ঞান তথা ব্রহ্মবিজ্ঞান।

৮১। এ সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম: 'ফিলজফি অব হিন্দু সাধনা', পৃঃ ২০২; অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য: 'ষ্টাডিজ ইন্ বেদান্তিজিম্', পৃঃ ৩১, ৩৮, এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত 'ইজ্ এ জীবন্মুক্ত সাবজেকট টু ইগ্‌নোরেন্স' প্রবন্ধ ('প্রবুদ্ধ ভারত', ইংরেজী পত্রিকা, আগষ্ট ১৯৪৪, পৃঃ ৩৩০-৩৩৬)।

৮২। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ১৬৯

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ডাঃ এস. কে. মৈত্র তাঁর 'ইন্ট্রোডাকসান টু দি ফিলজফি অব শ্রীঅরবিন্দ' বইয়ে (পৃঃ ১০৪) যে উল্লেখ করেছেন: "He (Sri Aurobindo) is *the first* to declare that it is possible for man in this terrestrial life in this physical body to attain complete divinity,"—এ মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ আচার্য শংকর ও তাঁর মতানুবর্তীরা জীবন্মুক্তির কথা শ্রীঅরবিন্দের অনেক আগেই উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতিও স্পষ্ট ভাষায় জীবন্মুক্তবাদ স্বীকার করেছেন।

৮৩। বিবেকানন্দ: 'কম্‌প্লিট ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ', ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৬৪

৮৪। শ্রীম: 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (৯ম সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ৬০, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮২—১৮৩

৮৫। (ক) অধ্যাপকদ্বয় হ্যালডেন্ ও কেম্প্ সংপাদিত 'দি ওয়ার্লড্ এ্যাজ্ উইল্', ১ম ভাগ, পৃঃ ৫০৪-৫০৫, (খ) অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্: 'এ্যান্ আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অব লাইফ', পৃঃ ১২৪

ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ অদ্বৈতবাদকেই সমর্থন করেছেন বোঝা যায়, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দার্শনিক মতবাদের অভিনবত্ব-বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'শংকরের বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত'। এই থেকে মনে হয় স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতবাদকে শংকরের মতবাদের প্রতিধ্বনি বলতে চান নি, নূতনত্ব ও মৌলিকতা শ্রীরামকৃষ্ণধর্মে ও দর্শনে অবশ্যই আছে।[৮৬] কিন্তু সে যাই হোক, স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিখ্যাত 'আওয়ার রিলেসন টু দি এ্যাবসোলিউট' বইয়ে 'ষ্টেট্‌স্ অব একৃজিস্‌টেন্স্' আলোচনায় (পৃঃ ১৫০) উল্লেখ করেছেন : "এখানে একথাই প্রমাণ হোচ্ছে যে, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্।"[৮৭] অদ্বৈতবাদকে তিনি স্বীকার করেছেন চরমসত্য বা ব্রহ্মানুভূতির দিক থেকে, নচেৎ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত ও একেশ্বরবাদ এ সমস্তকে তিনি স্বীকার করেছেন একই সত্যে পৌঁছাবার ভিন্ন ভিন্ন পথ বা উপায় হিসাবে। এছাড়া 'ইজ্ বেদান্ত প্যান্-থিয়িষ্টিক্' আলোচনায় [৮৮] ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন : 'বেদান্তের মতে সকল রকম মতবাদ একটি অপরগুলি থেকে ভিন্ন শ্রেণীহিসাবে, স্বরূপত নয়' ('Vedanta says that all these differences in *isms* are mere differences of degree and not of kind')। তিনি আরো বলেছেন : "যদি আমরা মেনে নিই যে, দর্শনের মতবাদগুলি অধ্যাত্ম-বিকাশের পথে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা সোপান মাত্র, কিম্বা যদি কোন রকম সম্প্রদায়ভেদ, ভিন্ন ধর্মমত প্রভৃতি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ না করি ** তাহোলে নিশ্চয়ই আমরা অদ্বৈতবেদান্তের যথার্থ অনুগামী বোলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারব।"[৮৯] এ থেকে স্বামী অভেদানন্দের মতবাদ যে উদারতার পরিবেশ নিয়ে পরিপুষ্ট একথা সহজেই বোঝা যায়; কেননা তিনি সুস্পষ্টভাবে আবার স্বীকার করেছেন : "অতএব শুদ্ধব্রহ্মের অনুভূতিরও তার সাথে সম্পর্ক পাতানোর ভিন্ন ভিন্ন উপায়রূপে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, এই সকলকেই বেদান্তদর্শনগ্রহণ করেছে।"[৯০] আবার অদ্বৈতদৃষ্টিতে মাত্র পরমসত্যের নিরাবরণ যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করা

৮৬। পৃথক্‌ভাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন' আলোচনা করার সময় এ' সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছা রইল।

৮৭। "Now, this *Brahman* is one without a second : *Ekamevâdvitiyam*." —'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাব্‌সোলিউট্', পৃঃ ১৫০

৮৮। অভেদানন্দ : 'এ্যাটিচিউট অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস রিলিজিয়ন', (১৯৫৭), পৃঃ ২২-২৭

৮৯। 'If we admit that all these *isms* are nothing but diffrent stages of spiritual evolution, ***"

বার্ণার্ড শ'-ও ক্রমাভিব্যক্তির পক্ষপাতী। তিনিও লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মানুষ যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করে সেই সম্বন্ধে বলেছেন : "* * mankind gains a stature from generation to generation, from epoch, to epoch, from barbarism to civilization, from civilization to perfection." —'ব্যাক্ টু মেথুসেলা', পৃঃ ১৭৩-১৭৪

৯০। "Therefore, Vedanta teaches that dualism, qualified non-dualism, and

যায়, অন্যগুলি অদ্বৈতভূমিতে আরোহণের ভিন্ন ভিন্ন সোপান মাত্র—একথাও মুক্তকণ্ঠে তিনি প্রকাশ করেছেন, যেমন: "সুতরাং অকৃত্তিম ও একনিষ্ঠ অদ্বৈতবেদান্তের সাধক ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভূতি লাভ করতে ইচ্ছা করলে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারিত কোনটির সিদ্ধান্তেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখ্‌বেন না, তিনি সাধনার আরো অন্তরতর দেশে, আরো গভীরতম প্রদেশে যাবার চেষ্টা করবেন ও সেখানেই সকল পরিবর্তনবিহীন সম্বন্ধ-বিরহী নির্বিশেষ পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি কর্‌বার চেষ্টা করবেন।"[৯১] তারপর "ব্রহ্মে কোন বিকাশ বা বৈচিত্র্য নেই, তিনি সকল বিকাশের অতীত" ('There is no manifestation. It is beyond all manifestations.'[৯২]) বলায়, স্বামী অভেদানন্দ যে গুণাতীত মায়ালেশবিহীন শুদ্ধব্রহ্মকেই চরমসত্য বোলে স্বীকার করেছেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া স্বামী অভেদানন্দের অনুভূত ও প্রত্যক্ষীভূত চরমসত্য প্লেটো, এরিষ্টটেল, প্লটিনাস, এক্‌হার্ট, স্পিনোজা, কাণ্ট, ফিক্টে, শেলিঙ, হেগেল, বের্গসেঁা, ব্রাড্‌লে, বোস্যাংকে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের 'এ্যাবসোলিউট'-এর চেয়ে অনেক মহান ও মহিমময়।

প্লেটো ছিলেন বিজ্ঞানবাদী, কিন্তু বস্তুতন্ত্রবাদের ছায়াও তাঁর বিজ্ঞানবাদকে সামান্যভাবে আবৃত করেছিল। প্লেটোর 'আইডিয়া' বা স্ফোট চরমবস্তু, তা সকলেরই কারণ, অথচ নিজের কারণ কিছুই ছিল না, জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, কিন্তু নিরধিষ্ঠান ছিল নিজে। তবে এই আইডিয়া বা স্ফোট-কে বস্তুবিশেষ বোল্লে ভুল বলা হবে, আইডিয়া বা আইডিয়াজ্‌ চিন্তারাশিরই পরিণতি; অথবা বলা যায় আইডিয়ার সমষ্টি-মূর্তি গড়ে তুলেছে চিন্তা বা ভাবরাশি। এই আইডিয়া এক হোলেও বহুর মধ্যে এক, কেননা 'এক' চিন্তা করতে গেলেই 'বহুর' অস্তিত্বকে মুছে ফেলা যায় না। তাই পরমার্থ, তত্ত্ব কল্যাণতমের প্রতীক। আইডিয়াগুলি বিশ্বগত ও বিশ্বোত্তীর্ণ (ইমানাণ্ট্‌ ও ট্রান্‌সান্‌ডাণ্ট্‌) দুইই। বিশ্বগত এজন্যে যে, জাগতিক সকল বস্তুতেই তা অনুস্যূত হোয়ে রয়েছে, আর বিশ্বোত্তীর্ণ এজন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়িক বস্তু ছাড়া তার নিজস্ব একটি সত্তা আছে। প্লেটো মাঝে মাঝে জগৎকারণ ভগবানের কথাও উল্লেখ করেছেন, যেমন 'আইডিয়াজ' এক, আবার অনেকও। মোটকথা প্লেটো আইডিয়াজকে পরমার্থ সত্য বলেছেন, আর পার্থিব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জিনিসগুলির মধ্যে সত্যতা অর্ধেক ও

monism are the different stages in the process of realization of that Absolute and its relation to us."—'আওয়ার রিলেসান্‌ টু দি এ্যাবসোলিউট, পৃঃ ১৯৭

৯১। "Therefore the monistic thinkers, who are the sincere and earnest seekers after the Absolute, do not stop in dualism, do not stop in qualified non-dualism but they want to go deeper and still further and try to find out the Absolute truth, which is beyond all changes and beyond all relation."—'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৮৯

৯২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৯০

অসত্যতা আছে অর্ধেক। কাজেই আইডিয়াজ্ ভিন্ন জিনিসকে প্লেটো মিথ্যা বলতে পারেন নি, আর এজন্যে অদ্বৈতবাদের ছদ্মবেশে দ্বৈতবাদের তিনি ছিলেন অনুরাগী। প্লেটো পরমার্থবস্তুর কথাও বলেছেন আবার ব্যবহারিক জিনিসের উপযোগিতাকেও অস্বীকার করতে পারেন নি, অথচ এই দুটি বস্তুর মধ্যে যোগসূত্রেরও কোন ধারা তিনি খুঁজে পান নি। একদিকে জগৎ, অন্যদিকে পরমতত্ত্ব স্পোট—একদিকে ম্যাটার, অন্যদিকে রিজন্ বা বুদ্ধি, কিন্তু এই দুটিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার কোন সন্ধানও তিনি দিতে পারেন নি। এজন্যে সত্তা ও সত্যের মধ্যে ছিল একটি বিশৃঙ্খলার ভাব, মিতালীর কোন পরিচয়ই ছিল না। তিনি তাই দূরত্বের ব্যবধানকে রেখে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছিলেন, দ্বন্দ্বহীন অদ্বৈতের নিবারণ রূপের সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের পরমার্থতত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় নিঃসঙ্গতার এক শান্তিময় পরিবেশ, অথচ নিরাসক্ত সম্পর্ক পাতানোও দেখি মালিন্যপূর্ণ পার্থিব জগতের সাথে।

এরিষ্টোটেলের দার্শনিক মতবাদও দ্বৈতবাদের মায়াকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে নি। এমন কি প্লটিনাস, এক্‌হার্টের দ্বন্দ্বাতীত ভগবানও স্বামী অভেদানন্দের মায়ালেশশূন্য ব্রহ্মচৈতন্যের মহিমা-সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

স্পিনোজার পরমার্থবস্তু বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে আগেও আমরা আলোচনা করেছি। অধ্যাপক সেথ প্রেঙগিল্‌প্যাটিসন তাঁর 'ম্যান্‌স্ প্লেস্ ইন্ দি কস্‌মস্' বইয়ে দার্শনিক ব্রাড্‌লে-কে নব্য-স্পিনোজাধর্মী বোলে সমালোচনা করার সময়ে স্পিনোজার ব্রহ্মের মধ্যে অখণ্ডতার ভাবকে খণ্ডসমষ্টির রূপ বলেছেন। হ্যারোল্ড এইচ্. জোয়াকিম্‌ও স্বীকার করেছেন: "ঈশ্বরের কার্য বা কারণ-ভাবের মধ্যে সকল রকম বিকাশবৈচিত্র্য ও পরিপূর্ণতার বিচিত্র স্তর নিহিত আছে। তবে এদের মধ্যে সমস্ত-কিছু অনৈক্য ও অসমঞ্জস ভাব অখণ্ড ঈশ্বরে লীন হয়ে থাকে, ঈশ্বর ছাড়া বাইরে তাদের পৃথক অস্তিত্ব কিছুই থাকে না'।[১৩] এইটি অনেকটা ব্রাডলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের মতন অবস্থা। ব্রাড্‌লের ন্যায় স্পিনোজাও সত্যের মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ (degrees) স্বীকার করেছেন যা স্বামী অভেদানন্দের মতে অসঙ্গত। অনন্ত বা অখণ্ড একটি মাত্র জিনিসই হয়, কিন্তু স্পিনোজা ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সাথে সাথে তাঁর জড়জগৎ ও মন এই দুটি বিকাশকেও অনন্ত বল্‌তে চেয়েছেন। এজন্যে স্পিনোজার মতবাদে সমান্তরাল দুটি সত্যের স্থান পাওয়া যায়। একই সময়ে অনন্ত বা অখণ্ড দুটি জিনিস থাক্‌তে পারে না, দুটির মধ্যে একটি নিশ্চয়ই আপেক্ষিক ও অনিত্য হবে। স্বামী অভেদানন্দ ঠিক সে কথাই নিজের মতবাদে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পরমার্থ-সত্যের মধ্যে ব্যবহারিক সত্য থাকায় কোন বাধা নেই,

[১৩] "In God's 'essentia' or 'potentia', all the multiplicity of his states, and all their degrees of perfection are comprehended and sustained. And in that comprehensive being their distinctions are *absorbed*, but not *left out*—"এ ষ্টাডি অব দি এথিকস অব স্পিনোজা' (১৯০১), পৃঃ ১১১

কেননা পারমার্থিকের তুলনায় ব্যবহারিকের সত্যতা সাময়িক ও অনিত্য। কাজেই স্পিনোজার দার্শনিক চিন্তায় দ্বৈতবাদের ছায়া সুপরিস্ফুট।

ব্রহ্মের বিচারে কাণ্ট ও স্বামী অভেদানন্দের মধ্যেও অমিল যথেষ্ট। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে কাণ্ট ও স্বামী অভেদানন্দ দুজনেই বিষয়-বিজ্ঞানবাদ (অবজেক্টিভ আইডিয়ালিজম্) স্বীকার করেন। আচার্য শংকর ও শংকরানুবর্তীদের অনেকেও তাই। কাণ্ট ব্রহ্মের প্রসঙ্গে বলেছেন, ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ (transcendental Noumenon), সকল-কিছু বিকাশ বা বৈচিত্র্যের তিনি বহু ঊর্ধে অবস্থিত ('transcends everything phenomenal')।[১৪] জগৎকে একেবারে অস্বীকার না কোরে ব্রহ্মের সাথে তার সম্পর্ক দেখাবার জন্যে কাণ্ট বলেছেন: 'কোন-কিছুর সম্পর্কে জগৎ' ('an appearance to *something*')।[১৫] এই 'কোন-কিছু' বা '*something*' কাণ্টের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ব্রহ্ম (unknown and unknowable Absolute)। ভাষ্যকার নর্মান স্মিথ ও পেটন দুজনেই এই 'কোন-কিছুর সম্পর্কে জগৎ' কথাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন: "কাণ্টের চিন্তায় বিজ্ঞানবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদ এই দুটিরই সমন্বয় আছে" ('In his (Kant's) thought idealistic and realistic tendencies are at work'); পারমার্থিক বস্তু ব্রহ্ম (Thing-in-itself) যেন এ' দুটির সহযোগের পরিণতি।[১৬] প্রকৃতপক্ষে স্মিথ্ ও পেটনের সিদ্ধান্ত সত্য, কেননা বার্কলে বিশ্ববৈচিত্র্যকে বলেছেন কাল্পনিক বা মনের সৃষ্টি (mind's creation), কিন্তু কাণ্টের কাছে বাস্তব জগতের ব্যবহারিক উপযোগীতা আছে। কাণ্ট বলেছেন: বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার কাছে প্রতীত হয় ('the world is given to us'), আর অজ্ঞাত অতীত পরমসত্যেরি তা ভিন্ন বিকাশমাত্র, সুতরাং সত্তা ও সত্য কিছু-না-কিছু তাতে অবশ্যই আছে ('involves the reality of things-in-themselves')।[১৭] স্বামী অভেদানন্দ ঠিক এ' রকম কথা না বোল্লেও জগৎ যে ব্রহ্মেরই

১৪। Phenomenon-কে জার্মান ভাষায় বলে *Erscheining*, যার প্রকৃত অনুবাদ ইংরাজীতে *appearance*, কিন্তু মনীষী মেইকেলজোন্ ও মোক্ষ মুলার appearance-র পরিবর্তে phenomenon শব্দ ব্যবহার করেছেন জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্যকে বোঝাবার জন্যে। কাণ্ট নিজেই appearance ও phenomenon শব্দ দুটির মধ্যে যে অর্থগত পার্থক্য আছে তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "Apperances so far as they are thought as objects according to the unity of the categories are called *phenomena*"—নর্মান্. কে. স্মিথ: 'কমেণ্টারী টু কাণ্টস্ ক্রিটিক্ অব পিওর রিজ্‌ন্', পৃ: ৮৩; এবং এইচ. জে. পেটন: 'কাণ্টস্ মেটাফিজিক অব একস্‌পিরিয়ান্স', ১ম ভাগ, পৃ: ৯৬

১৫। গ্রীক দার্শনিক পারমেনাইডেস্-এর বিকাশরূপী চিন্তাও কোন-কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ—'thoughts to *something*'। এই something-ই তাঁর অচঞ্চল সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

১৬। অধ্যাপক পেটন: 'কাণ্টস্ মেটাফিজিক অব এক্‌সপিরিয়ান্স', ১ম ভাগ, পৃ: ৬৮, ৭০

১৭। অটো ক্লাইডারও উল্লেখ করেছেন: যদিও কাণ্ট একবার বলেছেন—'that which underlies the phenomenon, the *Nonmenon* is no object of knowledge', কিন্তু একথাও আবার বলেছেন—'the existence of things-in-themselves is the self-evident presupposition, basis and correlative of phenomena.'—'ফিলজফি অব রিলিজিয়ন্,' ১ম ভাগ, পৃ: ১৫৪, ১৬১

ইচ্ছা (তপস্যা) থেকে সৃষ্টি হয়েছে, জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য যে অনুস্যূত হোয়ে রয়েছে, ব্রহ্মের সত্তা ও সত্যের আলোকেই যে জগৎ ব্যবহারিক ভাবেও সত্তাবান ও সত্য একথা স্বীকার করেছেন। তাঁর সাথে কাণ্টের মতবিরোধ কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: ব্রহ্ম চরমসত্য অর্থাৎ পারমার্থিক সৎ, জগৎ পারমার্থিক অর্থে অনিত্য—'পারমার্থিকতত্ত্বেন মিথ্যা', আর এজন্যে ব্রহ্ম ও জগতে বা পারমার্থিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে আসলে বিরোধও কিছু নেই; কেননা ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, জগতের মূল ও আশ্রয়, আর তাই এদের উভয়ের ভিতরে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। যদি বিরোধই থাকত, তাহোলে ব্রহ্মসত্তা হোত নকল; কিন্তু তা নয়। তাছাড়া স্বামী অভেদানন্দ একথাও বলেছেন যে, ব্রহ্ম ও জগতের একত্রে অবস্থিতি হোতে পারে, কারণ ব্রহ্ম জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী (antithesis) নন, বরং এদের মধ্যে সমন্বয়ই (synthesis) চিরদিন আছে। উদাহরণ যেমন, জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর থাকার জন্যে জাগতিক সকল রকম ব্যবহার হয়: জীবন্মুক্ত জ্ঞানী সাধারণ লোকের মতন হাসেন, ৮ ন, কথা বলেন, খান, শয়ন করেন, কাজ করেন—সব-কিছু জাগতিক কার্য তাঁর দিব্যজী. থেকে বাদ যায় না, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের জাগপ্রদীপ তাঁর অন্তরে চিরজাগ্রত থাকে, এতটুকুও তা ম্লান হয় না। তাছাড়া ব্রহ্ম ও জগতে যে সত্যিকার কোন ভেদ নেই, তার কারণ ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগতের কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যেমন দড়ি দেখে মিথ্যা সাপের ভান বা প্রতীতি হয়, অথচ দড়িকে বাদ দিলে মিথ্যা সাপের কোন অস্তি. থাকে না, কারণ মিথ্যা সাপ সত্যিকার দড়ির ওপর প্রতীত হয়, তমনি পারিমার্থিক সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন কোরে মিথ্যা জগৎ প্রতীত ও ব্যবহারিক ত্য বোলে জ্ঞান হয়, কাজেই ব্রহ্মের সাথে জগতের কোন বিরোধ আসলে থাকতে পারে না।[১৮] স্বামী অভেদানন্দের সাথে কাণ্টের এখানে বিশেষ মতবিরোধ নেই। কিন্তু অনৈক্য হয়েছে সেখানে যেখানে কাণ্ট তাঁর ব্রহ্মকে (Thing-in-itself-কে) বলেছেন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable)। শুধু তাই নয়, কাণ্ট যখন আবার বলেছেন, মানুষ জানতে পারে কেবল ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির জগৎকে ('a world of thought or

১৮। ডাঃ শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম বলেছেন: "এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিতে কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এইরূপ বুঝায় না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের আধার, স্বাতন্ত্র্যই কার্য-কারণ-পারতন্ত্র্যের মূল সত্তা এবং আশ্রয়, ব্রহ্মই জগতের আধার ও আশ্রয়—এই সকল কথার অর্থ এক। যেমন Kant-এর মতে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কার্যকারণ ব্যবস্থিতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত স্বাতন্ত্র্যের কোন অসঙ্গতি নাই, যেমন Spinoza-র মতে পরিণামগ্রস্ত বস্তুর নানাত্বের সঙ্গে এক পরমবস্তুর পারমার্থিক সত্তার কোনও অসঙ্গতি নাই, সেইরূপ বেদান্তমতে এই দৃশ্যমান জগতের সঙ্গেও সর্বসম্বন্ধাতীত ব্রহ্মসত্তার কোন অসঙ্গতি নাই। * * * সসীম জগৎ ব্রহ্মের বহির্ভূত বস্তু নয় এবং ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্নও নহে। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে আর একটি পৃথক তত্ত্বের সৃজন হয় এবং তাহা হইলে বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ আর থাকে না।"—'দর্শন' পত্রিকার (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪১, শ্রাবণ) 'বেদান্তের সর্বাতিশয়িত্ব' প্রবন্ধ, পৃঃ ১২৬

experience'), কিন্তু অতীন্দ্রিয় স্বরূপসত্তাকে কোনদিনই সে জানতে পারে না,[৯৯] অথচ চিন্তার ভেতর দিয়ে তাঁকে কল্পনা করতে পারে ('it cannot be known at all, it can only be conceived or thought'), স্বামী অভেদানন্দ তা মোটেই মেনে নিতে পারেন নি, কেননা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না, অথচ তাঁকে চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার বা কল্পনা দিয়ে জানা যায়—কাণ্টের একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাছাড়া কাণ্ট যে তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন তাই বা ক্যামন কোরে সম্ভব হয়? কারণ ব্রহ্ম যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তাও তো কাণ্ট বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে স্বচ্ছভাবে বুঝেছেন, সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ যে একেবারে জানা যায় না তাও নয়। মনীষী হফ্‌ডিঙও কাণ্টের এই রহস্যপূর্ণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন: কাণ্টের সেই অজ্ঞেয় পরমবস্তুর অনুভূতির যখন নির্দিষ্ট কোন পরিচয় নেই তখন তাঁকে জানার আকুলতা-রূপ অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা তার মধ্যেই আছে, আর সেজন্যে পরিবর্তনও তার আছে একথা মেনে নিতে হ'বে—"It (Thing-it-itself) is itself in the grip of becoming, of evolution; it may possibly suffer changes * *.)"।[১০০] মনীষী অটো ফ্লাইডার বলেছেন: ব্রহ্মকে চির-অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলার জন্যে বুঝ্‌তে হবে যে, "কাণ্ট নিজেই একটি সংস্কারের বশবর্তী হয়েছেন, * * সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষকবাদ ও অযৌক্তিক রহস্যপূর্ণ দ্বৈতবাদের দিকেই তিনি ছুটে চলেছেন। * * তিনি অপরিণত আগ্রহ ও প্রবৃত্তিকে নিয়ে আছেন, অসংখ্য অসংগত প্রতিবন্ধক ও অমীমাংসিত সমস্যা তাঁকে ঘিরে আছে।"[১০১]

ব্রহ্মবিচার সম্বন্ধে হেগেলের সাথেও স্বামী অভেদানন্দের পার্থক্য অনেক। হেগেল বিশ্ববৈচিত্র্যকে বলেছেন বুদ্ধির প্রতিভাস (*reflection-into-itself*) বা শুদ্ধচিন্তার বিকাশ ('a development of thought')। ফিক্টের সিদ্ধান্তও তাই যে, সমগ্র জীবজগৎ পরিপূর্ণ মনের পরিণতি—'embodiment of pregnant thought'। শুদ্ধসত্তাবিশিষ্ট ভগবান ছাড়া জগতের অস্তিত্ব নিরর্থক ছায়ামাত্র। তাই জীব ও জগৎকে নিয়ে ভগবান মহিমময়, বিশ্বোত্তীর্ণ তিনি মোটেই নন। হেগেল বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করেন নি, বরং ঐক্য বা সমন্বয়-নীতিকেই তিনি শ্রদ্ধার সাথে বরণ করেছেন, কাজেই বৈচিত্র্যের বুকে ঐক্যের

৯৯। কাণ্টের ব্রহ্মকে যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়ে জানা যায় না। অধ্যাপক পেটন তার উল্লেখ কোরে বলেছেন: "Therefore neither by intuition, nor by understanding, nor by reason, nor by any combination of these, can we have *a priori* knowledge of things in-themselves, although we can have such knowledge of the phenomenal world."—'কাণ্টস্ মেটাফিজিক অব এক্সপিরিয়ান্স', ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৪

১০০। অধ্যাপক হফ্‌ডিঙ্: 'ফিলজফি অব রিলিজিয়ন্', পৃঃ ৮৫

১০১। "He (Kant) himself is still too deeply sunk in the prejudices * * in sceptical empiricism and dogmatic mystical dualism. * * He remains accordingly with undeveloped tendencies, and surrounded with unreconciled oppositions still awaiting solution."

সিংহাসনকেই করেছেন তিনি প্রতিষ্ঠা ('the identity of opposites')। এই সমন্বয়ের নীতি বা প্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে মনীষী ফল্কেনবার্গ বলেছেন: সমন্বয়ের প্রথম প্রণালী হোল সাক্ষাৎ সংযোগ বা একীকরণ ('immediate unity'), তারপর বিরোধ-রূপ পার্থক্যের বিশ্লেষণ ও অনুভূতি ('divergence opposition') ও পরিশেষে ঐ পার্থক্য বা ভেদের একীকরণ ('reconciliation of opposites')।[১০২] এই তিনটি প্রণালীর মধ্যে দিয়ে বিরোধী যা-কিছু সবের সমন্বয় সাধিত হয়। দার্শনিক ক্রোচেও বলেছেন যে, তখনি ঠিক ঠিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৩] কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের চোখে হেগেলের এই সমন্বয় বা ঐক্য অনৈক্যের নামান্তর, কেননা এই ঐক্যের বুকে অসংখ্য বুভুক্ষু ও চলমান অনৈক্য সর্বদা অখণ্ডতার প্রতিছায়া রচনা কোরে মৌন হোয়ে থাকে; বৈচিত্র্যবিশিষ্ট হোয়ে হেগেলের ব্রহ্মের হয় রূপায়ন, তাই এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সসীমতাকে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন 'বন্ধন'। স্বামী অভেদানন্দ প্রতিপাদিত অদ্বিতীয় বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম এই বন্ধন থেকে চিরমুক্ত।

ব্র্যাডলে-র অদ্বৈতব্রহ্মও স্বামী অভেদানন্দের বিচারদৃষ্টিতে পূর্ণ নয়, ব্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদ বরং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নামান্তর। ব্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপিকা প্রিঙ্‌গিলপ্যাটিসন তাঁর 'ম্যান্‌স্ প্লেস্ ইন্ দি কস্‌মস্' বইয়ে লিখেছেন: "The logic of abstract identity which he (Bradley) brings in against phenomena, is fatal in the end to his Absolute also, * * to the undifferentiated unity of Spinoza's substance." অর্থাৎ ব্র্যাড্‌লেকে প্রিঙ্‌গিল-প্যাটিসন নব্য-স্পিনোজাতন্ত্রী (Neo-Spenozism) বলেছেন,[১০৪] কেননা ব্র্যাড্‌লে নাকি স্পিনোজা ও কাণ্টের মতন ব্রহ্মকে বিচার-বুদ্ধির অতীত বলতে গিয়ে বিশ্ববৈচিত্র্যের সাথে ব্রহ্মের বিরোধভাব প্রমাণ করেছেন। কিন্তু প্রিঙ্‌গিলপ্যাটিসন-এর সমালোচনা কতটুকু সমীচীন তা ভেবে দেখবার বিষয়। স্পিনোজা বৈচিত্র্যকে জড় ও মনের—বিস্তৃতি ও চিন্তার সাথে ওতঃপ্রোত দেখিয়ে বিকাশের দিক থেকে জড়জগৎ ও মন বা বুদ্ধিকে অদ্বিতীয় অচঞ্চল ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন পৃথক ও স্বাধীন বোলে প্রমাণ করেছেন, তেমনি মুক্তির অবস্থায়ও সেই প্রমাণকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, ঈশ্বরের সাথে তাদের অপৃথক ও অভিন্ন দেখাতে পারেন নি। কাণ্ট ও ব্যাড্‌লের অবস্থাও তাই। কাণ্ট ঐন্দ্রিয়িক জগৎকে অতীন্দ্রিয় অজ্ঞাত ব্রহ্ম থেকে চিরদিন অপাঙ্‌ক্তেয় কোরে রেখেছেন এবং ব্র্যাড্‌লে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্থূল অবস্থা থেকে মুক্ত কোরে সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মের মধ্যে অন্তর্বিরোধশূন্য কোরে বজায় রেখেছেন, একেবারে সর্বব্যাপক ব্রহ্মের সাথে অভেদ দেখাতে

১০২। ফল্‌কেনবার্গ: 'হিষ্ট্রী অব মডার্ণ ফিলজফি', পৃঃ ৪৯২

১০৩। বি. ক্রোচে: 'ফিলজফি অব হেগেল', পৃঃ ৫২

১০৪। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ (ইংরেজী মাসিকা পত্রিকা) প্রকাশিত ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাস লিখিত 'ইজ্ ব্র্যাড্‌লেজ্ এ্যাবসোলিউট এ মিয়ার ব্লাঙ্ক্?' প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৩৬

পারেন নি। এজন্যে অন্যান্য দার্শনিকদের মতন রুগ্গিয়েরোও (Ruggiero) তাঁর 'হিষ্টরী অব মডার্ণ ফিলজফি' বইয়ে ব্র্যাড্‌লের বিজ্ঞানবাদকে (idealism) 'প্রচ্ছন্ন সংশয়বাদ' (veiled skepticism) বোলে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি।

ব্র্যাড্‌লের মতে আমাদের চিন্তার শেষ পরিণতি হয় তখনি যখন অন্তর্বিরোধহীন আত্মসঙ্গতি (self-coherence) আমরা লাভ করি। এই আত্মসঙ্গতি মুক্তির পরিপূর্ণ রূপ। সর্বব্যাপকতাও এই আত্মসঙ্গতির আর এক দিক, কেননা সংকীর্ণতাই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কারণ, সুতরাং নির্বিরোধ ও নির্দ্বন্দ্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হোতে গেলে সংকীর্ণতার সীমা ভেঙে ফেল্‌তে হবে। অহং, ব্যষ্টি-আত্মা, দেশ-কাল, দ্রব্য-গুণ, কার্য-কারণ এই সমস্তকে ব্র্যাড্‌লে সূক্ষ্মযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও বিশ্লেষণ কোরে বলেছেন—তারা মায়ার নামান্তর। বৈচিত্র্যময় সংসারে দ্রষ্টা ও দৃষ্টি—বিষয়ী ও বিষয় থাকে, কিন্তু তারা যে জ্ঞানের সন্ধান দেয় তাতে মায়িক সম্বন্ধ থাকে বোলে তা সবিকল্পক; নির্বিকল্পক জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ীভেদ থাকে না, পরন্তু অস্ফুট, ঐক্য ও অখণ্ডতার ভাব তাতে সুপরিস্ফুট থাকে। সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানমাত্র অনিত্য, সুতরাং মিথ্যা। একমাত্র সম্বন্ধবিহীন নির্বিকল্পক জ্ঞানই অন্তর্বিরোধশূন্য ব্রহ্মস্বরূপকে প্রকাশ করে। ব্রহ্মের মধ্যে রূপান্তরের স্থান আছে; সমগ্র বিরোধপরিপূর্ণ বিচিত্র জগৎ আত্মসঙ্গতিময় ব্রহ্মের মধ্যে রূপান্তরিত হোয়ে থাকে, তার কিছুরই নষ্ট হয় না ("in the Absolute no appearace can be lost')। জগতের সকল রকমের বিরোধ ও দোষ-ত্রুটী ব্রহ্মে মধ্যে স্থানলাভ করে, অপূর্ণতার মালিন্য মুছে ফেলে পূর্ণ ও পবিত্র হয় ও ব্রহ্মেরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য হয়।[১০৫]

ব্র্যাড্‌লে অনুভূতিকেই একমাত্র সত্য বলেছেন,[১০৬] ব্রহ্ম তাঁর কাছে পরিপূর্ণ অনুভূতির স্বরূপ। সুখ ও আনন্দের সংগতি এই পরিপূর্ণ অনুভূতির ভিতর পাওয়া যায়।[১০৭] বিশ্ববৈচিত্র্যের সব-কিছুই রূপান্তরিত হোয়ে পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে ঐশ্বর্যপূর্ণ কোরে তোলে। কিন্তু এও আসলে পারমার্থিক সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ্‌লে অনুভূত হয়, কিন্তু পৃথক সত্তা হিসাবে বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য সম্পূর্ণ মানুষের সাধারণ জ্ঞানের অতীত ("The nature of that system in detail lies beyond our knowledge, * * *"), সেজন্যে এই রহস্য অনির্বচনীয় ("* * we found was inexplicable")। বিশ্বসত্তার দিক থেকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কেনই বা বিশ্ব সৃষ্টি হোল, বৈচিত্র্যের সার্থকতাই বা কি?—তাহোলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই

১০৫। "Every element, however subordinate, is preserved in that relative whole in which its character is taken up and merged. * * They are factors not independent, since each of itself implies and calls in something else to complete its defects, and since all are overruled in that final whole which perfects them."—'এ্যাপিয়ারেন্স্ এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' (১৯৩০) পৃঃ ৪০৪

১০৬। 'Everything is experience, and also experience is one'.—'এ্যাপিয়ারেন্স্ এ্যাণ্ড রিয়ালিটি', পৃঃ ৪০৫

১০৭। 'Reality is one, that is essentially is experience, and that it owns a balance of pleasure."—ঐ, পৃঃ ৪৫৩

সহজ নয়।[১০৮] অবশ্য একথা অদ্বৈতবেদান্তবাদীদের যে অনেকটা অনুরূপ তা আগেই আমরা আলোচনা করেছি। ব্রাড্‌লে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: ব্রহ্ম জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন হোলেও রূপান্তরিত আকারে প্রকাশ পান, সুতরাং অনির্বচনীয়। সত্য, শিব, সুন্দর এই গুণগুলি ব্রহ্মে পৃথক অথবা অপৃথকভাবে থাকে না, এরা রূপান্তরিত হোয়ে লীন থাকে। তবে এরা পৃথকভাবে প্রকাশ পায় বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিচার করলে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সত্য-শিব-সুন্দর বা সৎ-চিৎ-আনন্দ গুণগুলি অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ-ব্রহ্মের অপরিহার্য অঙ্গভূষণ নয়, কেননা গুণ ভেদের নির্দেশক বোলে মায়ার কোঠাতেই পড়ে, সুতরাং মায়াবী বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের গুণ হিসাবেই তারা গণ্য। তাছাড়া সত্য, শিব ও সুন্দর গুণগুলি পরস্পর ভিন্ন নয়, একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, কেননা সৎ বা সত্তাবান না হোলে তার চিৎ বা প্রকাশ থাকা অসম্ভব, আবার প্রকাশ না থাকলে আনন্দও থাকতে পারে না, কাজেই সৎ, চিৎ আনন্দ বা সত্য, শিব ও সুন্দর প্রত্যেকটির ভিতর একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, অথবা এক ঈশ্বরই প্রকাশিত হন তিনটি রূপে প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য কোরে। কাজেই ব্র্যাড্‌লে যে ব্রহ্ম থেকে গুণগুলিকে পৃথকও নয়, অপৃথকও নয় অথবা পৃথক হোয়েও অপৃথক বোলেছেন তা অদ্বৈতবেদান্তের অনির্বচনীয় মায়ার প্রকৃতির মতনই শোনায়। কিন্তু ব্র্যাড্‌লে একথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে, গুণগুলি স্বরূপতই হোক বা রূপান্তরিত হোয়েই হোক শুদ্ধব্রহ্মে সমনিয়তভাবে থাকতে পারে না, কারণ গুণগুলি ব্রহ্মের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম অথবা কারণাকারে লুকিয়ে থাকলে সেই ব্রহ্ম কখনই অদ্বিতীয় শুদ্ধব্রহ্মের মহিমা ও মাধুর্যকে বরণ করতে পারে না। তাছাড়া ব্র্যাড্‌লের ব্রহ্মে সমগ্র বিশ্বের স্থান আছে, যদিও তা রূপান্তরিত ও সম্পূর্ণ অন্তবিরোধশূন্য হোয়ে থাকে; সুতরাং ব্র্যাড্‌লের ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ এক ও অদ্বিতীয় নন। এইদিক থেকে আচার্য শংকর ও স্বামী অভেদানন্দের মতে মায়াবিরহী অচঞ্চল ব্রহ্মচৈতন্যের স্থান অনেক উচ্চে। ব্র্যাড্‌লে অনুভূতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন ও বলেছেন: "The whole (the Absolute) must be immediate like feeling, but not, like feeling, immediate at a level below distinction and relation. The Absolute is immediate as holding and transcending these differences." কাজেই ব্র্যাড্‌লের ব্রহ্ম সর্ব-বিরোধবিহীন বোলে মনে হোলেও সর্বগুণ ও উপাদানবিশিষ্ট হোয়েই বরং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অধ্যাপক রামমূর্তি লুম্বা তাই তাঁর 'ব্র্যাড্‌লে এ্যাণ্ড বের্গসোঁ' (১৯৩৭) বইয়ে (পৃঃ ১২৬) আচার্য শংকর ও ব্র্যাডলের মতবাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "And consequently, while the *Brahman* as conceived by Sankara is a pure, homogeneous. attributeless Being, Bradley's Absolute is a unity-in-diversity, an individual whole of concrete qualities."

হেগেল, বোসাংকে, গ্রীণ, কেয়ার্ড, ম্যাক্‌টেগার্ট, রয়েস, হাউইসন, বের্গসোঁ, প্রিঙ্গেল-

১০৮। "Why there are appearances, and why appearances of such various kinds, are questions not to be answered."—ঐ, পৃঃ ৪৫৩

প্যাটিসন, ম্যাকগিলভারি, রাসেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রতিপাদিত এক ও বহুর সমন্বয়ে সমষ্টিমূর্তি ব্রহ্ম থেকেও স্বামী অভেদানন্দের প্রতিপাদিত ব্রহ্মের স্বরূপ ও মহিমা ভিন্ন। কাণ্ট ও হেগেলের পরে দার্শনিক গ্রীনের অনুভূতিলব্ধ ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায়, গ্রীন মানুষ বা সকল প্রাণীর অন্তরতম দেশে নিহিত আত্ম-সম্বিদকে ব্রহ্ম বোলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এই আত্ম-সম্বিদকে জানার অর্থ হোলো স্বাধীনতার (Freedom) অনুভূতিকে লাভ করা। আত্ম-সম্বিদকে আবার পরমশিব বা ঈশ্বরও বলে। এই ঈশ্বরের ব্যক্তিচেতনা আছে, সুতরাং পৃথিবীর মাটিকে তিনি মোটেই অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাহোলেও ক্রমবিকাশ এবং সৃষ্টি-প্রলয়ের কোন সমস্যা সেই ঈশ্বরে নাই, সুতরাং পরিপূর্ণই তাঁকে বলতে হবে। গোড়াকার দিকে মানুষ অজ্ঞানের জন্যে নিজেকে ঈশ্বরের অংশ ভাবে, অজ্ঞানতা গেলে ভাবে পূর্ণ। এই পূর্ণতার চেতনা লাভ করার নাম মুক্তি—যা নৈতিকতা ও ধর্মের চরম-পরিণতি। যাইহোক গ্রীনের ব্রহ্ম ব্যক্তিত্ববান; মুক্তির অবস্থায় জীব-জগতের সাথে তাঁর সম্বন্ধের বিলোপ কিছু হয় না, কাজেই অদ্বৈতের মহিমা-লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত।

বের্গসোঁ তাঁর চিরচঞ্চল কালপ্রবাহ ও পরিবর্তনকে (change) বলেছেন অপরিণামী ব্রহ্ম। বের্গসোঁর মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মচাঞ্চল্য, অসংখ্য গুণ বা আকার একত্রিত হোয়ে অদ্বিতীয় একটি বস্তুসত্তায় পরিণত হয়—যা ব্র্যাড্‌লের মতে অসম্ভব। কিন্তু ব্র্যাড্‌লে এই তত্ত্ব মোটেই অনুধাবণ করতে পারেন নি যে, নিত্য ও কালাতীত কোন একটি পূর্ণসত্তা দিয়ে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে একতাসূত্রে নিশ্চয়ই গ্রথিত করা যায়। বের্গসোঁ বৈজ্ঞানিকদের পৃথক পৃথক কাল ও পরিবর্তনকে নিত্য অখণ্ড বোলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে কাল ও পরিবর্তন একটি গুণগত প্রবহমান বস্তুসত্তা যা গড়ে তুলেছে চিরনিত্য ব্রহ্মের স্বরূপ। বের্গসোঁ এই স্বরূপের আর এক নাম দিয়েছেন 'এলাঁ ভিতা' (*élan vital*)—যা বিকাশশীল শক্তি-বিশেষ ('explosive force'), ক্রমাগতই নিত্যনূতন বস্তুকে নাম-রূপ দিয়ে তা সৃষ্টি করছে। এই সৃষ্টির গতি একই দিকে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত নয়, অনন্ত তার বিকাশ, অসংখ্য দিকে তা প্রসারিত। এই সৃষ্টির নাম প্রাণের ছন্দময় লীলায়িত গতি বা 'ক্রিয়েটিভ ইভোলিউসন্'। বের্গসোঁ তাঁর 'ক্রিয়েটিভ্ ইভোলিউসন' পুস্তকে (পৃঃ ১০৩) এ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"The evolution movement would be a simple one, and we should have been able to determine its direction. if life had described a single course, like that of a solid ball-shot from a canon. But it proceeds rather like a shell, which suddenly bursts into fragments, which fragments, being themselves shells, burst in their turn into fragments destined to burst again, and so on for a time incommensurably long."

বের্গসোঁর কাল-নিরবচ্ছিন্নতা বা 'ডিউরেসন্' (duration), তা প্রাণছন্দের চিরপ্রবহমানা ধারা নয়, বা কেবলমাত্রই পরিবর্তন নয়, তাকে বলা যায় ক্রমবর্ধমান শক্তিপ্রবাহ। এই চলমানতায়

অতীতকাল বর্তমানের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয় ও ক্রমশঃ ভবিষ্যতের বুকে লীন হন।[১০৯] সুতরাং প্রতিমুহূর্তে অতীতকাল নিজেকে সঞ্চয় কোরে ভবিষ্যতের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধরণের পরিবর্তনে কালসত্তাকে সত্যিকারভাবে কালাতীতই বলা যায়, কেননা এই কালের মধ্যে সকল বিভেদের ভাব মুছে যায়, এবং বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের ভিন্নতা কিছুই থাকে না। এই বিভেদবিহীন কাল-নিরবচ্ছিন্নতাকে মাত্র অনুভূতির আলোকে জানা যায়। তবে এই অনুভূতির ভিতরে থাকে দু'টি জিনিস: সহজাত সুপ্তজ্ঞান (ইন্‌সটিঙ্কট্) ও বুদ্ধি (ইন্‌টেলিজেন্স্)।[১১০] বের্গসেঁার মতে চিন্তাবৃত্তিহীন নিরাবরণ অনুভূতির নাম সহজাত সুপ্তজ্ঞান ও বিচারযুক্ত চিন্তার নাম বুদ্ধি। এ'দুটি বৃত্তির সহমিলনে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। বের্গসেঁা বলেন, এইদুটি বৃত্তির সংমিশ্রনের অর্থ দুটি চিন্তার (thought) তথা অনুভব ও মানসবৃত্তির একীকরণ করা।

মোটকথা বের্গসেঁার মতে নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহের চলমানতাই অপরিণামী সত্তা (absolute reality)। এই সত্তার নাম 'এ'লা ভিতা' বা প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদের 'মুখ্যপ্রাণ'—যা স্পন্দনাত্মক সৃজিনীশক্তিরূপী প্রাণতত্ত্ব। এই প্রাণতত্ত্ব বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ বা সগুণ ব্রহ্ম, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর। অনন্ত প্রবাহের মুখে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ক্রিয়াশীল। বের্গসোঁর ব্রহ্ম তাই অচঞ্চল সত্তাবিরহী নৃত্যশীল নটরাজ; নাচের বিরাম তাঁর কোনদিনই নাই। বের্গসোঁর এই কালরূপী ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের সমপর্যায়ভুক্ত, সুতরাং নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মের মহিমা লাভ থেকে তিনি চিরবঞ্চিত।

জোসিয়া রয়েস তাঁর ব্রহ্মের পরিচয় দিয়েছেন 'প্রত্যক্ষানুভূতি' (*apperception*)। অবশ্য এই অনুভূতির মধ্যে থাকে মন ও অনুভবের (thought as well as experience) একত্র বিলাস। এই ব্রহ্মের করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বৈচিত্র্যের মমতা থাকে, কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়েই তিনি সার্থক ও এই সার্থকতাতে মাত্র সীমাবদ্ধ থেকে রয়েসের ব্রহ্মজ্যোতি স্বামী অভেদানন্দের মায়াবিরহী ব্রহ্ম থেকে অনেক নিষ্প্রভ[১১১]

ম্যাক্‌টাগার্ট-এর ব্রহ্ম হেগেল ও ব্র্যাড্‌লের ব্রহ্মের সাথে পাতিয়েছিলেন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ম্যাক্‌টাগার্ট-এর ব্রহ্ম সমষ্টির সমন্বয় ('aggregate') নয়, বরং একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠিবিশেষ ('a system')। কিন্তু এই গোষ্ঠির মধ্যে থাকে বৈচিত্র্য,—জাগ্রত নয়,

১০৯। বের্গসেঁা: 'ক্রিয়েটিভ্ ইভোলিউসন্', পৃঃ ২, ৫

১১০। সহজাত জ্ঞান ও বুদ্ধি এ'দুটির সম্বন্ধে বের্গসেঁা তাঁর 'ক্রিয়েটিভ্ ইভোলিউসন্' (পৃঃ ১৫৭) বইয়ে লিখেছেন: "Intelligence, in as for as it is innate, is the knowledge of a form; instinct implies the knowledge of a matter." কিন্তু আসলে আকার (form) ও জড়পদার্থ (matter) এক সত্যবস্তুরই বিভিন্ন বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

১১১। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামী অভেদানন্দ ধর্মপ্রচার-উদ্দেশ্যে যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস স্বামিজীর সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন ও তাঁদের দুজনের ভিতর দার্শনিক আলোচনার সুযোগ বহুবারই হয়েছিল।

ঘুমন্ত অবস্থায়। ম্যাক্‌টাগার্ট বলেছেন: ব্যষ্টি আত্মার সমবায়ে ব্রহ্মের রূপ গড়ে উঠ্‌লেও স্বরূপের বিকৃতি তাঁর কোনদিনই হবে না ('in some way affected by the absorption of the finite spirit into itself, yet the form of the Absolute is left unaffected',১১২ কিন্তু তাহোলেও ম্যাক্‌টাগার্টের ব্রহ্ম অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্মমহিমা লাভে অবশ্যই বঞ্চিত।

বোসাংকের ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, নিরপেক্ষ ও সর্বানুস্যুত, কিন্তু তাহোলেও সকল বিরোধ ও বৈচিত্র্যকে বরণ কোরেই তিনি নির্বিরোধ ও বৈচিত্র্যবিহীন। মন ও বুদ্ধির আলোকেই তিনি তাঁর আত্মচেতনাকে প্রকাশ করেন। ব্র্যাড্‌লের মতন বোসাংকের মতেও ব্রহ্ম সকলকে রূপান্তরিত ও আত্মগত কোরে পূর্ণ, তাই তাঁর অখণ্ড রূপের মধ্যেও খণ্ডতার মালিন্য তাঁকে পঙ্কিল করেছে।

আলেকজাণ্ডারের জগৎকারণ ব্রহ্ম ছন্দায়িত দেশ-কালের দ্বৈতরূপ। দিব্যছন্দই আলেকজাণ্ডারের ভগবান। ছন্দোময় দেশ-কালের বুকে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত। গতি ও স্থৈর্যের মধ্যে কোন ভেদ নেই, এই অভিন্নতা ও রূপবিবর্তনের মাঝখানে তাঁর ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশিত। হেরাক্লিটাস ও বের্গসেঁার ব্রহ্ম-মাধুর্যের অনুকরণে আলেকজাণ্ডার তাঁর চিরবিকাশশীল ব্রহ্মের রূপদান করেছেন, কাজেই দ্বৈতবাদকেই তিনি গ্রহণ করেছেন, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও রেখেছেন ব্যবধান উভয়কে সত্য বোলে মনে কোরে।

এ'ছাড়া প্রিঙ্গ্‌লপ্যাটিসন যেভাবে ব্রহ্মের বর্ণনা দিয়েছেন তাও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। ব্রহ্ম চৈতন্য-বিশেষ, কিন্তু দেশ-কালের অতীত নন, পরন্তু ব্রহ্মের অন্তর্বেদীতেই দেশ-কালের স্থান নির্বাচিত হয়েছে, তাই মায়াবী ব্রহ্ম মমতার বশে সৃষ্টির কাছে দিয়েছেন তাঁর নিজের প্রণতি। ম্যাক্‌গিল্‌ভারীর ব্রহ্মেও ত্রুটী দেখি ঠিক এই একই ধরণের, কেননা তাঁর ব্রহ্ম সকল-কিছু বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও উদাসীন হোলেও সকল-কিছুকে নিয়েই আবার গড়ে তুলেছেন তাঁর মহিমময় রূপ। হোয়াইটহেডের ব্রহ্মকেও বলা যায় 'বৈচিত্র্যের সমন্বয়' (*Unified Pluralism*), কেননা তাঁর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম কালের অতীত অদ্বিতীয়, কিন্তু বিশ্ববৈচিত্র্যময় ও কালের অধীন। এই উভয়ই আবার পরস্পর সাপেক্ষ: ব্রহ্মবিহীন হোয়ে বিশ্বের সত্তা থাকে না, বিশ্বের সহায়তা ছাড়া আবার ব্রহ্মও চিরদিন অসহায় ('Yet the one is helpless without the many and the many is helpless without the one'১১৩)। যদিও একথা সত্যি যে. ব্রহ্ম নিত্য ও বিশ্ব অনিত্য, তবুও নিত্য অদ্বিতীয়ের সাথে অনিত্য বহুর বা বৈচিত্র্যের চিরমিলন মিথুনাত্মক শিব-শক্তির মতন চিরদিন সম্ভব। হ্যাল্‌ডেনের ব্রহ্মেও হেগেলের মতন সৎ ও চিৎ (knowing and being) দুইই আছে, তবে তাদাত্ম্যভাবে; এজন্যে মন ও প্রাণ (thought and knowledge) এই দ্বৈতপ্রকাশের তিনি অতীত হোতে পারেন না এবং পারেন না বোলেই মায়ার তিনি অধীন, মায়ানির্মুক্ত নন। ক্রোচে ব্রহ্মকে বলেছেন মন (Mind), কেননা মনই রচনা

১১২। ম্যাক্‌টাগার্ট: 'ফিলজফিক্যাল ষ্টাডিজ্‌', পৃঃ ২১৬-২১৭

১১৩। হোয়াইটহেড: 'রিলিজিয়ন্ ইন্ মেকিঙ্', পৃঃ ১৪১

করে বিশ্বের ইতিহাস। এই মনরূপী ব্রহ্মের প্রকাশ হয় জড় ও চৈতন্তে (*knowing* and *acting*) ইচ্ছা ও জ্ঞানের (will and knowledge) আকারে। ইচ্ছা ও জ্ঞান দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মতন একেবারে আলাদা নয়, একে অপরের সাথে যোগসূত্র রচনা কোরে সত্য ও প্রাণের বৃত্তকে রচনা করে।[১১৪] এই অখণ্ড বৃত্তই ক্রোচের ব্রহ্ম—যিনি জীব-জগৎ ও তাদের অনন্ত বিকাশসকলকে নিয়ে পরিপূর্ণ। জেনটাইলের ব্রহ্ম শুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি (Pure Act), মনেরই যা অভিন্ন রূপ। জেনটাইল মনের বিকাশ-বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে পাতিয়েছেন মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কাজেই অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে জেনটাইলের ব্রহ্ম নিজেকে রেখেছেন মায়ার সাথে জড়িত কোরে। স্বামী অভেদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন এক ও বহুর মায়া থেকে চিরমুক্ত কোরে; এক ও বহুর প্রশ্ন অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের নির্বিরোধ অনুভূতির প্রোজ্জ্বল আলোকে বরং ম্লান ও স্তব্ধ।

ব্রহ্মের অনুভূতি যাঁরা জীবনকালেই করেন তাঁদের বলে জীবন্মুক্ত তা আগেই আমরা আলোচনা করেছি। এই জীবন্মুক্তি পার্থিব শরীর থাকা-কালেই হয়। মুক্তি ও আত্মানুভূতি একই কথা। তবে অনুভূতির ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। যে অনুভূতির রূপ অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিতে বিকশিত হয়, তা সম্পূর্ণ যোগভূমির অনুভূতি থেকে ভিন্ন, যদিও চরম-অনুভূতি সকলেরই সমান। সাধারণত জ্ঞানভূমি বলতে আমরা 'সমাধি' বুঝি, অর্থাৎ একমাত্র সমাধিতে চরম-অনুভূতি লাভ করা যায় এটাই আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সমাধির স্বরূপ ও অর্থ যোগশাস্ত্রের নিজস্ব। পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনে সমাধির ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয় দিয়েছেন। তবে প্রধানত সবিকল্প, নির্বিকল্প অথবা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রধান। সমাধি অবস্থা-লাভ করার উপায় যোগ-অভ্যাস করা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ কোরে দ্রষ্টা বা আত্মার নিরাবরণ স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্তে যোগসাধন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের সাধন এ'থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কোন প্রশ্ন নেই; চিত্তকে ব্রহ্মভাবে রূপান্তরিত তথা স্বপ্রতিষ্ঠিত করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য। বেদান্তে একমাত্র শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের উপযোগীতাই দেখানো হয়েছে। বাচস্পতিমিশ্র শ্রবণ ও মননের পর নিদিধ্যাসনের সার্থকতা দেখিয়েছেন, কিন্তু বিবরণ-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার্য শ্রবণ বা তত্ত্ববিচারকে প্রধান বোলে উল্লেখ করেছেন. মনন ও নিদিধ্যাসনকে বলেছেন শ্রবণ বা বিচারের অঙ্গ বা সহকারী। প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের নিদিধ্যাসন ও যোগের সমাধি এক পর্যায়-ভুক্ত নয়, কেননা বেদান্তের নিদিধ্যাসনে চিত্তনিরোধের

১১৪। "In short, knowledge and will, theory and practice are not two parallels, but two lines such that the head of the one is joined to the tail of the other. * * They constitute therefore the circle of reality and of life * *". —(ক) ক্রোচে: 'ফিলজফি অব দি প্র্যাক্টিক্যাল', ২য় ভাগ, ৩; (খ) ডাঃ দাশগুপ্ত: 'ফিলজফিক্যাল্ এসেজ' (১৯৪১), পৃঃ ১৪৩-১৪৭

কোন চেষ্টা ও সার্থকতা নেই, তত্ত্বনির্ধারণ ও আত্মানুভূতি মাত্র লক্ষ্য, কিন্তু যোগের সমাধিতে চিত্তদমন ও নিরোধের পূর্ণপ্রচেষ্টা আছে, যদিও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভই তার উদ্দেশ্য। ডাঃ শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্মও এই পার্থক্যের উল্লেখ কোরে বলেছেন :

"There is thus a great deal difference between the Intution of Patanjali and Vedântic Intuition. The former begins to appear at a certain definite stage of *samâdhi*, while the latter has no begining at all. The former depends on a perticular change that the mind (*citta*) undrgoes, although this change consists of the relatively unchanging and fixed state of the mind (*citta*), but the latter is entirely unconditional (*svayamprakâsa*)."[১১৫]

স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত ও যোগদর্শনের মধ্যে ঠিক এই ধরণের পার্থক্যের কথা উল্লেখ না করলেও পতঞ্জলির চিত্তনিরোধকে ঠিক ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি দেখা যায়। তিনি চিত্তশুদ্ধি-রূপ ব্রহ্মপরিণতি তথা 'ব্রহ্মে রূপান্তর'-ই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন : "বাসনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিবর্তে অনেকে বলেন বাসনার কণ্ঠরোধ করতে। কিন্তু বাসনার কণ্ঠরোধ করতে বা তাঁকে মেরে ফেলতে তোমরা পার না। অবশ্য এক ধরণের ধর্মমত শিক্ষা দেয় : 'তোমাদের সমস্ত বাসনাকে ধ্বংস করার পর মনকে একেবারে শূন্য কোরে ফেলো'; কিন্তু আমরা তা করতে পারি না, বরং বাসনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আমরা তাকে বিবেক ও বিচারের সাহায্যে রূপান্তরিত করতে পারি। ঠিক এই রকম রূপ-বিবর্তনের ভেতর দিয়েই চিত্ত বা মনকে আমরা পরিশুদ্ধ করতে পারি।[১১৬] স্বামী অভেদানন্দ 'বাসনার কণ্ঠরোধ করা যায় না' বলতে পতঞ্জলির 'নিরোধ'-প্রণালীকে নিষেধ কোরে বিচারের দ্বারা রূপান্তর-নীতিই সমর্থন করেছেন। এই 'রূপান্তর' বলতে মন বা চিত্তকে তিনি 'ব্রহ্মাকার বা ব্রহ্মভাবাপন্ন করা' বলেছেন; অর্থাৎ মন বা চিত্তের পৃথক সত্তারূপ ভুল ধারণাকে সংশোধন ('correction of error') কোরে অভিন্ন ব্রহ্মসত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত হবার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : "The *ripus* cannot be conquered by *damana*, * *. It is only by purification through the Divine consciousness entering into the egoistic nature and changing it that this thing can be done."[১১৭] সুতরাং স্বামী অভেদানন্দের মতন শ্রীঅরবিন্দও পতঞ্জলির নিরোধ-সমাধি স্বীকার করেন নি, তিনিও চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তকে শুদ্ধজ্ঞানে রূপান্তরের কথা বলেছেন।

১১৫। ডাঃ ব্রহ্ম : 'ফিলজফি অব হিন্দুসাধনা', (১৯৩২), পৃঃ ১৬৬

১১৬। "Instead of indulging in desires, some say, you should kill them out. But you cannot kill them out, There are certain cults that teach : 'Kill out all the desires and make your mind blank'. We cannot do that. We can *reduce* the number of desires by discrimination and not allowing indulgence. In that way we can purify our heart or mind."—'ডক্‌ট্রিন অব কর্ম', পৃঃ ১৩৭

১১৭। "শ্রীঅরবিন্দ-মন্দির-এ্যানুয়েল্" (১৯৪৫), পৃঃ ৯

মোটকথা বেদান্তের ও যোগের তত্ত্বরহস্যের মধ্যেও অনেক অমিল আছে। যোগে জীবন্মুক্তের ব্যুত্থানের উল্লেখ আছে, কিন্তু বেদান্তে সে সবের কোন বালাই নেই। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : "সত্য বল্‌তে কি ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ওঠাও নেই, নামাও নেই, জ্ঞানী পরিপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে মায়িক সংসারে বাস করলেও সর্বদা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাসক্তই থাকেন।"[১১৮] প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর একবার হয়, তিনি আর কখনও সেই জ্ঞান হারান না, কেননা ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে মায়িক জগতের তথা মায়ার কোন বিরোধভাব নেই। বেদান্তেও তাই স্বীকার করা হয়েছে যে, তুরীয় চৈতন্যের সাথে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট—এই তিনের কোন বিরোধ নেই, বিরোধ কেবল এই তিনটির পরস্পরের মধ্যে। ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম তাঁর 'বেদান্তের সর্বাতিশায়িত্ব' (Vedantic Transcendence) প্রবন্ধে এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেও জাগতিক বস্তুর সহিত অনায়াসেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যোগী পুরুষের ব্যুত্থান ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ হয়, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কিন্তু কোনরূপ ব্যুত্থান নাই, অর্থাৎ তাঁহার অনুভূতির কখনও বিপর্যয় বা বিরতি ঘটে না। জীবন্মুক্তের জ্ঞান কুত্রাপি বাধিত বা ব্যাহত হয় না, অর্থাৎ জাগতিক বিষয়বস্তুর জ্ঞান কুত্রাপি ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক হইয়া উঠে না, এবং এইজন্যই এ' মিথ্যা জগতের প্রত্যক্ষের সহিত পরম ব্রহ্মজ্ঞানের কোনও প্রকার বিরোধ সম্পর্ক নাই। যে পর্যন্ত না এই 'পারমার্থিক সৎ'-এর (স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের) জ্ঞানোদয় হয়, সে পর্যন্ত এই জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়; জগতের এই 'মিথ্যাত্ব'-বোধের সহিত ব্রহ্মের পরমার্থসত্তার কেবল যে কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই তাহাই নহে কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাই জগদ্-ব্রহ্ম সম্বন্ধের একমাত্র সঙ্গত ধারণা। যাঁহারা মনে করেন বেদান্তমতে জগতের ব্যবহারিক সত্তার (empirical reality) কোন স্থান নাই এবং এই জগতে ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীদের কোনও ব্যবহার চলিতে পারে না, তাঁহারা স্পষ্টতঃ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা ভুলিয়া যান এবং সত্য সত্যই বেদান্তের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারেন না। আমরা যে ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা গ্রহণ না করিলে বেদান্তের 'বাধ-সমাধি' এবং পতঞ্জলির 'লয়-সমাধি' এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বা ভেদ আছে তাহার আর কোন অর্থই থাকে না। পারমার্থিক জগতে স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যবহারিক জগতে পারতন্ত্র্যের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। 'পারমার্থিক সৎ' ব্রহ্ম যে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজাত বিষয়বস্তুর বিরোধী না হইয়া বরং উহাদের আশ্রয় ও মূল ভিত্তিস্বরূপ এবং সকল সম্বন্ধাতীত অর্থাৎ দ্বৈতাতীত ব্রহ্মের যে কাহারও সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না বেদান্তে এই সকল কথার অতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধ্যানের অবস্থায় একটি বিষয়বস্তু অপর একটি বিষয়বস্তুকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে সম্বিদের (জ্ঞানের) ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় এরূপ ঘটে না, তখন সম্বিদের সকল স্তরেই এককালে কার্য হইতে থাকে। সুরেশ্বরাচার্য তাঁহার বার্তিকগ্রন্থে ধ্যাতা ও তত্ত্ববিদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য বলিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।"[১১৯]

১১৮। "And truely speaking, there is no longer any *going beyond* the Absolute, or *going down* or *coming back (vyutthâna)* from the Absolute by one who has realized it : *Na sa punarâvartate,*"—'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৯৬

১১৯। (ক) 'দর্শন' পত্রিকা (ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংপাদিত), ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৯, শ্রাবণ, পৃঃ ১২১—১২২

সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের 'বাধ-সমাধি' ও যোগশাস্ত্রের 'লয়-সমাধি' স্বরূপতঃ যে ভিন্ন এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীঅরবিন্দও এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন, কেননা তিনিও স্বীকার করেন: "By *mukti* I do not mean *laya*, which is a thing not to be pursued or desired * * but liberation from ignorance, ahankâra and dualities."[১২০] আচার্য শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।১।৩) সাংখ্য ও যোগ-মতাবলম্বীদের দ্বৈতবাদী বোলে সমালোচনা করেছেন—"দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ", আর এ' থেকে বোঝা যায় যে, আচার্য শংকর যোগিদের লয়সমাধিলব্ধ মুক্তিকে যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ বোলে স্বীকার করেন নি। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণেও বশিষ্টদেব যোগ ও জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বোলে উল্লেখ করেছেন।[১২১] নারায়েন্দ্র সরস্বতী পঞ্চীকরণ-বার্তিকের ওপর তাঁর বার্তিকাভরণভাষ্যে যোগের সমাধি তথা চিত্তবৃত্তিনিরোধকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন: "চিত্তস্যসমাধানং ব্রহ্মাত্মাভেদকারতয়া অবস্থানম্', অথ্ণ্ডব্রহ্মাকার-বৃত্তিরূপেণ পরিণামঃ, ন তু শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ইত্যর্থঃ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ।" আচার্য শংকর "তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি' বোলে যোগদর্শনপ্রতিপাদ্য নিরোধ-মুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। বেদান্তবাক্য বলতে তাঁর মতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা অভেদ আত্মোপলব্ধি। এই অভেদ উপলব্ধির নাম তত্ত্বজ্ঞান, চিত্তবৃত্তির নিরোধ নয়।

মোটকথা অদ্বৈত বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম উপলব্ধির সমান, এতে উপলব্ধা ও উপলব্ধব্য—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের কোন ভেদ নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আছে—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং ইতরং পশ্যতি * *; যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ, তৎকেন কং জিঘ্রেৎ * * তৎকেন কং বিজানীয়াৎ? * * বিজ্ঞাতারমরে

(খ) অবশ্য স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঠিক ব্যখানের মতন অবস্থার কথা আমরা শুনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'সহস্রারে মন থাকলে নীচের আর কোন খবর পাওয়া যায় না। তাই আজ্ঞাচক্রে মনকে 'নামিয়ে' রাখি।' নির্বিকল্প সমাধিতে কি রকম অনুভূতি হয় ভক্তেরা জানবার জন্যে একবার অনুরোধ করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন: চেষ্টা কোরে দেখ্‌ব সব বলতে। তারপর আজ্ঞাচক্রে মনকে 'নামিয়ে' তিনি সমাধির অনুভূতির কথা বল্‌বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মন সহস্রারে উঠে গেল, আর কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না, সব চুপ। এ রকম কয়েকবার চেষ্টা করার পর তিনি বলেন: 'আমি পারলুম না।' আমাদের মনে হয় যোগভূমির অনুভূতিকে লক্ষ্য কোরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ সব কথা বলেছেন, কেননা নানা বিষয়ের বিচিত্র অনুভূতিই তাঁর অলৌকিক জীবনে হয়েছে। তিনি ছিলেন সকল ধর্মের সাধক, কাজেই বিভিন্ন অনুভূতি ও ভাবের বিকাশ তাঁর জীবনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তবে শুদ্ধজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই 'নামা' বা 'ওঠা'-র কোন প্রশ্ন তিনি তুলেন নি।

১২০। শ্রীঅরবিন্দ: 'যৌগিক সাধনা', পৃঃ ৫৬

১২১। 'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্‌॥'

কেন বিজানীয়াৎ * *।"[১২২] দুটি ব্যক্তি থাক্‌লেই একজন আর একজনকে জানবে, কিন্তু যেখানে একমাত্র আত্মস্বরূপ-রূপ জ্ঞান বা বিজ্ঞান থাকে সেখানে জানাজানির কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "*Oneness* is the relation of the true seeker after the Absolute with the Absolute. There is nothing beyond that."[১২৩] তিনি অভেদ উপলব্ধির একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন পারস্যদেশীয় একজন মরমী কবির উদাহরণ দেখিয়ে। তিনি লিখেছেন, যীশুখৃষ্ট যে বলেছেন: 'Knock, and it shall be opened to you'; এই 'knock' বা আঘাৎ করার অর্থ বাইরের জগতের কোন দরজায় আঘাৎ করা নয়, এই আঘাৎ দিতে হবে একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠাজড়িত ভাব নিয়ে হৃদয়ের অন্তরতম দেশে, তবেই 'গহ্বরেষ্ঠং বরিষ্ঠং' ব্রহ্মচৈতন্যকে নিজের স্বরূপ বোলে উপলব্ধি হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন:

"It is not a physical knocking but the soul must knock at the door that leads its entrance into the abode of the supreme Spirit. A Persian mystic poet beautifully described this spiritual knock at the supreme spirit: "There came one and knocked at the door of the Beloved and a voice answered and said, 'Who is there' ? The lover replied: 'It is I', 'Go hence' returned the voice 'there is no room within for thee and me' The lover went away disappointed and after spending sometime in penance and austerity returened again and knocked for a second time. Again the voice asked 'Who is there ?' The lover answered 'It is I'. 'Go hence, there is no room within for thee and me,' was the reply. This time the lover was mortified in his heart, he went into wilderness, wept bitterly and spent a long time in constant prayer with humble spirit and unselfish devotion. When his egotism was completely vanquished, he repeated the knock for the third time and again the voice demanded : 'Who is there' ? The lover answered : 'It is thou'. 'Come in', said the voice, 'for I am within'."[১২৪]

সুফী-সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুফীরা ইস্‌লামধর্মের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মধ্যযুগীয় ক্রিষ্টান মরমীদের মতন তাঁরা সাধনভজন করতেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: যীশুখৃষ্টের প্রায় ৮২০ বছর পরে সুফীধর্মের উৎপত্তি হয় এবং সুফীধর্মের ওপর ভারতবর্ষীয় বেদান্তদর্শনের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুফীধর্মে গ্রীসিয় প্রভাব দেখ্‌তে পান। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ তা অস্বীকার করেছেন। যেহেতু এ্যানাক্সাগোরাস থেকে আরম্ভ কোরে ষ্টোয়িকরা, সক্রেটিশ, প্লেটো, এ্যারিষ্টোটেল্, প্লটিনাস,

১২২। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৫।১৫

১২৩। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেশান টু দি এ্যাবসোলিউট,' পৃঃ ১৯৫

১২৪। অভেদানন্দ: এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন' (১৯৪৭), পৃঃ ১৮৪-১৮৫

অধ্যাপক আর. এ. নিকোলসন রুমী প্রণীত 'মসনবী' থেকে সংগ্রহ কোরে যে 'টেল্‌স্ অব মিষ্টিক মিনিঙ' বই লিখেছেন তাতেও (পৃঃ ১৩৫) পারস্যভাষা থেকে এইটি অনুবাদ কোরে দিয়েছেন।

প্রোক্লাস, প্রভৃতির মতন আরবীয় সুফীরাও দ্বৈতবাদী ছিলেন, সেজন্যে সুফীদের ওপর গ্রীক দার্শনিকদের প্রভাব পড়েছিল এই যুক্তি ও সিদ্ধান্তের কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না।[১২৫] স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন:

"Although these Sufis beleived that a human being could approach God, yet they did not accept the idea that a human soul could be one with Him. They were dualists; they believed that the individual soul could be god-like and a temporary union between the soul and God could be accomplished only through love. They did not believe in any other mediator, they even rejected Mohammed as the only prophet of God. The writings of the Sufis are full of Oriental metaphors which seem horrible to many of the practical matter-of-fact, Western minds."[১২৬]

ভারতবর্ষীয় দৃষ্টিতে সুফীধর্মকে অদ্বৈতবেদান্ত ও বৈষ্ণবধর্মের মিলিত রূপ বলা যায়; কেননা সুফীরা ভারতবর্ষের বাউল-সম্প্রদায়ের মতন নাচ ও ভজনগান করেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতন সুফীরা প্রেম-ভক্তির মুক্তধারাকে অক্ষুন্ন রাখেন ও আবার অদ্বৈতবেদান্তের মতন প্রেমাস্পদ ভগবানকে এক ও অদ্বৈত বলেন। সুফীধর্মে ভগবান কখনো ভক্তের অস্তিত্বকে লোপ করেন না; তবে ভক্তকে অতি আপনার জন হিসাবে তিনি গণ্য করেন। ভক্ত ও ভগবানের ভিতর নিকট-সম্বন্ধ ও অভিন্নতার ভাব থাকলেও ভক্ত এবং ভগবান চিরদিন আলাদা থাকেন, এজন্যে সুফীরা অদ্বৈতবাদীর ছদ্মবেশে দ্বৈতবাদী হিসাবেই গণ্য।

কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের ধর্মে ও সাধানায় দ্বৈতের লেশমাত্র থাকে না। অদ্বৈতবেদান্তের মতে সংকীর্ণ 'আমি'-র অভিমান যখন নিরভিমান 'তুমি'-র কাছে আত্মদান করে, অথবা 'তুমি' ও 'আমি'-র ভিন্নতা যখন অখণ্ড একরস অনুভূতির সাগরে লীন হয় তখনি ঠিক ঠিক মুক্তিলাভ হয়। এই মুক্তি বা চরম অনুভূতি উৎপাদ্য, সাধ্য অথবা কোন সাধনার ফলস্বরূপ নয়। এই উপলব্ধি-রূপ ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, অজ্ঞান বা মায়া-আবরণ সরিয়ে দিলে শুদ্ধচৈতন্য নিজেই অভিব্যক্ত হন। অজ্ঞান দূর করার জন্যেই সাধনা। অজ্ঞান স্বার্থপরতার আকারে আমাদের দিব্যস্বরূপকে জানতে দেয় না, বরং তা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। তাই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন:

"It is the ignorance that makes us selfish, that makes us understand that

১২৫। এডোয়ার্ড জাব্রা জুরী 'ইলুমিনেশন ইন্ ইস্লামিক মিস্টিসিজ্‌ম্' বইয়ে (পৃ: ২-৩) লিখেছেন: "Aside from these external elements, Greek influence is noticeable in the Sufi doctrine which insists that the true knowledge of God is attained by ecstasy (*wajd*). Hellenistic forces during the period of translation from Greek gave rise to Sufi theosophy whose exponent was Dhu-al-Nūn-al-Misri. Contacts with Indo-Iranian culutre made this theosophy pantheistic. The Buddhistic view of life is in certain places unmistakably apparent. The *Zindiq* monks described by al-Jāhiz were either Indian Sadhus or Buddhist monks, if not their imitators".

১২৬। অভেদানন্দ: 'ডিভাইন্ কমিউনিয়ন', পৃ: ৭

we are separate from each other ; but the light of knowledge will dispel that darkness of ignorance. A room that has held darkness for thousands of years, a cave where darkness has been for thousands of years is instantly illumined by the stroke of a match-stick— the darkness of thousand of years is dispelled. So, says the Vedanta, you strike a match in the cave of your heart, and there you will have the light. You will then understand things as they are in reality."[১২৭]

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটিমাত্র দেয়াশালাই কাঠির আলোয় উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে। এই দেয়াশালাই কাটি জ্বালার নাম সাধনা। সাধনার উপকারিতা অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করা, নচেৎ স্বয়ংজ্যোতি অনুভূতির স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য তো সকল সময়েই প্রকাশমান। এই প্রকাশমানতা সম্বন্ধে জ্ঞান বা উপলব্ধির নাম মুক্তি। মুক্ত আমরা সর্বদাই আছি, বন্ধনকে সত্যজ্ঞান করি বোলেই তাকে আমরা 'আছে' বলি। এই 'আছে'-র স্বরূপত কোন সত্তা নেই, এর স্থায়িত্ব আমাদের ভ্রমধারণা অথবা কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ভ্রমধারণা বা কল্পনাকে যথার্থজ্ঞানের আলোকে সরিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌তে পারি যে, মুক্তি আমাদের স্বভাবগত, মুক্তি আমাদের সত্যিকারের রূপ!

১২৭। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাব্‌সোলিউট' (১৯৪৬), পৃঃ ১৯২

—সপ্তম আলোচনা—

মনোবিজ্ঞান ও আত্মা

যে শাস্ত্র মনের সকল রকম রহস্যের কথা আমাদের জানিয়ে দেয়; মনের কত রকম বৃত্তি ও বিভূতি, তার প্রকৃতি ও সাথে সাথে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কে—এসব তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করে তার নাম মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান শুধু মনোবৃত্তির বিজ্ঞানই নয়, মনের যথার্থ স্বরূপ কি, আত্মচৈতন্যই মনের পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে—এসবের বিশেষ তথ্যও আমাদের জানিয়ে দেয়। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, পাশ্চাত্যে মনোবিজ্ঞানে মন ও তার বৃত্তিকেই কেবল সুস্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে, মনের পারে যে অচঞ্চল মহিমময় আত্মার অস্তিত্ব আছে, আত্মাই যে মানুষের প্রকৃতি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও বিচিত্র ধারণার সৃষ্টি করে, মনের আসল রূপই যে আত্মচৈতন্য—এসব রহস্যের সন্ধান সে দিতে পারে না। জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা কোরে বলেছেন: "পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে, কেননা মনের পারে সে এখনো যেতে পারে নি" ("The study of psychology is vain, for there is no Psyche")

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের আলোচনা নানান দেশে বিচিত্রভাবে হয়েছে। ভারতবর্ষে মনীষী পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনে মনস্তত্ত্বের আলোচনা করেছেন, কিন্তু মনকে তিনি বলেছেন বৈচিত্র্য ও প্রবৃত্তি, তাই প্রথমেই আরম্ভ করেছেন তাঁর মনোবিজ্ঞানের আলোচনা এই বোলে: "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", চিত্ত তথা মন ও তার বিকাশ-রূপ অসংখ্য বৃত্তি সংসারের কারণ। মন ও তার বৃত্তির আরাধনায় মানুষ কখনই শাশ্বত শান্তি লাভ করতে পারে না, মনের পারে তাকে যেতেই হবে, আর এ' যাবার একমাত্র উপায় হোল মনকে নিরোধ করা, যাকে অপর কথায় বলা যায় 'যোগ'। মনকে নিরুদ্ধ করার অর্থই মনের বৃত্তিগুলিকে দূর করা; সুতরাং মনকে নিরুদ্ধ করতে গেলে মানুষকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আশ্রয় নিতে হবে। বার বার যত্ন বা চেষ্টা করার নাম অভ্যাস, আর বিষয়-বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। মনের স্বভাব বিষয়কে গ্রহণ করা। বিষয়কে গ্রহণ করতে যাওয়ার নাম মনের বিষয়াকারে রূপায়িত হওয়া। কঠোপনিষদে আছে: "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ, পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্",—ইন্দ্রিয়গুলি ভোগের বিষয়ের দিকে ক্রমাগত ছুটে চলেছে, অন্তরাত্মাতে নিবিষ্ট হোতে চায় না, একমাত্র ধীর ব্যক্তিই বিষয় থেকে মনকে তুলে নিয়ে আত্মনিষ্ঠ হন। ধীর অর্থাৎ যিনি মনের প্রকৃতিকে জেনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ও জয়ী হয়েছেন। কোন জিনিষকে প্রতিরোধ করার মনোবৃত্তি হৃদয়ে জাগলে বুঝতে হবে সেই জিনিসের ওপর বিতৃষ্ণার ভাব এসেছে। আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা ব্যতীত আর সমস্ত জাগতিক জিনিসের

ওপর বিতৃষ্ণ ভাবের নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়, কেননা বৈরাগ্যই আমাদের সকল আসক্তির পারে নিয়ে যেতে পারে। মনীষী পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শন-রূপ ভারতীয় মনোবিজ্ঞানে মনের পরিচয় সুপরিস্ফুটভাবে দিলেও মনোনিরোধ-রূপ আত্মস্থিতির কথাই প্রধানভাবে বলেছেন। স্বামী অভেদানন্দ তাই তাঁর 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (*India and Her People*) বইয়ে উল্লেখ করেছেন: "পাতঞ্জলদর্শনের মতন এত পূর্ণাঙ্গ মনস্তত্ত্বীয় মনোবিজ্ঞান পৃথিবীর কোনখানেও আর নাই। সত্যি বলতে কি, ইউরোপের বর্তমান মনোবিজ্ঞানকে ঠিক ঠিক মনস্তত্ত্বদর্শন বলা যায় না, কারণ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মনের অতীত আত্মচৈতন্যের কোন স্থান নেই।"[১] সত্যিকারের মনোবিজ্ঞান (True Psychology) সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "যথার্থ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শরীর, মন ও আত্মা—এই তিনটি। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানে মনের কথা নিয়ে আলোচনা করলেও সেই মনকে পার্থিব শরীরের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। যথার্থ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জড়শরীর আত্মার বাসস্থান মাত্র। শরীর আত্মারই ইচ্ছার ইঙ্গিতে সৃষ্ট। আত্মা বুদ্ধি ও বোধির উৎসবিশেষ।"[২] পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকেরা যুক্তি ও বিচারপ্রণালী দিয়ে মনকে তন্ন তন্ন কোরে বিশ্লেষণ করেছেন, মনকে শক্তিকেন্দ্রের এবং ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির আধার বলেছেন, কিন্তু মনের পিছনে থেকে যিনি শক্তি ও চৈতন্যের আধার-রূপে মনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন সেই আত্মজ্যোতির কোন সন্ধান তাঁরা দিতে পারেন না। এজন্যে এখনো পর্যন্ত তাঁরা জড়োপাসকের কোঠা অতিক্রম করতে পারেন নি। ভারতবর্ষ অধ্যাত্মসাধনার জন্মভূমি। আত্মবিমুখী মনোভাব ও দর্শনের সৃষ্টি ভারতবর্ষের মাটিতে হোলেও তাদের দৃষ্টি ছিল আত্মারই ওপর, কেননা সকল-কিছু অনাত্ম জড়ের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা আত্মচৈতন্যের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

ভারতবর্ষের মতন পৃথিবীর সকল দেশে প্রাচীনকাল থেকে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন হোয়ে আসছে। এছাড়া ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে যেভাবে আত্মার মহীমময় মর্যাদা দান করা হয়েছে সেভাবে না হোলেও চেতনধর্মী আত্মপদার্থের সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোন দার্শনিক মনের অতীত চেতন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। মনোবিজ্ঞানের আলোচনা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে হয়েছে তার মোটামুটি পরিচয় দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ডাঃ এ্যাভেলিঙ্ সমগ্র কালটিকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন (১) গ্রীসিয় অনুশীলনের কাল। এই সময়ে দেহ ও মন এ'দুটির দ্বন্দ্বরূপই দর্শন-জগৎকে অধিকার কোরে বসেছিল। দেহ ও মনের পারে আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার তখন

১। "There is no system of psychological psychology in the world so complete as the psychology of Patanjali. The modern psychology of Europe, strictly speaking is not true psychology, because it does not admit the existence of *phyche*, the soul".—*India and Her People*, p. 29.

২। অভেদানন্দ: "আওয়ার রিলেসান্ টু দি এ্যাব্‌সোলিউট্" (১৯৪৬), পৃ: ৬

প্রয়োজন ছিল না। একেবারে বৈদিক যুগের গোড়াকার দিকে ভারতবর্ষেও দেহ-মনের প্রাজত্বই অক্ষুন্ন ছিল। (২) মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার যুগ। এই যুগে মনের প্রাধান্ত ছিল অব্যাহত এবং মন ও তার শক্তিকে বলা হোত মানুষের অধ্যাত্ম সম্পদের উৎস। অবশ্য ভারতবর্ষে মধ্যযুগে হয়েছিল তার বিপরীত ভাব; মনের প্রভাব ছিল তখন অক্ষুন্ন, কিন্তু মনের ওপরে আত্মার সিংহাসন হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। (৩) পরবর্তী যুগ। এই যুগে দার্শনিক ডেকার্টে দেহ থেকে মনকে করেছিলেন বিচ্ছিন্ন ও দেহের প্রচ্ছন্ন রূপে আত্মার প্রকাশ ছিল সকল-কিছুর নিয়ন্তার আকারে। ভারতবর্ষে এই যুগে বিচিত্র চিন্তাধারার বিকাশ থাক্‌লেও আত্মার মহিমময় রূপেরই ছিল আদর। (৪) সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য উভয় দেশেই বিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের হয়েছে মিতালী।

গ্রীদিয় চিন্তাধারার গোড়াকার দিকে দেহ ও মনের অনুশীলন দার্শনিক জগৎকে অধিকার কোরে ছিল তা আগেই বলেছি। কিন্তু তাহোলেও তথনকার সমাজ দেহ-মনের অতীত একটি সত্তার জ্ঞানলাভ সম্বন্ধেও কথনো কথনো অনুশীলন করতেন। তবে সে সত্তা ছিল তাঁদের কাছে বেশীর ভাগ সময়ে ধোঁয়াটে ও রহস্যপূর্ণ, যেমন ইমানুয়েল কাণ্ট জগৎকারণকে বলেছেন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। গ্রীক্ দার্শনিকদের অনেকে দেহ-মনের ওপরে আত্মবস্তুর সন্ধান পেয়ে আত্মাকে তুলনা করেছেন আগুনের সাথে ('atoms of fire')। এই আগুণ শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীরই ছিল ইচ্ছা ও কর্মশক্তির কারণ-স্বরূপ; মানুষের ভিতরে হয়েছিল তা মহীয়ান অংশ-রূপে গণ্য। অনেকে আত্মাকে আকাশ-রূপে কল্পনা করেছিলেন, আকাশ তাঁদের কাছে ছিল বিশ্বসৃষ্টির কারণ হিসাবে গণ্য। মনীষী সক্রেটিশ প্রমাণ করলেন, বাইরের জগতের সকল বিকাশই মানুষের মনের অভিব্যক্তি মাত্র; পার্থিব সকল-কিছুই পরিবর্তনশীল, অপরিবর্তনীয় একমাত্র আত্মচৈতন্য। সক্রেটিশের শিষ্য প্লেটো আত্মার স্বরূপকে আরো মহিমান্বিত করেছিলেন। প্লেটো আত্মাকে বলেছেন শাশ্বত ও স্বাধীন। কঠোপনিষদের মতন তিনিও আত্মাকে বলেছেন দেহরথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। এ থেকে মনে হয়, প্লেটোর সময়ে সমগ্র গ্রীসে ভারতের ঔপনিষদিক ভাবের যথেষ্ট অনুশীলন হয়েছিল। প্লেটো আত্মার আবরণকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন: যুক্তি, কর্ম বা সামর্থ্য ও বাসনা (the rational, the courageous and the appetitive or desire) এবং এদের স্থান নির্দেশ করলেন মস্তকে, হৃদয়ে ও উদরে। প্লেটো আত্মার সৃষ্টি স্বীকার করেছেন; করুণাময় ভগবানই আত্মাকে রচনা করেছেন, কিন্তু সৃষ্ট বস্তু হোলেও আত্মা শাশ্বত ও স্বাধীন ইচ্ছাবিলাসী। আত্মার জন্ম আছে বোলে মৃত্যুও আছে, জন্ম-মৃত্যু-রূপ চক্রের ভিতর দিয়ে আত্মা ক্রমশঃ উন্নত ও দিব্যশরীর ধারণ কোরে যুক্তি ও বিবেকের আলোকে সকল বাসনার পারে যান ও পরিশেষে নির্বাণ লাভ করেন। এখানে প্লেটো ঔপনিষদিক চিন্তাধারা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন; কেননা সকল পরিবর্তনের মধ্যেও আত্মাকে তিনি অপরিবর্তনশীল বলেছেন, আবার জন্ম-মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের অধীন হিসাবে আত্মার উত্তরোত্তর রূপ-বিবর্তনের কথাও স্বীকার করেছেন—যা নিতান্ত অসঙ্গত। কোন জিনিসের জন্ম বা উৎপত্তি থাকলে তার মৃত্যু বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আত্মার জন্ম আছে, রূপায়ণ আছে অথচ আত্মা স্বাধীন ও

শাশ্বত—এ' তত্ত্ব গ্রহণ করা প্লেটোর মতন জ্ঞানীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়নি। কাজেই প্লেটোর বিচারপ্রণালী দেখ্‌লে একথাই মেনে নিতে হয় যে, আত্মাকে তিনি দেহী জীবাত্মার পর্যায়েই ফেলেছেন, সকল বিকারের অতীত আত্মচৈতন্যের কোটায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তাছাড়া প্লেটোর বিশ্বাস ও যুক্তিধারা দেখে মনে হয়, তাঁর আচার্য সক্রোটিশও আত্মাকে ঔপনিষদিক আত্মসত্তার মর্যাদা দিতে পারেন নি।

প্লেটোর পরে দার্শনিক অ্যারিষ্টোটেল আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেন। তাঁর মনোবিজ্ঞানও আত্মাকে বিসর্জন দেয় নি, যদিও সেই আত্মা দেহ ও মনযুক্ত জীবাত্মার পর্যায়ভুক্ত। তবে অ্যারিষ্টোটেল দেহ থেকে মনকে আলাদা কর্‌তে ভুলেন নি, কিন্তু আলাদা কর্‌লেও দুটির সমবায়েই আবার আত্মার শরীর ও ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। আত্মার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: আত্মা মন বা পার্থিব কোন জ্ঞান-বিশেষ নয়, পরন্তু একে মানুষের মধ্যে অখণ্ড জীবনীশক্তি বলা যায়। প্লেটোর মতন তিনি আত্মাকে স্বাধীন ও স্বয়ং-সঞ্চরণশীল বলেছেন, কিন্তু আত্মার কোন বাহ্য-আন্তর ভাগ করেন নি। তিনি আত্মার শক্তিবিকাশের তারতম্য স্বীকার করেছেন যাতে কোরে ভারতবর্ষীয় ঔপনিষদিক আদর্শের কাছে আত্মার গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেছেন।

সেণ্ট অগাষ্টাইনও তাঁর মনোবিজ্ঞানে শাশ্বত আত্মার স্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে আত্মা স্বচ্ছ অপার্থিব অধ্যাত্ম বস্তুসত্তা মাত্র। দার্শনিক প্লেটোর মতন তিনি আত্মার তিনটি অংশ-ভাগ কল্পনা করেছেন, যদিও সেই ভাগগুলি মনের,—মনেরি তিনটি শক্তিবিকাশ বুদ্ধি, ইচ্ছা ও বোধ-রূপে আত্মার অখণ্ড রূপকে গড়ে তুলেছে। এই আত্মা সকল-কিছু পার্থিব চিন্তা ও অনুভূতির উৎস-বিশেষ, সুতরাং অগাষ্টাইন বিকারহীন অচঞ্চল চৈতন্য-স্বরূপ আত্মসত্তার পক্ষপাতী নন, বরং আত্মা বল্‌তে দিব্যভাবসম্পন্ন জীবাত্মাকেই তিনি বুঝিয়েছেন।

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে টমাস এ্যাকুইন্স্‌-এর অবদানও বড় কম ছিল না। আগাষ্টাইনের মতন এ্যাকুইন্স্‌ আত্মার মানসিক শক্তিবিকাশের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু মানসিক বিকাশগুলির সাথে আত্মস্বরূপকে তিনি এক কোরে ফেলেন নি, তিনি বলেছেন, আত্মার মানসিক বিকাশ হোলেও বিকাশ থেকে আত্মা চিরদিন নির্মুক্ত। কিন্তু তাহোলেও প্লোটোর মতন তিনি আবার স্বীকার করেছেন যে, আত্মাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বোলে আত্মাও ঈশ্বরের মতন নিষ্পাপ, পবিত্র ও শাশ্বত। আত্মাকে ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থ বলায় প্লেটো, অ্যারিষ্টোটেল ও আগাষ্টাইনের মতন এ্যাকুইন্সের আত্মাও পরমাত্মার গৌরব ও মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অপার্থিবতার ছদ্মবেশে পার্থিব বন্ধন ও মলিনতাকেই বরং তিনি বরণ কোরে নিয়েছেন। এ্যাকুইন্সের পরে স্কোটাস তাঁর মনোবিজ্ঞানে অপার্থিব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

কেবলই আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে সকল দেশের মনোবিজ্ঞান সার্থক নয়। জীবজন্তু ও মানুষের মনের বিচিত্র রূপ ও বিকাশের হিসাব দেওয়াও সকল মনোবিজ্ঞানের কাজ। পাতঞ্জল-যোগদর্শনে মন ও তার শক্তিবিকাশের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে! তবে

পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন মন্থরই বলা যায়, কেননা মনীষী পতঞ্জলি ও বৌদ্ধ যোগব্যাখ্যাকারদের পরে ভারতবর্ষে নূতন কোরে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা এক রকম হয়নি বোল্লেই চলে। যোগবাশিষ্টরামায়ণে মনের স্বরূপের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাকে নিছক মনোবিজ্ঞানের কোটায় ফেলা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনো নূতন নূতন গবেষণা ও অবদানের নিদর্শন আছে।

পাশ্চাত্যে ডেকার্টের আগে ও গ্রীক দার্শনিকদের পরে অসংখ্য দার্শনিক জ্ঞান ও অনুভূতির অনুশীলন নিয়ে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগে পিট্রো পম্‌পোনজ্জি ও নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি থেকে আরম্ভ কোরে মাইকেল দে মন্‌টেন, পেরি ক্যারণ, লুথার, জেকব বামা, নিকোলাস কিউজেনাস, ব্রুণো, লিওনার্ডো দা ভিন্সি, বেকন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাগতিক জ্ঞান ও অনুভূতি সম্বন্ধে বিচিত্রভাবে আলোচনা করেছেন। আত্মার প্রসঙ্গও তাঁদের লেখায় বাদ পড়েনি। কিন্তু এই সব কোন দার্শনিকই অতীন্দ্রিয় অবিকারী আত্মার পরিচয় দিতে পারেন নি, সকলেই পৃথিবীর এলাকায় আত্মা ও জ্ঞানকে আবদ্ধ রেখেছেন। ডেকার্টও মন, অনুভূতি, ধারণা, জ্ঞান—এসবের আলোচনায় দেহ ও আত্মার প্রসঙ্গ তুলেছেন। ডেকার্টের মতে মানুষেরই কেবল আত্মা আছে ও সেই আত্মার সাথে দেহের কোনও সম্পর্ক নেই, অথচ আত্মার যখন কোন অন্তর বা বাহ্য অনুভূতি হয় তখন তা শরীরের সংস্পর্শে না এলে হয় না। সুতরাং তাঁর মনোবিজ্ঞানে দেহ ও আত্মার মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্যেই থেকে গেছে, দেহের উর্ধ্বে আত্মসত্তার স্থান নির্বাচন কোরে তিনি উভয়ের পার্থক্যের সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। দার্শনিক মেলব্রোচ আত্মার আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিপাদিত আত্মা পার্থিব শরীরের মতন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ মায়িক এলাকার বাইরে যেতে পারে না। স্পিনোজা তাঁর 'এথিকো' বইয়ে জাগতিক জ্ঞান ও অনুভূতি সম্বন্ধে বিচার করেছেন। জড় ও চেতন তথা দেহ ও আত্মাকে তিনি ঈশ্বরের (সাব্‌স্টান্স্‌) দুইটি অবিচ্ছেদ্য বিকাশ (মোড্‌স্‌) বলেছেন। আত্মা সেজন্যে ঈশ্বরের গুণ হিসাবে গণ্য। গুণ চিরদিনই গুণীর অধীন এবং অধীন জিনিস কখনো পরিপূর্ণতার দাবী করতে পারে না। চরমজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পিনোজা তাই ঈশ্বরের সাথে বৌদ্ধিক প্রেম-সম্পর্কেরই ('intellectual love') উল্লেখ করেছেন।

আত্মা নিরাধার কোন শূন্য পদার্থ কিনা এই প্রশ্ন তুলে দার্শনিক লাইবনিজ বলেছেন: আত্মার কর্মচাঞ্চল্য ও গতি আছে। কি চেতন, কি অচেতন সকল অবস্থায়ই আত্মা প্রাণময়; প্রাণের স্পন্দন অবিরতই চলেছে; সুতরাং লাইবনিজের দৃষ্টিতে আত্মা সক্রিয় ও কম্পনশীল, আত্মার নিষ্ক্রিয়তা তাই কোনদিনই কল্পনা করা যাবে না। জন্‌ লক্‌ও ডেকার্টের মতন দেহ ও আত্মার দ্বৈত সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় দেহের গতি বা ক্রিয়া যখন আত্মায় সংক্রমিত হয়। এছাড়া সঞ্চিত সংস্কারই (ইনেট্‌ আইডিয়াজ্‌) সকল-কিছু জ্ঞান ও অনুভূতির কারণ। বিশপ বার্কলের মতে আত্মা

বাসনার অভিন্ন রূপ। চিন্তা, স্মৃতি, ইচ্ছা—এ'সমস্ত আন্তর বৃত্তি আত্মার বিকাশ, সুতরাং আত্মা তাঁর মতে ভাবসমষ্টি বা মন ছাড়া অন্য কিছু নয়। বার্কলে ঈশ্বরকে অনেক সময় মনের পর্যায়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন: মনে শক্তি যখন অসীম হয় তখন তাকে ঈশ্বর পর্যন্ত বলতে বাধা নেই। তিনি ঈশ্বরকে আমাদের সকলের অধিষ্ঠান-রূপেও কল্পনা করেছেন। ডেভিড হিউমের আত্মা গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ বা ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁর প্রাণশক্তি তথা 'এলাঁ ভিতা'-র মতন। হিউমের মতের সাথে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদের যথেষ্ট মিল আছে। বিজ্ঞানবাদীদের মতন হিউম আত্মা তথা মনকে সংস্কারের সমষ্টি ('বাণ্ডল অব সেন্‌সেসন্') বলেছেন। বেদান্তদর্শনের মতে মন সংস্কারের সমষ্টি একথা সত্য, কিন্তু মন ও আত্মাকে সেখানে সমশ্রেণীভুক্ত মোটেই বলা হয় নি। মনের অধিষ্ঠাতা ও চালক আত্মা। কিন্তু হিউম মনের সত্তাকে আত্মার সাথে সমান কোরে আধ্যাত্ম জগতে এক বিরাট ভুলের সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আত্মার গুণ-রূপ সংস্কারগুলিকে চিরচঞ্চল ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বলেছেন, তাতে কোরে সেগুলি হয়েছে অসহায় ও নিরবলম্ব। কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতধারা যেমন প্রবহমান হয় আধার হিসাবে নদীবক্ষকে অবলম্বন কোরে, তেমনি ক্রিয়মান সংস্কারগুলিরও অবলম্বন বা অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে; কিন্তু হিউম তাদের কোন আধার কল্পনা করেন নি। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা যেমন পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বাধীন বিজ্ঞানধারাগুলির মধ্যে মিতালী পাঠাবার কোন উপায়ই রাখেন নি, হিউমও আত্ম-সংস্কারগুলির অবস্থা সেইরূপ করেছেন।[৩] অথচ তিনি জাগতিক বস্তুমাত্রের অখণ্ড অনুভূতি স্বীকার করেন—যা সম্ভবপর হয় একমাত্র তাঁর মতবাদকে মেনে নিলে। হিউম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: হিউম মন বা সংস্কারধারা ছাড়া আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।[৪] কাজেই হিউম-এর দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত শূন্যে পর্যবসিত হয়েছে।[৫]

৩। এই শ্রেণীর বৌদ্ধদের সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন: "That idea was very strong among some of the Buddhist thinkers, * * They have regarded that there is a stream of consciousness in which one particular unit of consciousness or sensations or feeling is always in flux, and they explain the personal identity by saying that it is a matter quantitty. * But at the same time they do not search further to go beyond this changeable mental state."—'আওয়ার রিলেসন্ টু দি এ্যাবসোলিউট' (১৯৪৬), পৃঃ ১২৮

৪। অভেদানন্দ: (১) 'আওয়ার রিলেসান্ টু দি এ্যাব্‌সোলিউট, পৃঃ ১২৯, (২) 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ্' (১৯৪৮), পৃঃ ১৯, এবং অধ্যাপক লিণ্ড্‌সে: 'কাণ্ট' পৃঃ ১০৬, ১০৯—১১০

৫। হিউম আত্মার অস্তিত্বের ওপর সন্দেহ কোরে বলেছেন: "* * Were all my perceptions removed by death and I could neither think nor feel nor see nor love nor hate after the dissolution of my body, I should be entirely annihilated; nor do I see what is further required to make me a perfect non-entity". হিউমের মতে প্রতি রাত্রে আমরা মৃত্যু মুখে পতিত হই ও প্রাতে আবার জাগ্রত হই; এই মৃত্যু ও জাগরণ-ধারা নিয়েই একজন মানুষের অখণ্ড জীবনের সার্থকতা।

দর্শন বা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিউম তাই সত্যিই অকৃতকার্য হয়েছেন। হিউমের পর কাণ্ট নূতন কোরে মনোবিজ্ঞানের প্রাণ সঞ্চার করেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "And it is Kant who afterwards has made revival of the true philosophy from another view-point, because Hume had killed all psychology by saying there is no constant and permanent thing in experience. It is all floating clouds".[৬]

ইমানুয়েল কাণ্ট যেমন নৈতিকনীতির অনুরোধে ঈশ্বর, অমরত্ব ও আত্মস্বাধীনতাকে মেনেছেন, তেমনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কাণ্টের এই অভিযান যেন হিউমের বিরুদ্ধেই হয়েছিল। হিউম পরস্পরবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা স্বীকার করেছেন, অথচ আলাদা আলাদা জ্ঞান বা সংবিদ্‌গুলিকে একত্রিত কোরে কিভাবে অখণ্ড একটি অনুভূতি উৎপন্ন হয় তার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। কাণ্ট এই মীমাংসার সমাধান করেছিলেন চলমানতার ভিতর অচঞ্চল ও শাশ্বত একটি আত্মসত্তা তথা জীবাত্মাকে (Ego) মেনে নিয়ে। অদ্বৈতবেদান্তীরা যেমন ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদ খণ্ডন কোরে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করেছিলেন অধিষ্ঠানরূপে আত্মচৈতন্যের অস্তিত্বকে মেনে। কাণ্টের প্রণালীও ছিল ঠিক তাই; অনুভূতির সম্ভাবনার জন্যে তিনি আত্মা স্বীকার করেছিলেন মন থেকে তাকে সম্পূর্ণ পৃথক কোরে। তবে কাণ্টের এই আত্মা বা 'ইগো' (জীবাত্মা), ঔপনিষদিক শুদ্ধ-আত্মা নন, কারণ কাণ্ট তার ইগো-কে সংস্কার-সমষ্টির অধিষ্ঠান বলেছেন, ভারতীয় দর্শনে যাকে ফেলা হয়েছে মনের পর্যায়ে।

দার্শনিক শেলিঙ্‌ চিন্তা তথা মনের নিয়ামক-রূপে আত্মার অস্তিত্ব মেনেছেন। ফিক্টেও বলেছেন: মননের পরিণতিই চিন্তা, কিন্তু মননকারী একজন অবশ্যই থাকেন এবং সেই মননকারীই আত্মা। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন: আমরা সাধারণতঃ মনঃসংযোগ করলে দেখি যে, জ্ঞানের দুটি বিষয়: একটি আমি, যে জ্ঞানকে বিষয় করে ও অপরটি আমা থেকে ভিন্ন একটি জিনিষ যা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। তবে ফিক্টে দেহ থেকে পৃথক কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন: "দেহ থেকে ভিন্ন আত্মার সত্তাকে মেনে নিতে আমি রাজী নই। তাছাড়া আত্মা সম্বন্ধে সকল ধারণাকেই মন্দ-কিছু আবিষ্কারের মতন পরিত্যাগ করা উচিত।"[৭] দার্শনিক হেগেলও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই আত্মা ব্রহ্মের অংশ-বিশেষ, পূর্ণ মোটেই নন। হেগেল রামানুজী ভঙ্গীতে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে গড়ে তুলে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সর্বদা সমান্তরাল রেখা তিনটির মতন অটুট রাখ্‌তে চেষ্টা করেছেন। হেগেলের পর সোপেনহাওয়ার, জেকব ফ্রেডারিক ফ্রাইজ্‌, হারবার্ট, হেগেলপন্থী ট্রাস্‌, লুড্‌উইগ ফায়ার্‌বাক্‌, কোঁতে, মিল, ডারুইন, স্পেন্সার, লোট্‌জে, ফেক্‌নার, হার্টম্যান,

৬। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসন টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১২৯

৭। "The existence of a soul is absolutely denied, and the whole concept rejected as a bad invention. And this is not an indifferent matter, but an essential criterion of our system. With the belief in such a soul a man cannot abide in the system, nor even enter it."—ডাঃ হফ্‌ডিঙ্‌: 'এ হিষ্টরি অব্‌ মডার্ণ ফিলজফি', ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৪

এলবার্ট ল্যাঙ্, ডুহেরিঙ্ প্রভৃতি বস্তুতন্ত্রবাদী, আন্তরবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, বিকাশবাদী দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, অনুভূতি ও আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, কেউ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, আবার কেউ আত্মাকে জড়েরই একটি ভিন্ন বিকাশ বলেছেন, বিচিত্র মতের আর অন্ত নাই। অধ্যাপক জে. সি. ফ্লুগেল তাঁর 'এ হান্‌ড্রেড্ ইয়াস' অব সাইকোলজি' (১৯৩৩) বইয়ে একশ বছরের বিভিন্ন মতবাদী মনোবৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় জি. এস. ব্রেট তাঁর 'এ হিস্‌ট্রি অব্ সাইকোলজি' (১৯২১), জে. এল. বল্‌ডুইন তাঁর 'হিস্‌ট্রি অব্ সাইকোলজি' (১৯১৩) এবং ডব্লিউ. বি. পিল্‌স্‌বারি তাঁর 'দি হিস্‌ট্রি অব্ সাইকোলজি (১৯২৯) বইগুলিতে মনোবিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায়, আত্মার অস্তিত্ব প্রায় সকল মনোবৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেছেন, তবে মনের ওপরে কেউই আত্মার আসন নির্বাচন করেন নি।

স্বামী অভেদানন্দ আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জড় তথা বস্তুতন্ত্রবাদীদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "বর্তমান শারীরবৈজ্ঞানিক, শরীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞগণ ও অন্যান্য জড়বাদী এবং অজ্ঞেয়তা-বাদীরা বিশ্বাস করেন যে, পার্থিব শরীর অথবা জড়পদার্থের সমষ্টি থেকে চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মন অথবা আত্মার সৃষ্টি হয়। তাঁরা বলেন, চিন্তা বুদ্ধি বা জ্ঞান সমস্তই মস্তিষ্কের একটি ক্রিয়াবিশেষ। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিশিষ্ট চিন্তা বা মননের আকার মস্তিষ্কের বিশেষ কোন একটি অংশের ক্রিয়ার পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। * * বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের ভিতর যাঁরা মস্তিষ্ক থেকেই চিন্তার সৃষ্টি হয় এই সিদ্ধান্ত করেন, তাঁদের মতে মন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যদি বন্ধ হয় তবে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মানসিক সকল ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হোয়ে যায়; সুতরাং ক্রিয়া ছাড়া আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই, আর সেজন্যে মৃত্যুর পর আত্মা বোলে কোন জিনিস থাকে কি-না এসব প্রশ্নেরও অবকাস থাকতে পারে না।"[৮] প্রসিদ্ধ বস্তুতন্ত্রবাদী বুক্‌নার, জে. লুইস্, পার্সিভাল লয়াল, স্পেন্সার, অধ্যাপক ডব্লিউ. কে. ক্লিফোর্ড প্রভৃতির মতবাদের নজির দিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সকল দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত যে, জড়বস্তুর পরিণতিই জ্ঞান ও আত্মা, জড়বস্তু থেকে আত্মা বা চৈতন্যের পৃথক অস্তিত্ব নাই। বুকনার বলেছেন: "চিন্তাকে আমরা সাধারণ প্রাকৃতিক গতির একটি বিশেষ ধারা বলি।" জে. লুইস বলেছেন: "আমরা দেখি—কোন ধাতুর তৈরী একটি দণ্ড জ্বলন্ত হাপরে দিলে তা যেমন ক্রমশ গরম হোয়ে ওঠে ও উজ্জ্বল লালরঙ থেকে গাঢ় লালরঙে পরিণত হয়, * * তেমনি জীবন্ত চেতন অণুকোষ আকর্ষণীয় প্ররোচনার সাম্‌নে ধীরে ধীরে আন্তর চৈতন্যে পরিণত হয়।" পার্শিভাল লয়াল বলেছেন: "মোটকথা জ্ঞান বা আত্মা বল্‌তে আমরা

৮। Modern physiologists, anatomists, pathologists, and a host of other materialistic and agnostic thinkers, * * there can be no question regarding its existence after death".—'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৮), পৃঃ ১৩

বুঝি· স্নায়ু-দীপ্তি ('nerve glow')।[৮] অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের মতেও চৈতন্য বা আত্মা কতকগুলি সংবেদন-রূপ পদার্থের সমবায়ে গঠিত।[৯] এই সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধে স্বামী অভেদানন্দ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, জি. জে. রোমেন্স, ডাঃ শিলার, কাণ্ট প্রভৃতির যুক্তিতর্কের নজির দেখিয়েছেন।[১০] জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন: আমরা কোন জীবজন্তুর বা মানুষের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার পর যদি মন অথবা আত্মা-রূপ পদার্থের কোন সন্ধান না পেয়ে বলি যে, মন বা আত্মা নাই, তবে আমরা ভুল করব, কেননা একথা ঠিক যে, 'মন বা আত্মার অস্তিত্ব নাই' একথা বলার অর্থই হোল মন বা আত্মার পূর্বেকার অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে তার খণ্ডন করা। যেমন জড়বস্তুর, মস্তিষ্কের অথবা যেকোন রকমের জ্ঞান আত্মসংবেদনের ওপর নির্ভর করে, তেমনি জাগতিক সকল-রকম অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের যা কারণ তার প্রাধান্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব, কেননা সেই মুখ্যজ্ঞানের মাধ্যমেই জড়বস্তু অথবা তার সমষ্টি রূপ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি।" প্রকৃতপক্ষে বলতে কি, শ্রদ্ধেয় মিল তাঁর আত্মাকে আবার সংবেদনেরই সমষ্টি ('a series of feelings') বলেছেন, যা সন্দেহবাদী হিউমের মতবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে ডাঃ শিলারের অভিমত অনেকটা যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন: জড়বস্তু কখনো চৈতন্য সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তা চৈতন্যের পরিধিকে সীমারদ্ধ করে।[১১]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন: অনেক প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হোত, কিন্তু তা একমাত্র মনেরই বিচিত্র বিকাশ হিসাবে ('the various functions of the mind'), এবং তাদের স্থান নির্দেশ করা হোত শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ('in different parts of corporeal body')। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল নিজে মনের সাক্ষী-স্বরূপ চেতন সত্তা ও বিষয়ী-আত্মার অস্তিত্ব মেনেছেন। সেই চেতন সত্তাকে তিনি বলেছেন 'পরিপূর্ণ বা চরম ব্যক্তিত্ব' ('the perfect personality')। অধ্যাপক জেমস্ ওয়ার্ডের স্বীকৃতি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী, কেননা চৈতন্য বা আত্মা বলতে তিনি বুঝেছেন সর্বসাধারণের মধ্যে অবস্থিত শাশ্বত বিষয়ী ('a common and permanent subject')—যদিও দার্শনিক দৃষ্টিতে আত্মার যা স্বরূপ হওয়া উচিত অধ্যাপক ওয়ার্ডের পরিকল্পিত আত্মসত্তার পরিণতি ঠিক তা নয়। মনোবৈজ্ঞানিকী দৃষ্টিতে তিনি আবার বিষয় বা আত্মার তিনটি রূপের কল্পনা করেছেন, যেমন: (১) জড় আত্মা, (২) সামাজিক আত্মা এবং (৩) বৌদ্ধিক আত্মা। অধ্যাপক ওয়ার্ডের ভাষায় এই তিনটির নাম (১) সচেতন ও বুবুক্ষু আত্মা ('the sensitive and the appetitive self'), (২) স্মৃতি ও কল্পনা-বিলাসী আত্মা ('the remembering and the immagining self'), (৩) চিন্তা ও কামনাবিলাসী আত্মা ('the thinking and the willing self')। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ওয়ার্ডের এই বিভাগ ও কল্পনা আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুশীল জীবাত্মার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ এবং

৯। অভেদানন্দ: 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৬৮), পৃঃ ১৪—১৬

১০। ঐ, পৃঃ ১৭—১৮

১১। অভেদানন্দ: 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৮), পৃঃ ১৭-১৮

সর্ববিবর্তন-বিরহী দিব্য-আত্মার শ্রদ্ধালাভ থেকে বঞ্চিত করেছে। উণ্ড্,. কুন্নে, টিচেনার প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিকেরাও আত্মস্বরূপের যথাযথ সম্মান দিতে পারেন নি, কেননা তাঁদের মতেও সমষ্টি মনোবৃত্তির নাম আত্মা। উইলিয়ম জেম্স বলেছেন, আত্মা বল্‌তে বোঝায় সংবেদনধারা ('the flux or stream of consciousness')। ষ্টাউটের মতে আত্মা প্রত্যক্ষাত্মক চিন্তাধারা মাত্র ('the presentational continuum')। তাই ডাঃ ইয়ুঙ্‌ বলেছেন: ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আত্মাকে বাদ দিয়েই আত্মবিজ্ঞান তথা মনোবিজ্ঞানের অভিযান চলেছিল।[১২] এ্যাড্‌লার, ইয়ুঙ প্রভৃতি ছিলেন ডাঃ ফ্রয়েডের ছাত্র, কিন্তু ফ্রয়েডের সাথে তাঁদের মতভেদ হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে। এ্যাডলার ও ইয়ুঙের মধ্যেও ছিল মতের অনেকটা পার্থক্য, কেননা ডাঃ এ্যাড্‌লার যেখানে আত্মার সার্থকতাকে শ্রেষ্ঠত্বলাভের সংগ্রামে সৈনিকের মর্যাদা দিয়েছেন, ডাঃ ইয়ুঙ সেখানে আত্মাকে প্রসুপ্ত জীবনীশক্তি বলেছেন। ডাঃ ফ্রয়েড আত্মার ইগো, সুপার-ইগো ও ইদ্‌ এই তিনটি অংশ বা ভাগ স্বীকার করেছেন। এই তিনটিকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় চেতন, পরচেতন ও অচেতন বা অবচেতন মনও বলা হয়। ভারতীয় দর্শনে একই অন্তঃকরণ যেমন বিকাশ ও কার্য ভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চার রকম রূপে প্রকাশ পায়, ডাঃ ফ্রয়েডও তেমনি একই মনের বিকাশভেদের জন্যে তিন রকম ভাগ করেছিলেন। ডাঃ ফ্রয়েড ঐ তিনটি মনস্তরকে তিনটি জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছেন, যেমন ইদ্‌কে তুলনা করেছেন আদি অখণ্ড অবচেতন জ্ঞানের (the primal undifferentiated unconscious) সাথে, ইগোকে পার্থিব জ্ঞানের (the empirical conciousness) সাথে ও সুপার-ইগোকে তুলনা করেছিলেন যা সকল-কিছুর সাথে সম্পর্ক (censor) কোরে দেয় তার সঙ্গে। অবচেতন বা অচেতন মনকে ডাঃ ফ্রয়েড একখণ্ড বরফের সাথে তুলনা করেছেন। বরফখণ্ডের তিনভাগ থাকে জলের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে ও এক ভাগ মাত্র জলের উপরে। অবচেতন মনও তাই। পূর্বপূর্ব-জন্মের অসংখ্য সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ অবচেতন মনের একটি আংশ মাত্র কার্যের আকারে প্রকাশ পায় ও বাকী তিনভাগ অব্যক্ত থাকে। ডাঃ ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল কাম বা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির (sexual impulse) দিক থেকে। সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম দিব্য-ভালবাসাকেও তিনি ইন্দ্রিয়-প্রসক্তিযুক্ত বল্‌তেন। মেরী ম্যাক্‌ডেলিন যখন সুগন্ধ তৈল সিঞ্চন কোরে নিজের সুবর্ণোজ্জ্বল কেশরাশি দিয়ে ক্রুশেবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের পাদুটিকে মুছিয়ে দিচ্ছিলেন ও চোখের জলে ভেসে বারবার চুম্বন করছিলেন, ডাঃ ফ্রয়েডের দৃষ্টিকোণে তাও প্রতীত হয়েছিল পার্থিব ভালবাসা তথা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির নিদর্শন-রূপে। মা ছেলেকে স্নেহ করে, ভাই ভাইকে বা বোনকে ভালবাসে, ভৃত্য প্রভুকে ভক্তি করে এসবই ডাঃ ফ্রয়েডের কাছে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির বহির্বিকাশ। ডাঃ ফ্রয়েডের এই মতবাদকে ডাঃ এ্যাড্‌লার, ডাঃ ইয়ুঙ্‌ প্রভৃতি কেহই গ্রহণ করতে পারেন নি। ডাঃ ইয়ুঙ্‌ তাঁর আচার্য-প্রতিপাদিত ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে

১২। (ক) ডাঃ ইয়ুঙ: 'মডার্ণ ম্যান ইন্‌সার্চ অব এ সোল' (১৯৪৫), পৃঃ ২০৮-২০৯

(খ) অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল: 'এ্যান্‌ আউটলাইন্‌ অব এ্যাব্‌নর্‌ম্যাল্‌ সাইকোলজি' (১৯৪৮) পৃঃ ২৮৮-১৯৬

(sexual instinct) দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, ঐ প্রবৃত্তিই জীবনীশক্তি বা প্রকৃতি—যাকে ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ বলেছেন 'এলাঁ ভিতা' (*élan vital*)। ডাঃ ইয়ুঙ্ আত্মা বা 'সাইকি' (*psyche*) শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছেন : 'সাইকি' পরিভাষাটি গ্রীসদেশের। সীলি (*seele*) শব্দের অর্থ 'সোল' (soul)—গথিক 'স ঁইওয়ালা' (*saiwala*) শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।[১৩] প্রাচীন জার্মাণ ভাষায় একে বলে 'স ঁইওয়ালো' (*saiwalo*)। 'সীলি' (*seele*) শব্দের প্রকৃত অর্থ 'চলমান শক্তি' (moving force) বা জীবনীশক্তি ('life-force')।[১৪] ডাঃ ইয়ুঙ্ বলেছেন : 'সোল' বা আত্মার কোন বিস্তৃতি নেই, তবে ইন্দ্রিয়ের জগতে তার বিস্তার আছে। আত্মা অবচেতন (unconscious) স্তরেই থাকে। অবচেতন স্তর বা মন চৈতন্য থেকে ভিন্ন সৃষ্টি নয়, বরং অবচেতনকে চৈতন্যই বলা যায়। এই অবচেতন মনই আত্মা—সর্বব্যাপক ও আদি-কারণচৈতন্য। ডাঃ ইয়ুঙের এই স্বীকৃত অনেকটা বেদান্ত ও তন্ত্র মতবাদের সাথে মেলে, কেননা বেদান্ত ও তন্ত্র উভয়ে মনের অবচেতন স্তরকে সুষুপ্তি বা কারণজ্ঞান (causal consciousness) বলেছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কারণ-জ্ঞানই অব্যক্ত, প্রকৃতি, প্রজ্ঞা বা মায়াধীশ সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর। তন্ত্রে একে মহামায়া বলা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি এই মহামায়াকে (cosmic or divine Energy) জগৎকারণ বলেছেন, কেননা শুদ্ধ মায়াবিরহী ব্রহ্মে সৃষ্টির কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। তন্ত্রে অবচেতন কারণমনকেই কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে। এই কুণ্ডলিনী অজ্ঞানাচ্ছন্ন সুপ্ত জীব। কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলতে জীবের চৈতন্যের সঞ্চার ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি উন্মুখী হওয়া বুঝায়। কুণ্ডলিনী-রূপী জীবই আসলে শিব বা ব্রহ্ম। মস্তকে সহস্রারপদ্মে পরমশিবের অবস্থান কল্পনা মাত্র। তন্ত্রে আরোহণ-অবরোহণ বা উত্থান-পতনপ্রণালীর উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আসলে জ্ঞানের আরোহণ-অবরোহণ কল্পনা করা অযৌক্তিক। তবে সাধনার দৃষ্টিতে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের কল্পনা করা হয়। জীব শিব-রূপেই মনের অবচেতন স্তরে ঘুমিয়ে থাকেন, বিচারের সাহায্যে নিজের স্বরূপের জ্ঞান হোলে জীব পরমশিব-রূপে প্রকাশ পান। এজন্যে অবচেতন মন-রূপী অব্যক্তকেই ঈশ্বর বা ভগবানের স্বরূপ বলা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে এতদূর পর্যন্ত অনুশীলন এখনো পর্যন্ত হয় নি। কোন কোন দার্শনিক ও বর্তমান মনোবৈজ্ঞানিক এর ইঙ্গিত মাত্র করেছেন।

ডাঃ ইয়ুঙের মতন এ. এইচ্. বি. এ্যালানও আত্মার শুদ্ধ ও দিব্যভাবকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। এফ. ডব্লিউ. এইচ্. মায়ার্স, ডাঃ উরচেষ্টার, মিস্ সিনক্লেয়ার, মিঃ মার্শাল

১৩। ডাঃ ইয়ুঙ্ বলেছেন : 'স্পিরিট' অথবা 'সোল' শব্দদুটির ল্যাটিন পরিভাষা 'এ্যানিমাস্'। স্পিরিট ও 'এ্যানিমা'-র অর্থ সোল। এরা আবার গ্রীক্ 'এ্যানিমস্' (বায়ুর) শব্দের সমপর্যায়ভুক্ত। গথিক ভাষায় পাই 'আস্-এ্যানান (*us-anan*) শব্দের অর্থ শ্বাসগ্রহণ করা ও ল্যাটিনে 'এ্যান্-হেলেয়ার' (*an-helere*) শব্দের অর্থ অংশ গ্রহণ করা। 'রীঃ' (*rih*) ও 'রূঃ' (*ruh*) শব্দ দুটির অর্থও বায়ু তথা প্রাণবায়ু।

১৪। ডাঃ ইয়ুঙ্ : 'মডার্ণ ম্যান্ ইন্ সার্চ অব এ সোল' (১৯৪৫), পৃঃ ২০৯

প্রভৃতি দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিকেরাও আত্মাকে মনের অধিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করেছেন,[১৫] এবং এজন্যে আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতাই প্রমাণিত হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের জগতে সমসাময়িক চিন্তার অবদান বিচিত্র। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানে প্রধাণত দুটি মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়, যদিও এই দুটির শাখা-প্রশাখাও অনেক আছে। ইংলণ্ডে, জার্মানিতে ও বিশেষ কোরে আমেরিকায়ই এদের গবেষণা বেশী কোরে হয়েছে। এ'দুটি মতবাদ হোল গঠনমূলক (structural) ও ক্রিয়ামূলক (functional)। অধ্যাপক টিচেনার, উণ্ড এবং এঙ্গেলই এ' দুটি মতবাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। এই দুটি মতবাদের পরিচয় ও এদের মধ্যে পার্থক্য হোল: (১) গঠনমূলক মনোবিজ্ঞানে আত্মা বা চৈতন্যের বিশ্লেষণ অথবা গবেষণা করা হয় তার আকার, গঠন ও বিষয়বস্তুকে গ্রহণ কোরে, আর (২) ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানে এসব বিশ্লেষণী নীতি তো থাকেই, উপরন্তু চৈতন্যের ক্রিয়া ও বিকাশের দিকেও বেশী নজর দেওয়া হয়। গঠনমূলক নীতিকে তাই অস্তিমূলক বলে, অর্থাৎ আত্মা বা চৈতন্য আছেই ও সেই 'আছে'-র বা সত্তামাত্রের অনুশীলন করা হয়, আর ক্রিয়ামূলক নীতির কাজ হোল আত্মা বা চৈতন্য কি করে ও তার কার্য কি—সে সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ করা। সুতরাং গঠনমূলক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মা বা চৈতন্য অচঞ্চল ও স্থির, এবং ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানে চৈতন্য সচঞ্চল ও ক্রীয়াশীল। শুধু তাই নয়, গঠনমূলক নীতির কাজই হয় ব্যক্তিমাত্রের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সম্বন্ধে পরিচয় দান করা, আর ক্রিয়ামূলক নীতি প্রমাণ করে মানুষের তথা চৈতন্যের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপকে। তাই গঠনমূলক মনোবিজ্ঞান চৈতন্যের পরিচয় দান করে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালীর মাধ্যমে, আর ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানে থাকে কারণ-মীমাংসার (teleolegical) দৃষ্টিভঙ্গী, কেননা এই নীতি আত্মা বা চৈতন্যকে তার পরিবেশ অনুযায়ী জৈবিক (biological) উদ্দেশ্যের উপায়-রূপে গণ্য করে। কিন্তু বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের জগতে গঠনমূলক নীতির পৃথক কোন আর উপকারীতা দার্শনিকেরা অনুভব করেন না। তাঁরা একে গঠনমূলক নীতিরই অন্তর্ভূক্ত করতে চান। অধ্যাপক উড্‌ওয়ার্থ বলেছেন, এর সপক্ষে স্বয়ং টিচেনার ও হফ্‌ডিঙ্‌, উইলিয়াম জেম্‌স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিকদের সমর্থন আছে।

আমেরিকার জে. বি. ওয়াটসন মনোবিজ্ঞানে 'ব্যবহারবাদ' (Behaviourism)-এর প্রচলন করেন। 'ব্যবহার' বল্‌তে শরীরের যে-কোন অঙ্গ-সঞ্চালন বা গতি বোঝায় ও সেই অঙ্গ-সঞ্চালন বা গতির পিছনে থাকে কোন-কিছু উদ্দীপনা ও স্পন্দন। উদ্দাপনা আন্তর ও বাহ্য দুরকমই হোতে পারে। এই উদ্দীপনার পর শরীরে যে স্পন্দনক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তারই নাম আচার বা ব্যবহার। ব্যবহার কিংবা আচরণবাদে মন বা চৈতন্যের কোন স্থান নেই। চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা. অথবা যে কোন বাইরের ও ভিতরের কাজই শারীরিক উদ্দীপনা থেকে সম্পন্ন হয়। এই মতবাদের সকল রকম প্রয়োগই বাহ্যিক, কেননা আন্তর সমস্ত-কিছু কর্ম বা ব্যবহারকে এই মতবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই অন্যান্য মনেবৈজ্ঞানিকেরা এই মতের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। ওয়াটসনের পরে লেলিনগ্রাডের রাশিয়ান মনোবৈজ্ঞানিক পাবলব এই মতবাদের যথেষ্ট অনুশীলন

১৫। অধ্যাপক প্র্যাট্: 'দি রিলিজিয়াস্ কন্‌সাস্‌নেস্' (১৯৪৫), পৃঃ ৪৯-৫১

করেন। তাঁর মতে শুধু স্নায়বিক উত্তেজনাবশেই শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কোন ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সেই স্নায়বিক উত্তেজনাও আপেক্ষিক ('the conditioned reflex') হওয়া প্রয়োজন এবং উত্তেজনার ফলস্বরূপ স্পন্দনক্রিয়া হয় ইতি ও নেতিবাচক।[১৬]

গেস্‌টল্ট মনোবিজ্ঞানের অবদানও চিন্তার জগতে বড় কম নয়। 'গেস্‌টল্ট' বল্‌তে বোঝায় বহি'র্গঠন বা সংঘীভূত পূর্ণ একত্ব ('organised whole')। এই 'সংঘীভূত একত্ব' বল্‌তে এই নয় যে, কতকগুলি অংশ একত্রিত হোয়ে পূর্ণের রূপ গড়ে তোলে। অংশ বা ব্যষ্টির চেয়ে বরং পূর্ণ বা সমষ্টির সার্থকতাই এতে বেশী। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে যোগাযোগ থাকে সকল সময়ই। মনোবৈজ্ঞানিক উণ্ডের মতবাদের বিরুদ্ধেই হোল এই মতবাদের আসল অভিযান। অবশ্য ব্যবহার-বাদের (Behavourism) উদ্দেশ্যও অনেকটা তাই। গেস্‌টল্ট-মতবাদের প্রবর্তক কোহ্‌লার, কোফ্‌কা, বারথেইমার, স্পিয়ারম্যান প্রভৃতি। এই মতবাদে মনের উপযোগীতাকে অস্বীকার করা হয় নি। এই মতে আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে দেহ ও মনের সমষ্টি রূপের ওপর, কিন্তু এই সমষ্টি রূপও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়।[১৭]

ভারতীয় দর্শনে এবং মনোবিজ্ঞানে মন ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। একমাত্র চার্বাকপন্থী ও কোন কোন শূন্যবাদী বৌদ্ধ আত্মা বা অত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের অনেকেই দেহসর্বস্ববাদী অথবা বস্তুতন্ত্রবাদী। শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা বিজ্ঞান তথা মনকে পুদ্‌গল বা সংস্কারসমিষ্টির পরিণতি বলেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞান থেকে পৃথক কোন আত্মবস্তুর সত্তা নেই, আর এজন্যেই তাঁরা বিষয়ীবিজ্ঞানবাদী (subjective idealist) তা আগেই বলেছি। বেদে ও উপনিষদে আত্মার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদেও 'আত্মা' এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ও সেখানে এর অর্থ বিশ্ববৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ। প্রাণবায়ু-রূপেও আত্মার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে। আত্মাকে সেখানে ব্রহ্মের মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে। উপনিষদে পঞ্চকোষ তথা মায়িক আবরণের কথা আছে। পঞ্চকোষের মধ্যে আনন্দময়কোষে আত্মার স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ইন্দ্র-বিরোচন-আলোচনায় প্রজাপতি দেবরাজ ইন্দ্র ও বিরোচনকে যে ক্রমিক অধ্যাত্ম উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে সর্ববিকারবিরহী চৈতন্যময় আত্মার কথা বলা হয়েছে। সুষুপ্তির অবস্থায় আত্মার সুস্পষ্ট স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, অথবা সুষুপ্তির পারে মায়াবিহীন তুরীয় অবস্থাই আত্মার যথার্থ রূপ—এ প্রসঙ্গের উল্লেখ উপনিষদে আছে। শ্বেতাশ্বতর (৪।৬) ও মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।১) আত্মা যে ঈশ্বর থেকে আলাদা ও অন্তর্যামী এরূপ স্বীকৃতি করা হয়েছে। ঈশ-উপনিষদে (১৫) আত্মার সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'আত্মা চলমান, আবার নিশ্চল। তিনি দূরে আবার নিকটে।' স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'সেলফ্‌ নলেজ' (আত্মজ্ঞান) বইয়ে যে আত্মার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[১৮] তা বেশীর ভাগই ঔপনিষদিক দৃষ্টিকোণ থেকে; আত্মা সেখানে জন্ম-মৃত্যুজয়ী শাশ্বত ও বিশ্ববৈচিত্র্যের অধিষ্ঠান।

১৬। অধ্যাপক ফ্লুগেল: 'এ হান্‌ড্রেড ইয়ার্স অব সাইকোলজি' (১৯৫৫), পৃ: ২৫১-২৬৪

১৭। ঐ, পৃ: ২৪১-২৫০।

১৮। 'সেলফ্‌ নলেজ' (১৯৪৪) বইয়ে 'নলেজ অব দি সেলফ্‌', 'প্রাণ এ্যাণ্ড দি সেলফ্‌', 'সার্চ আপ্‌টার দি সেলফ্‌' প্রভৃতি আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু আত্মা সেখানে বহু, সর্বব্যাপী ও সকল রকম গুণবিহীন। জৈনদর্শনে বহু আত্মা স্বীকার করা হয়েছে ও সেই সকল আত্মায় অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তসুখ ও অনন্তবীর্য-রূপ গুণগুলি নিহিত আছে। তবে বেদান্তের মতন সাংখ্যীয় আত্মা চিৎ ও আনন্দ-স্বভাবসম্পন্ন নন। সাংখ্যে প্রকৃতিই কেবল আনন্দ তথা পরমসুখভোগী, আত্মার সুখও নাই, দুঃখও নাই, আত্মা নির্দ্বন্দ্ব।

ন্যায়-বৈশেষিকে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, আত্মা সেখানে সর্বব্যাপক বা বিভু। ব্যক্তিভেদে আত্মা অনন্ত। আত্মায় জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখবোধ প্রভৃতি গুণ আছে। আত্মার সাথে মনের সংযোগ হোলেই জ্ঞান ও অনুভূতি হয়।

মীমাংসাদর্শনেও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে, কেননা আত্মা না থাক্‌লে কে বৈদিক শাস্ত্র ও বিধি অনুযায়ী যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করবে, অথবা কেই বা স্বর্গলাভ-রূপ অপবর্গ লাভ করবে? মীমাংসাদর্শনে আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে ভিন্ন, অনন্ত ও অসংখ্য। দেহভেদে তাই আত্মা অনেক। আচার্য প্রভাকর আত্মাকে অনুভূতিগম্য বলেছেন, কিন্তু কুমারিলের মতে আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। অনেকে আত্মাকে অণু-পরিমাণ বলেন, কিন্তু মীমাংসাকার তা স্বীকার করেন না, কেননা আমাদের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই সময়ে স্পর্শ বা বেদনাবোধ হোতে পারে। জৈনদর্শন আত্মাকে দেহ-পরিমাণ বলেছে, সুতরাং তার মতে দেহের হ্রাসবৃদ্ধিতে আত্মারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কুমারিল আবার আত্মাকে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন বলেছেন—যদিও আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হয় মনেরি ক্রিয়ার দ্বারা।

বৌদ্ধদর্শনে আত্মা তথা অত্তার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহামতি বসুবন্ধু তাঁর 'অভিধর্মকোষ' গ্রন্থে বাৎসীপুত্রীয় ও সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের মতে আত্মা আছে কি-না এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকের মতে পুদ্‌গলসমষ্টি ব্যতিরেকে আত্মার পৃথক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বসুবন্ধু অভিধর্ম্মকোষের পরিশিষ্টে আত্মার অস্তিত্ব আছে একথার ইঙ্গিত করেছেন।[১৯] সুপণ্ডিত অশ্বঘোষ জন্ম-মৃত্যু বা সংসারের আকারে (সংসারী) আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: এই আত্মা চরমসত্য তথাগতগর্ভ থেকে সৃষ্টি হয়। তথাগতগর্ভ অবিনাশী কিন্তু আত্মা বিনাশী, সুতরাং শাশ্বত ও অনিত্য এই দুটি বস্তুর সহমিলন সম্ভব হোলেও তারা বস্তুত এক নয়, অথচ দুটির ভিতর কোন দ্বন্দ্বও কিছুমাত্র নাই। সুতরাং আত্মা যখন সংসারী হয় তখন তাকে আলয়বিজ্ঞানই বলা যায়।[২০]

থেরাবাদীরা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংনিখারা ও ভিন্নান (সংস্কার ও বিজ্ঞান) এই পঞ্চস্কন্ধ স্বীকার করেছেন। এই পঞ্চস্কন্ধই আত্মা তথা আত্মার রূপকে গড়ে তুলেছে।[২১] 'নিকায়' গ্রন্থে আত্মার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করা হয়েছে, কিন্তু খণ্ডন তথা নিষেধের মুখে শাশ্বত ও অচঞ্চল একটি সত্তাকেও প্রকারান্তরে আবার মেনে নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের

১৯। ডাঃ দাশগুপ্ত: 'এ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (১৯৩২), ১ম ভাগ, পৃঃ ১১৭

২০। ডাঃ দাশগুপ্ত: 'এ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (১৯৩২), ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩১

২১। ডাঃ এন. কে. দত্ত: 'আর্লি মনিষ্টিক বুদ্ধিজিম্' (১৯৪১), ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪-২৫

মধ্যে উচ্ছেদবাদের প্রচলন আছে—যা প্রাচীন বৌদ্ধেরা মোটেই সমর্থন করেন নি।[২২] সাত রকমের উচ্ছেদবাদের প্রচলন আছে, এই সাত রকম বাদের প্রচলন থাকায় একথা অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে সাত রকম ধারণার প্রচলন ছিল—যেগুলিকে নতথত্তবাদীরা এই বোলে খণ্ডন করেছেন যে, দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও ধ্বংস হয়।[২৩] হীনযানী ও মহাযানী-সম্প্রদায়দের ভিতর মহাযানী বৌদ্ধেরা আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার করেন না, কেননা তাঁরা বলেন: 'সর্বং অনিত্যং, সর্বং শূন্যং, সর্বং অনাত্মন্'।[২৪] অধ্যাপক পুস্যান্ও (Prof Poussin) একথার উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে একমাত্র পুদ্‌গলকেই আত্মার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, স্যাদবাদ অথবা উচ্ছেদবাদ স্বয়ং বুদ্ধদেব মানতেন না বোলেই মনে হয়। কিন্তু বাৎসীপুত্রীয়েরা আত্মার স্থলাভিষিক্ত কোরে পুদ্‌গলের প্রচলন করেন, তাঁদের মতে বুদ্ধদেবেরও তাই অভিমত; কিন্তু সৌত্রান্তিক-যোগাচার-সম্প্রদায় পুদ্‌গল-বস্তুটিকে আকাশকুসুম বোলে অস্বীকার করেছেন।[২৫] অধ্যাপক চার্‌বাস্কি বলেছেন: বুদ্ধদেব হয়তো বোলে থাক্‌বেন—'তম্ জীবম্ শরীরম্', কিন্তু আত্মার সত্যিকারের কি স্বরূপ সে সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তরই ছিলেন। ডাঃ শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত বলেছেন: বৌদ্ধধর্মে আত্মাকে যদি নিত্য ও শাশ্বত জিনিস বোলে মনে করা হয়, তবে তা শুধুই অন্যায় হবে না, পরন্তু সমস্ত পার্থিব বস্তু যে অসত্য ও ক্ষণভঙ্গুর এ' ধারণারই তা প্রতিবন্ধক স্বরূপ হবে। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবে 'আত্মা' শব্দটি এতই সাধারণভাবে ব্যবহার হোত এবং গোড়াকার ঔপনিষদিক ধারণার সংস্পর্শে এসে আত্মার স্বভাব ও গুণগুলিকে লোকে এতই বেশীভাবে গ্রহণ করত যে, আত্মার সত্তা ও ধারণার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোরে মন থেকে তাদের সম্পূর্ণ মুছে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া বৌদ্ধরা একথাই প্রচার ও প্রমাণ করেছেন যে, এক নির্বাণ ছাড়া আর সব-কিছুই অনিত্য; সুতরাং নিত্যবস্তু হিসাবে আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই।[২৬] অধ্যাপক চারবাস্কি এ'বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার কোরে বলেন যে, পুদ্‌গলকে অপরাপর সম্প্রদায় যে আত্মা হিসাবে গণ্য করেন, আসলে তা সংস্কার ও সংস্কারসন্তান ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর স্থায়িত্বও কিছুমাত্র নেই; একে অনাত্মাই বলা উচিত।[২৭]

আমরা আগেই বলেছি যে, আচার্য অশ্বঘোষ আত্মা তথা অত্তার অস্তিত্ব স্বীকার

২২। (ক) ডাঃ এন্. কে. দত্ত: 'এ্যাস্পেক্টস্ অব মহাযান-বুদ্ধিজিম্ এ্যাণ্ড ইট্স্ রিলেসান টু হীনযান' (১৯৩০), পৃঃ ১৪১

(খ) ডি. টি. সুজুকী: 'আউটলাইনস্ অব মহাযান-বুদ্ধিজিম্' (১৯০৭), পৃঃ ৪১-৪২

২৩ 'সোল থিওরি অব দি বুদ্ধিষ্ট', পৃঃ ৮৪৩

২৪ অধ্যাপক চার্‌বাস্কি: 'কন্‌সেপ্‌সন্ অব নির্বাণ', পৃঃ ৮

২৫ ডাঃ মুখার্জি: 'দি বুদ্ধিষ্ট ফিলজফি অব ইউনিভার্সাল্ ফ্লাক্স', পৃঃ ১৮৫—১৮৮

২৬ ডাঃ এন্. কে. দত্ত: 'এ্যাসপক্টস অব মহাযান বুদ্ধিজিম্ এ্যাণ্ড ইটস্ রিলেসান টু হীনযান,' পৃঃ ১৪৩-১৪৪

২৭ অধ্যাপক চার্‌বাস্কি: 'কন্‌সেপ্‌সান্ অব নির্বাণ', পৃঃ ৮

করেছেন। তিনি তাঁর 'মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' বইয়ে আত্মার দু'রকম ধারণা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: প্রথম—ব্যক্তিগত আত্মার (জীবাত্মার) অস্তিত্বে বিশ্বাস, দ্বিতীয়—যথার্থ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস।[২৮] কিন্তু নাগার্জুন তার 'মাধ্যমিককারিকা'-য় আত্মার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। অধ্যাপক সুজুকি (D. T. Suzuki) বলেছেন, বৌদ্ধ দার্শনিকেরা আত্মা শব্দটি যে কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেই জীবাত্মা (soul, self or ego) অর্থে ব্যবহার করেন তা নয়, বিচারের দিক থেকেও বস্তু, বিষয় অথবা অসত্তা হিসাবে ব্যবহার করেন এবং সেই সেই দিক থেকে আত্মা বা সত্তাবস্তুর অস্তিত্বকেও তাঁরা অস্বীকার করেন।[২৯] মহাযান বৌদ্ধধর্মে আত্মার পরিবর্তে 'স্বভাব' এই শব্দটিরও ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু এই স্বভাবের অর্থ শূন্য, কেননা তাঁরা বলেন: 'সর্বং ধর্মং নিঃস্বভাবম্', অর্থাৎ স্বভাব বা আত্মা বোলে কোন বস্তুর সত্তা নাই।[৩০]

অধ্যাপক যামাকামি সোগেন (Prof. Yamakami Sogen) বলেছেন যে, শীলভদ্রের গুরু ধর্মপাল 'বিজ্ঞানমাত্রশাস্ত্র' বইয়ের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: আত্মা শব্দটি মহান্ বা বিরাটাত্মা, মুক্তি, অনন্ত ও পরম-ঐক্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তীর্থংকরগণ এই আত্মসত্তাকে তিন রকম ভাবে বিশ্বাস করেন: (১) পঞ্চস্কন্ধ থেকে উৎপন্ন শরীর অর্থে (২) পঞ্চস্কন্ধ থেকে মুক্ত পরমার্থ 'সত্তা' অর্থে (৩) পঞ্চস্কন্ধ থেকে সমানও নয়, ভিন্নও নয় এরকম অর্থে।[৩১] 'প্রাজ্ঞপারমিতাসূত্র' বইয়ে আছে: "তথাগত কখনও শিক্ষা দিতেন যে, আত্মা আছে, আবার কখনও বল্তেন আত্মা নাই। এর অর্থ এই যে, তথাগত যখন আত্মা আছে বলেছিলেন তখন তিনি শূন্যবাদ বা উচ্ছেদবাদ খণ্ডন করেছিলেন, আবার যখন তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আত্মা নাই তখন তিনি অনন্তত্ব বা শাশ্বতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই দুটি তত্ত্বের কোন্‌টি সত্য? প্রকৃতপক্ষে আত্মার নিষেধই তথাগতের অভিপ্রেত।"[৩২] 'মহাযানবিংশিকম্' বইয়ে নাগার্জুন উল্লেখ করেছেন: "তত্ত্বেনানাত্মনি প্রত্যগ্‌জ্ঞানেনাত্মা বিকল্পিত", অর্থাৎ পার্থিব গুণগুলি দ্বারা যদি আত্মাকে বিশেষিত করা হয় তবে তা যথার্থ আত্মা নয়, অনাত্মাই।[৩৩] শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা তাই আত্মার দুঃখ, কষ্ট, বাসনা, শক্তি প্রভৃতির ধারণাকে কাল্পনিক বা মিথ্যা বলেন। নাগার্জুনও বলেছেন: "অনাত্মানস্ততো ধর্মা", সুতরাং সমস্ত জিনিসই আত্মা-বিবর্জিত।[৩৪]

২৮। অধ্যাপক সুজুকী কর্তৃক 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র'-এর ইংরেজী অনুবাদ 'দি এ্যাওয়েকেনিঙ্ অব ফেথ' (১৯০০), পৃঃ ২৮-২৯, এবং পৃঃ ১০৬

২৯। সুজুকি: 'আউট্‌লাইনস্ অব মহাযান বুদ্ধিজিম্', পৃঃ ১৭০

৩০। ঐ, পৃঃ ১৭১

৩১। সোগেন: 'সিষ্টেমস্ অব বুদ্ধিষ্টিক্ থট্' (১৯১২), পৃঃ ১৭

৩২। ঐ, পৃঃ ১৮-১৯

৩৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী সংপাদিত 'মহাযানবিংশিকম্' (বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি), ৮ম ভাগ, ১ম+২য় অংশ, পৃঃ ১১৭

৩৪। ঐ, পৃঃ ১১৮

ধর্মাপালাচার্য তাঁর 'বিজ্ঞানমাত্রশাস্ত্র' বইয়ে লিখেছেন, আত্মা (জীবাত্মা) ও ধর্মের (সংসারের) অস্তিত্ব পবিত্র ধর্মসংহিতায় সাময়িক ও আপেক্ষিক ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, ঠিক সত্য ও নিত্য স্বভাবসম্পন্ন-রূপে তাকে চিন্তা করা হয় নি। পালিবিধির 'সমুত্তনিকায়' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে: যখন কোন এক অবৌদ্ধ আচার্য বুদ্ধদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—পুরুষের (আত্মার) অস্তিত্ব আছে কি-না, তখন বুদ্ধদেব কোন উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন। আচার্য বসুবন্ধু তাঁর 'অভিধর্মকোষশাস্ত্র'-এর ভাষ্যে এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। 'মাধ্যমিকশাস্ত্র'-এর ওপর ভাষ্য লিখতে গিয়ে নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেবও একথা উল্লেখ করেছেন যে, বুদ্ধদেব নিজেই কোন সময়ে আত্মসত্তা অস্বীকার করেছেন, আবার কোন সময়ে বা স্বীকারও করেছেন। অধ্যাপক সোগেন বলেন: বৌদ্ধধর্মীদের কাছে শরীর থেকে ভিন্ন আত্মার ধারণা মরীচিকার মতন মিথ্যা। মহাযানসূত্র 'আর্যনৈরাত্মাপরিপৃচ্ছা' বইয়ে দেখা যায়—যখন আত্মার অনস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে তখন মহাযানীরা বলেছেন: আত্মা আছে কি—নাই এই দুটির কোনটাই আমরা জানি না, কেননা আত্মা যদি থাকে তবে দেহকে টুক্‌রো টুক্‌রো করলে আত্মাকে দেখা যায় না কেন? "কুলপুত্র সর্বজ্ঞেনোক্তং যৎ কায়ে নাত্মেতি। * * মহাযানিকা আহুঃ। অস্ত্যায়ম্ভতঃ কায়ে ভূতাত্মেতি নাস্তি বেত্যুভয়মপীহ ন বক্তব্যম্। অস্তি ভূতাত্মেত্যুক্তৌ নাস্তীত্যুক্তির্বিরুদ্ধোচ্যতে। * * তেন নাস্তীত্যপি ন যুক্তম্। এবমস্তি বা নাস্তি বেতি চ ন ব্যক্তব্যম্।"[৩৫] মহাযানীরা সুস্পষ্টভাবে বলেন: "নিরাত্মকমনিত্যঞ্চ মায়ামরীচিকাসমম্'। বৌদ্ধদের আগে ধূর্ত ও শিক্ষিত চার্বাকসম্প্রদায় বর্তমান মার্ক্সবাদীদের মতন দেহ ব্যতিরিক্ত চেতন আত্মার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন।

আচার্য শংকর অদ্বৈতদৃষ্টি থেকে আত্মাকে বলেছেন শুদ্ধচৈতন্য, তবে মায়ার আবরণে জীবাত্মা-রূপে যে বিকাশ তার ব্যবহারিক সত্তামাত্রই থাকে, পারমার্থিক সত্তা বিন্দুমাত্র নাই। তিনি ব্রহ্মসূত্রের 'জ্ঞোঽত এব' (২।৩।১৮) সূত্রের ভাষ্যে ব্যষ্টি আত্মাকেও চৈতন্যস্বরূপ বলেছেন। তাঁর বিপক্ষ বৈশেষিক মতাবলম্বী সে কথায় আপত্তি তুলে বলেছেন: 'আত্মাকে সুষুপ্তির অথবা মূর্ছার অবস্থায় যখন চৈতন্যস্বভাবে দেখা যায় না তখন তাকে অপ্রকাশ জড়স্বভাব বলাই উচিত। তবে জাগ্রত অবস্থায় মনের সংস্পর্শে এলে সে (আত্মা) চৈতন্যবান হোতে পারে সত্য, কিন্তু তাও সকল সময় নয়'। আচার্য শংকর তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৪।৩।২৩) থেকে নজির তুলে প্রমাণ করেছেন—আত্মা কখনই অচেতন জড়স্বভাব নন, তিনি স্বয়ংজ্যোতি, জ্ঞানস্বরূপ এবং স্বভাবতই চেতন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনের কোন অবস্থায়ই আত্মার চৈতন্য নষ্ট হয়

৩৫। (ক) শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংপাদিত 'নৈরাত্মাপরিপৃচ্ছা' ('বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'), ৮ম ভাগ, ১+২ অংশ, পৃঃ ১৭৯

(খ) ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়: 'দি ইগো ইন বুদ্ধিষ্ট ফিলজফি' ('মহাবোধি' জার্নাল), ৪৯ ভাগ, অংশ ৩, মার্চ ১৯৪১, পৃঃ ৮১ এবং 'বুদ্ধিষ্ট ফিলজফি অব দি ইউনিভার্সাল্ ফ্লাক্স্'

না, সুষুপ্তিতে তিনি কারণ ও অব্যক্ত রূপে থাকেন, এবং বরং জ্ঞান ও চৈতন্যের সেখানে পূর্ণবিকাশ।[৩৬]

অনেকে জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্ন তুলে আত্মাও যে জন্ম-মরণশীল তা প্রমাণ করতে চান। তার উত্তরে আচার্য শংকর বলেছেন: আত্মার কখনো জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, জন্ম-মৃত্যু হ্রাস-বৃদ্ধি এ' সমস্ত পার্থিব দেহের; দেহের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে বোলে আমরা সেই কল্পনাটি শাশ্বত আত্মার ওপর আরোপ কোরে ভুলবশত বলি যে, আত্মার জন্ম-মৃত্যু আছে। আসলে জীবাত্মা বা জীব নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ। যতক্ষণ পার্থিব দেহ, বুদ্ধি, মন প্রভৃতির সাথে তার ঔপচারিক সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ ঘটাকাশ ও মহাকাশের মতন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করা হয়।[৩৭] আচার্য শংকরের মতে জীবও বিভু, অণু নয়, চিৎ-অচিৎ নয়, কেননা জীব নির্বিকার আত্মাই।

আচার্য শংকরের পূর্ব ও পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণ আত্মার দিব্যসত্তা স্বীকার করেছেন। আচার্য আশ্মরথ্য আত্মা বল্‌তে জীবাত্মা বলেছেন ও আগুনের কণার সাথে আগুনের কুণ্ড যেমন ভিন্নও নয়—অভিন্নও নয়, তেমনি আত্মা তথা জীবাত্মা শুদ্ধচৈতন্য পরমাত্মা থেকে পৃথকও নয়, আবার অপৃথকও নয়।[৩৮]

আচার্য উড়ুলোমির আত্মা সম্বন্ধে মতবাদ অনেকটা শৈব ও পাঞ্চরাত্রীয় মতবাদের মতন। তিনি ভেদাভেদবাদী, সুতরাং তাঁর মতে আত্মা বা জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম থেকে পৃথক ও অপৃথক দুইই। যতক্ষণ পার্থিব দেহবান ততক্ষণ আত্মা বদ্ধ ও দুঃখভাগী —"জীবোহি পরমাত্মনোহত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যপধানসম্পর্কাৎ সর্বদা কলুষঃ," কিন্তু মুক্ত অবস্থায় আত্মা নিষ্পাপ ও সর্ববন্ধনবিহীন, তখন আত্মা চৈতন্যই।[৩৯] আচার্য কাশকৃৎস্ন আত্মার চৈতন্যস্বভাব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নাই।[৪০] আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চের মতে আত্মা তথা জীবাত্মা বিজ্ঞানময়, জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, সুতরাং সসীম; যথার্থজ্ঞান হোলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়।[৪১] এ' ছাড়া ভর্তৃহরি, সুন্দরপাণ্ড্য, বোধায়ন, উপবর্ষ, দ্রবিড়াচার্য, গুহদেব,

৩৬। ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।১৮ ভাষ্য: "স কিং কনভুজানামিবাগন্তুকচৈতন্যঃ, স্বতোঽচেতনঃ, আহোস্বিৎ-সাংখ্যানামিব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ এবেতি বাদিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। * * নিত্যচৈতন্যত্বে হি সুপ্তমূর্ছিতগ্রহাবিষ্টানামপি চৈতন্যং স্যাৎ। * * সুষুপ্তং প্রকৃত্য 'যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি, ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্—দ্বিতীয়ম'স্ত ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ (বৃহ ৪।৩।২৩) ইত্যাদিনা।"

৩৭। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৬, ২।৩।১৭-এর শংকরভাষ্য ও ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী: 'বেদান্তদর্শন —অদ্বৈতবাদ' (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৪৪-১৪৫

৩৮। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।৪।২০) আচার্য শংকর যে আশ্মরথ্যের মতবাদ সামান্যভাবে উল্লেখ করেছেন তা দ্রষ্টব্য।

৩৯। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২০; ১।৪।২১; ভামতী ১।৪।২১

৪০। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।৪।২২

৪১। ডাঃ শাস্ত্রী: 'অদ্বৈতবাদ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০—১৬২

টংক, ভারুচি, কপর্দী প্রভৃতি বেদান্তাচার্যেরা আছেন যাঁদের আত্মা সম্বন্ধে মতবাদ পাওয়া যায়, আবার অনেকের পাওয়া যায় ও না।[৪২]

আত্মা সম্বন্ধে আচার্য গৌড়পাদের অভিমত আচার্য শঙ্করেরই অনুরূপ। তিনি জীবাত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থা অথবা বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর বা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটি পাদের কল্পনাকে মিথ্যা বলেছেন। সাধারণভাবে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জীবের ধারণার জন্যেই এই সকল কল্পনা করা হয়, আসলে তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটচৈতন্য আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপই। তাছাড়া জীব কল্পিত। অন্ধকারে দড়ি যেমন সাপ বা জলধারার মতন মনে হয়, তেমনি ভ্রমের জন্যে জীবও কল্পিত। তাই গৌড়পাদ তাঁর কারিকায় (২।১৭) বলেছেন: "অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা, সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতম্"। আচার্য শংকর এর ভাষ্যে আলোকপাত করেছেন: "তদ্ধেতুফলাদি-সংসারধর্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধবিজ্ঞপ্তিমাত্রসত্তাদয়রূপেণ * * বিকল্পিতঃ"; অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তারূপী আত্মাকে জানা না থাকাতেই জীব প্রাণাদি অনন্তপ্রকার ভেদে বিকল্পিত হয়।

শংকর-শিষ্য পদ্মপাদাচার্যের মতে আত্মা, জীবাত্মা বা জীব শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব, পরমেশ্বর তথা স্বয়ংজ্যোতি ব্রহ্ম বিম্ব। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, সুতরাং জীবাত্মা আসলে পরমাত্মা ব্রহ্মই।[৪৩] পদ্মপাদাচার্য বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেছেন, তাই জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তা এইভাবে তিনি নির্ণয় করেছেন। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে আপাততঃ যে জীব-ঈশ্বর-ভেদ তা ঔপাধিক বা ঔপচারিক, সুতরাং ভেদ মিথ্যা। আত্মা সম্বন্ধে আচার্য প্রকাশাত্মযতির অভিমতও তাই। মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্যও[৪৪] আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেছেন। ইনিও বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন; তাই ভেদবুদ্ধির জন্যে প্রতিবিম্ব যেমন বিম্ব থেকে পৃথক বোলে মনে হয়, তেমনি জীবাত্মাও ব্রহ্মচৈতন্য থেকে আলাদা বোলে কল্পিত হয়। অজ্ঞানের জন্যে ভেদ কল্পিত হওয়া স্বাভাবিক। টীকাকার শংখপাণি তাই লিখেছেন: "পরমার্থেন অভিন্না অপি ব্রহ্মণো কল্পনয়া মিথ্যাবুদ্ধ্যা বিশ্বপ্রতিবিম্বশ্চন্দ্রবচ্চ ততো ভিদ্যন্তে; এবঞ্চ ভেদমাত্রমত্র কাল্পনিকম্"। সুরেশ্বরের মতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জীব ও বিশ্ববৈচিত্র্য-রূপে বিবর্তিত হন। তিনি দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ স্বীকার করেন বোলে তাঁর মতে ব্রহ্মরূপী জীবের দৃষ্টিতেই জগৎ সৃষ্টি হয়; অহং-অভিমান এই সৃষ্টির মূলে থাকে।

৪২। ঐ পৃঃ ১৬০—১৬৮

৪৩। (ক) পঞ্চপাদিকা। (খ) ডাঃ দাশগুপ্ত: 'এ হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি,' ২য় ভাগ, পৃঃ ১০২; (গ) ডাঃ শাস্ত্রী: 'অদ্বৈতবাদ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪—২৩৬

৪৪। মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্য এক ব্যক্তি কি ভিন্ন, এ' নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী 'ব্রহ্মসিদ্ধি' বইয়ের ইংরেজী ভূমিকায় "* * and to exhibit Mandana and Suresvara as two different individuals" বোলে মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বর যে পরস্পর ভিন্ন লোক এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। অবশ্য মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীজী অধ্যাপক হিরণ্যের অভিমতই গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক হিরণ্য

ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন: আত্মা চৈতন্যময়, তবে জড় ও চৈতন্যের অবিবেকবশত আত্মা-রূপে ব্রহ্ম বোলে প্রতীত হয় না।[৪৫] সংক্ষেপশারীরিককার সর্বজ্ঞাত্ম মুনিও আত্মার প্রসঙ্গে বলেছেন, আত্মা ব্রহ্মচৈতন্যই, তবে অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির জন্যে জীবাত্মার আকারে তিনি কল্পিত হন। ইষ্টসিদ্ধিকার বিমুক্তাত্মনের অভিমতে আত্মা জীব নন, আত্মা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। অবিদ্যাই ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি কোরে বন্ধনবিরহী আত্মাকে সংসারাবদ্ধ জীবাত্মা বোলে প্রতীত করায়। এছাড়া শ্রীহর্ষ, আনন্দবোধ, অদ্বৈতানন্দ, চিৎসুখাচার্য, অমলানন্দ, ভারতীতীর্থ, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর, আনন্দজ্ঞান, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, অপ্পয়দীক্ষিত, সদানন্দ, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্ত-মতাবলম্বীদের মতেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা তথা জীবকে পরমাত্মার অংশ বলেছেন। আসলে তিনি পুরুষোত্তম ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিনটি সত্তা স্বীকার কোরে আত্মাকে সকলের থেকে ভিন্ন আবার বিশিষ্ট সম্পর্ক যুক্তও বলেছেন। নিম্বার্ক ব্রহ্ম থেকে আত্মার তথা জীবাত্মার ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেছেন। মধ্বাচার্য আত্মাকে পুরুষোত্তম ভগবানের অধীন বোলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকণ্ঠ বেদান্ত-সূত্রের শৈবভাষ্যে আত্মা বা জীবাত্মাকে সংসারাবদ্ধ ও শিবের সম্পূর্ণ অধীন বোলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকরাচার্যের অভিমতও অনেকটা তাই। প্রত্যভিজ্ঞাবাদী অভিনব গুপ্ত আত্মাকে শিবস্বরূপই বলেছেন, কিন্তু আত্মা অজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা-রূপ মুক্তি লাভ করার জন্যে আত্মার (জীবাত্মার) প্রত্যভিজ্ঞা তথা জ্ঞানদৃষ্টির প্রয়োজন। বীরশৈবদর্শনে বা শৈবসিদ্ধান্তে আত্মাকে (জীবাত্মাকে) সকল, প্রলয়াকল ও বিজ্ঞানকল এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আত্মা অনন্ত ও ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৪৫]

'জার্নাল অব রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি' (এপ্রিল ১৯২৩ এবং জানুয়ারী ১৯২৪) পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শৃঙ্গেরীমঠের 'গুরুবংশকাব্য' গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বর যে এক ব্যক্তি নন—আলাদা, তার স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর 'এ হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (২য় ভাগ, পৃঃ ৮৬) বইয়ে এ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন: "It may therefore be concluded that Mandana the author of the *Brahmasiddhi* was not the same person as Suresvara, unless we suppose that Mandana was not only *Mimânsâ* writer, but also a Vedanta writer of great repute and that his conversion by Sankara meant only that he changed some of his views and accepted those of Sankara, and it was at this stage that he was called Suresvara." অধ্যাপক জেকবি সম্প্রদায়গত অভিমতই পোষণ করেছেন। কিন্তু ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রীর মতে মণ্ডন মিশ্র ও সুরেশ্বর একই ব্যক্তি। তিনি বলেছেন যে, 'শংকরদিগ্‌বিজয়' গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর উভয়কেই এক ব্যক্তি বোলে প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেছেন—'শংকরবিজয়বিলাস' গ্রন্থে চিদ্‌বিলাসের মতেও মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি।

৪৫। ডাঃ দাশগুপ্ত: 'এ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি,' ২য় ভাগ, পৃঃ ১০৬

৪৬। (ক) ডাঃ এস. সি. নন্দীমথ: 'এ হ্যাণ্ডবুক অব বীরশৈবিজিম্' (১৯৪২), পৃঃ ১৪৯

কাশ্মীরতন্ত্রে তথা ত্রিকদর্শনে আত্মাকে পরমশিবের অধীন বোলে আলোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তার মতে পরাৎপরব্রহ্ম থেকে বিচ্ছুরিত হোয়ে আত্মার সৃষ্টি।

আত্মা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "সাধারণতঃ 'সেল্‌ফ' (self) শব্দটি আমরা 'ইগো' (জীবাত্মা) অর্থে ব্যবহার করি। 'ইগো' বা জীবাত্মাই ক্রিয়ার কর্তা, মন্তা ও দ্রষ্টা। যার দ্বারা আমাদের শরীর ও মনের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয় তাকে আমরা 'আমি' বা জীবাত্মা বলি, কিন্তু জীবাত্মা সর্ববুদ্ধি ও চৈতন্যের কারণ পরমাত্মা-রূপী ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। আমাদের শরীরের মধ্যে যে দিব্য-অগ্নিশিখা-রূপ জীবনীশক্তি দান কোরে শারীরিক ও মানসিক কার্যগুলিকে পরিচালিত করে, জীবাত্মা তারই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ তুল্লে আমরা নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর আত্মাই কেবলমাত্র বুঝ্‌ব না, পরমাত্মারূপী ব্রহ্মচৈতন্যকেও বুঝ্‌ব।"[৪৭]

স্বামী অভেদানন্দ আত্মার দুটি বিকাশ স্বীকার করেছেন: (১) জীবাত্মা—যিনি শরীরবান ও সাংসারিক বিকারের অধীন; (২) পরমাত্মা বা শুদ্ধব্রহ্ম যাতে দেশ, কাল ও নিমিত্ত-রূপ মায়ার পরিচ্ছিন্নতা নাই। তিনি বলেছেন: "পরমবস্তু বা ব্রহ্ম দেশ ও কালের বাইরে, তাই তাঁর কোন আকার, শরীর বা বিকার নেই। ব্রহ্ম যখন ব্যষ্টি চেতনসত্তা-রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন তাঁকে আমরা বলি জীবাত্মা। পার্থিব আপেক্ষিক জ্ঞানের বিষয় জড়পদার্থ-রূপেও তিনি বিকশিত হন, কিন্তু ব্রহ্ম জড়পদার্থও নন বা জীবাত্মাও নন, তিনি এদের অধিষ্ঠান-রূপী পরমাত্মা।"[৪৮] স্বামী অভেদানন্দ পুনরায় বস্তুতন্ত্রবাদীদের মতবাদ খণ্ডন কোরে বলেছেন: 'আত্মা স্নায়বিক কোন ক্রিয়ার পরিণতি বা মস্তিষ্কের কার্য নন; মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-কেন্দ্রের কম্পনে চৈতন্যরূপী আত্মার সৃষ্টি হয় না। বেদান্তের সিদ্ধান্তও তাই। আত্মা সর্বজ্ঞানের আধার; জাগতিক আপেক্ষিক জ্ঞানমাত্রেই আত্মজ্ঞানের আংশিক বিকাশ-মাত্র'। আত্মজ্ঞানকে তিনি ঈশ্বর অপেক্ষাও উচ্চাসন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "Which is higher, the personal God or the Self? The Self is higher, because it illumines the existence of God."[৪৯]

স্বামী অভেদানন্দ আত্মা ও অস্তি বা সত্তাকে (চিৎ ও সৎ-কে) অভিন্ন বলেছেন। ব্রহ্মকে কেবল বুদ্ধি দিয়ে বোঝার জন্যে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ), আসলে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি গুণ পরস্পর-ভিন্ন নয়। বিকাশ হিসাবে তারা আলাদা বোলে প্রতীয়মান হোলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা জানি যে, ঐ তিনটি বিকাশ একটি মাত্র বস্তু অদ্বিতীয় ব্রহ্মের। তিনি আবার বলেছেন: "আত্মজ্ঞানরূপ চিৎ ও সৎ এক এবং অভিন্ন। যেমন, আমরা জানি যে, এই জায়গায় আমরা আছি,

(খ) এস. শিবপদসুন্দরম্: 'দি শৈব-স্কুল অব হিন্দুইজম্' (১৯৩৪), পৃঃ ৮৮—১০০

৪৭। অভেদানন্দ: 'সেল্‌ফ-নলেজ' (১৯৪৪), পৃঃ ২৩

৪৮। ঐ, পৃঃ ২৪

৪৯। ঐ, পৃঃ ১২০

কিন্তু যদি কোন মুহূর্তে 'এই জায়গায় আছি' এই কথা ভুলে যাই, যদি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা ও চতুপার্শ্বস্থ স্থানের সম্পর্কে আমরা বিস্মৃত হই, তাহোলে আমরা যেন নাই একথাই মনে হয়। সুতরাং যদিও আমরা সত্তা (সৎ) থেকে আত্মজ্ঞানকে (চিৎকে) আলাদা করতে চেষ্টা করি, তথাপি তা পারি না, কেননা শুদ্ধজ্ঞান বা চৈতন্য ও সত্তা (সৎ) অভিন্ন।"[৫০] আনন্দ সম্বন্ধেও তাই, কারণ চৈতন্য ও সত্তা (চিৎ ও সৎ) যেখানে থাকবে, দিব্যসুখ বা আনন্দও সেখানে থাকবে। তিনি লিখেছেন:

"Vedanta gives these two attributes to the absolute self, who is the director of the mind. The first is absolute existence, in Sanskrit *sat*, and the second is absolute knowledge or intelligance, *chit* in Sanskrit. These two, as we have already seen, are one and inseparable. A third attribute, however, is also given in Vedanta. It is called in Sanskrit *ânanda*, meaning pure happiness or blissfulness. Where absolute knowledge and absolute existence prevail, there is also absolute happiness or blissfulness" [৫১]

পার্থিব জ্ঞান ও অনুভূতি কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের অভিমত আমরা এই বইয়ের গোড়ায় আলোচনা করেছি। তিনি বিষয়ী-মনকেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"Subjective mind is that medium through which the objective mind, which is directly connected with the brain and with the external world, through the gateway of the sense-organs, receives intelligence from the soul. The objective mind in turn comes in touch with the external world and gives the 'sense manifold.' The sense manifold as such is without 'sense' or meaning. It is the subjective mind which gives sense or meaning to the sense data".[৫২]

মোটকথা তিনি মনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: একটি বিষয়ী-মন (subjective mind) ও অপরটি বিষয়-মন (objective mind); কিন্তু এই ভাগ সত্য নয়। আসলে মন একটি, ব্যবহারিক কাজের জন্যে দুটি ভাগ কল্পনা করা হয় মাত্র। দৃষ্টি দ্রষ্টা, কার্য কর্তা, মনন মন্তা এই দুটি দুটি বিকাশ বা অবস্থা নিয়েই বিষয় ও বিষয়ী-ভাগের সৃষ্টি। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "The mind with these two phases subjective and objective was produced primarily for the use of the soul, as its instrument. Though it can be divided into two parts. apparantly, in reality, there is only one mind."[৫৩] মনের বিষয় ও বিষয়ী-ভাগকে তিনি মনের দুটি অবস্থা বলেছেন; একটির যোগাযোগ থাকে আত্মার সাথে ও অপরটির মস্তিষ্কের

৫০। অভেদানন্দ: 'সেল্‌ফ-নলেজ' (১৯৪৪), পৃ: ১২২

৫১। অভেদানন্দ: 'সেল্‌ফ-নলেজ', পৃ: ১২৩

৫২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট' (১৯৪৬), পৃ: ৭

৫৩। ঐ, পৃ: ৭

সাথে: "It has a subjective *state* and an objective *state*. The subjective state is in close touch with the soul, and the objective state is in close touch with the brain".

সংবেদন (sensation) কি ভাবে হয় তার প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: আমরা জানি যে, শরীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনোবিজ্ঞান মনের অবস্থা বা বিচিত্র বিকাশ সম্বন্ধেই কেবল আলোচনা করে, আর সেজন্যে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সে অধীন। জ্ঞান বা চৈতন্যকেও সে মস্তিষ্কের কার্য বলে। বর্তমান ব্যবহার বা আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানকে (Behaviouristic Psychology), আমরা স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কেরই একটি শরীর-ব্যবচ্ছেদের বিকাশ বলতে পারি।[৫৪] ব্যবহার বা আচরণবাদীরা ব্যাঙ, পায়রা, মেষ, বানর ও মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ কোরে দেখেছেন—শিরা বা তন্ত্রীগুলি মস্তিষ্কের ধূসরবর্ণ পদার্থে (grey matter) বা মস্তিষ্কের চর্মে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই জায়গাটিকে তাঁরা মনের স্থান বোলে সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী বা নাড়ী মস্তিষ্কের চর্মে গিয়ে শেষ হয়েছে। আমাদের চামড়ার প্রত্যেকটি অণুকোষে অতিসূক্ষ্ম সূতার মতন এক একটি স্নায়ুতন্ত্রী আছে। সেই তন্ত্রী মেরুদণ্ডে অবস্থিত প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সাথে যুক্ত আছে; মস্তিষ্কের ধূসরবর্ণ পদার্থের সাথেও তাদের যোগাযোগ আছে। সুতরাং যখনি কোন সংবদনের সৃষ্টি হয়, তখনি তা এই সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে আসে ও যেকোন উদ্দীপনা পেয়ে স্নায়ুতন্ত্রীগুলি আন্দোলিত হয় ও যতক্ষণ পর্যন্ত না মস্তিষ্কের চর্মকোষগুলিতে পৌছায় ততক্ষণ ঐ আন্দোলন বা উদ্দীপনা স্রোতের মতন স্নায়ুতন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়।

সংবেদন বা বাইরের বিষয়ের যে কম্পনগুলি স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়া আসে তাদেরকে ইঙ্গিত (suggestion) মাত্রই বলা যায়। ঐ ইঙ্গিতগুলি স্নায়ুতন্ত্রীগুলির ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে যায়। কিন্তু মস্তিষ্কের গোলার্ধদুটি সংবেদনের প্রতীক্ষায় কাজ করে এবং ঐ প্রতীক্ষা বা প্রত্যাশা যে কোন উপায়ে অনুভূত হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর স্নায়ুকেন্দ্র আছে, ঐ কেন্দ্রগুলি কেবল বর্তমান বাইরের বিষয়ের উদ্দীপনাকে অবলম্বন কোরে কাজ করে। কেন্দ্রগুলি প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুতন্ত্রী-প্রবাহেরই সংবেদন, অথবা তার কম্পন গ্রহণ করে, কিন্তু মস্তিষ্কের গোলার্ধদুটির অথবা ওপরের ধূসরবর্ণ পদার্থের কাজ তা থেকে ভিন্ন। এখানে মনেরই রাজত্ব, বাইরের পরিবেশ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মস্তিষ্কের গোলার্ধদুটিই ভাব, সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির স্থান। এগুলি নিম্নশ্রেণীর পশুদের মস্তিষ্কে বিকশিত হয় না। ব্যবহার বা আচরণবাদী (Behaviouristic) মনোবৈজ্ঞানিকেরা পায়রা, ব্যাঙ, মেষ ও বানরের মস্তিষ্কের গোলার্ধদুটিতে অস্ত্রোপচার কোরে পরীক্ষা

৫৪। ব্র্যাণ্ড ব্লান্‌শার্ড বলেছেন: "Behaviourism sprang from the two chief sources a disillusionment with introspection as a means for studying the human mind, and the reassuring success of an opposite method of studying the animal mind."—'দি নেচার অব থট্' (১৯৪৮), ১ম ভাগ, পৃঃ ৩১৩

করেছেন। মস্তিষ্কের গোলার্ধদুটি যদি নষ্ট হোয়ে যায় তাহোলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কাজ চলতে থাকে, কিন্তু তখন আর ভাব, সহজাত প্রবৃত্তি বা বুদ্ধির বিকাশ থাকে না। * * * বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের (Analytic Psychology) মতে সংবেদনের ধারণা ও সমস্ত পেশীসংক্রান্ত কার্য উপাদান-রূপে মনকে গড়ে তোলে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানের (Modern Psychology) মতেও মন সংবেদনের সমষ্টি।

সংবেদন বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি ইঙ্গিত যেগুলি চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বাইরের জগতে আসে। ইঙ্গিতগুলি গোড়াকার দিকে জ্ঞান বা চৈতন্যের আকারে প্রকাশ পায় না। প্রথমে তারা থাকে স্নায়ুতন্ত্রী ও মস্তিষ্কের মধ্যে আণবিক কম্পনের রূপে। তার পরেই আসে সংবেদনের ধারণা। বর্তমান (মডার্ণ) মনোবিজ্ঞানে তাদের নাম প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি (apperceptions, perceptions or conceptions)। প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় আণবিক কম্পনের পরে; প্রথমে তারা থাকে গতির বা স্পন্দনের আকারে। এই গতি বা স্পন্দনের ধারণাই মনকে সৃষ্টি করে। আমরা আগেই অন্তর্বাহী (afferent or sensory) ও বহির্বাহী (efferent or motor) স্নায়ুতন্ত্রী দুটির কথা বলেছি। বর্তমান বিজ্ঞানের অনুসারে যেকোন ভাবের প্রবাহ অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে মস্তিষ্কে যায়, অর্থাৎ শরীরের ওপরে ছড়ানো বাহ্যবস্তুর জ্ঞানবাহী স্নায়ু-তন্ত্রীগুলি সংবেদন বহন করে। এদের প্রবাহ বা উদ্দীপনা (stimuli) আঘাত দেয়। যদি আমারা চামড়ার কোনও জায়গায় চাপ দেই তবে সেই চাপই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ঐ উদ্দীপনাই এক রকমের ইঙ্গিত যা স্নায়ুতন্ত্রীদের ভিতর একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে। ঐ প্রবাহ মস্তিষ্কে যায় ও প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মস্তিষ্কে অপর একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে। যে প্রবাহটি মস্তিষ্কে যায় সেটি সেখানকার সমস্ত শৃঙ্খলাকে স্পন্দিত বা বিচলিত কোরে দেয়। মস্তিষ্কের অণুকোষগুলি তন্ত্রীর দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত। সেই সূক্ষ্মতন্ত্রীদের ভিতরে যে ছিদ্র আছে তার ভিতর দিয়া স্নায়ুতন্ত্রীস্রোত প্রবাহিত হয় এবং সেই স্রোত বা ধারাগুলিও পরস্পর-সংবদ্ধ—একটি অপরটিকে উদ্দীপিত করে। সুতরাং মস্তিষ্কের একটি স্থানে সংবেদন সৃষ্টি হোলে অপরাপর স্থানের অথবা অণুকোষের সাথেও তার যোগাযোগ হয়, কিন্তু পরস্পর-সংবদ্ধ হোলেও কিভাবে সংযুক্ত ও কি প্রণালীর ভিতর দিয়ে ভাবাধারার সংমিশ্রণ হয় সে সবের কোন খবরই বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের (Analytic Psychology) সাধকেরা দিতে পারেন না। তাঁরা যান্ত্রিক বা গতানুগতিক (mechanical) মতবাদের সাহায্যে সমস্ত-কিছুর ব্যাখ্যা করতে চান, কিন্তু তথাপি তাঁরা তা পারেন না, কেননা একজন প্রাণবান মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর কি ঘটনা ঘটে তা তাঁরা মোটেই জানেন না। তারপর ঐ সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীয় প্রবাহ মস্তকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয় ও তখনি নীচেকার দিকে ছুটে সেগুলি পেশীতে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত প্রণালীটিই স্বাভাবিকভাবে ঘটে। একেই বলে অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়া (reflex action); কেবল স্নায়বিক উত্তেজনাই এর পিছনে থাকে। মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যখনি ঐ প্রবাহ অণুকোষের সূক্ষ্ম-পরমাণুগুলিকে মস্তিষ্কের মধ্যে বহন কোরে নিয়ে যায়, তখনি তারা এক ধরণের বৈদ্যুতিক স্ফোটন (explosion) সৃষ্টি করে। সেই স্ফোটন থেকেই জ্ঞান বা চেতনার সৃষ্টি হয়। সেই স্ফোটনের কাজ চলতেই থাকে ও

তাথেকে আর একটি বৈদ্যুতিক বা স্নায়বিক প্রবাহ আপনা-আপনি পেশীগুলিতে উপস্থিত হয়।[৫৫]

চিত্তবৃত্তি (emotion) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: বর্তমান মনোবৈজ্ঞানিকেরা চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন, কিন্তু কিভাবে তারা মনের মধ্যে রূপায়িত হয় তার সঠিক খবর তাঁরা দিতে পারেন না। তাঁরা বলেন, ভাব বা মনোবৃত্তি সংবেদনের স্বাভাবিক ক্রিয়া—যা স্নায়বিক প্রবাহের ভিতর দিয়ে আসে। মনোবৃত্তির আবার বাইরের বিকাশ আছে। যেমন, কোন লোক ক্রুদ্ধ হোলে তার চোখদুটি রক্তবর্ণ হয়, মুখ রক্তিম হোয়ে ওঠে ও ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, রক্তসঞ্চালনের গতি ও শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। যদি কোন লোকের মনে ঘৃণার ভাব জাগে তবে তার শরীরে এক রকম মারাত্মক বিষের সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ জননী যদি তাঁর সন্তানকে সেই অবস্থায় স্তন্য পান করান তবে তিনি তাঁর সন্তানের শরীরে বিষ সংক্রমিত করেন। কোন লোক ভীত হোলে তার শরীরে বিকার উপস্থিত হয়; তার হৃদ্‌পিণ্ড কম্পিত হোতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয়, আবার কথনো কথনো তা একেবারে বন্ধ হোয়েও যায়। এ' সমস্তই ভাব তথা আন্তর মানসিক বৃত্তির বহির্বিকাশ।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সহজাত জ্ঞানের (instinct) প্রকৃত কারণ সম্বন্ধেও মনোবৈজ্ঞানিকেরা সদুত্তর দিতে পারেন না। স্বয়ংক্রিয়তাবাদেরও (automatism) তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সহজাত জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি মনের ক্রিয়াশক্তি—যা কোন রকম উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি না রেখেও কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে। চিত্তবৃত্তিকে অনুভূতিই বলা যায়, সুতরাং সহজাত জ্ঞান বলতে বোঝায় ক্রিয়াশক্তি, অর্থাৎ কৃতকর্মের কি ফল হবে সে সম্বন্ধে না জেনেও কাজ করার প্রবৃত্তি ও শক্তি। মনোবিজ্ঞানে অনুভূতিকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: (১) ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sense-feeling) ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি (emotions)। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল বা প্রতিকূল বোধের নামই ইন্দ্রিয়ানুভূতি, আর ভাব বা কোন-কিছুর ধারণার সাথে অনুভূতির যে সম্পর্ক তাকে বলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগালের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি শব্দদুটি অভিন্ন, একটি অপরটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ জেমস্‌-ল্যাঙ্‌ মতবাদের অনুসারেও দেখা যায়, ঐ দুটি শব্দ আসলে সংবেদন বা অনুভূতিকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের মতে সহজাত জ্ঞানের সাথে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়, কেননা সহজাত জ্ঞানকে তাঁরা মিশ্র স্নায়বিক প্রবৃত্তি বা সুশৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হিসাবে ধ'রে ভুল করেন।[৫৬]

৫৫। "We have learnt that physiological psychology teaches * * * which will reach the muscles automatically."—অভেদানন্দ; 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৭১-৭২

৫৬। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৮২-৮৩

বাসনা বা ইচ্ছাকে স্বামী অভেদানন্দ মনের অন্যতম বিকাশ হিসাবে গণ্যকরেছেন। তিনি বলেছেন: 'ইচ্ছা বল্‌তে সত্যিকারের কি বোঝায় তার আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝি যে, ইচ্ছা অর্থে 'কোন একটা কিছু'। 'কোন একটা কিছু' পাবার জন্তে আমরা বাসনা করি, 'কোন-কিছু' করার জন্তে আমাদের মনে ইচ্ছা জাগে। * * * এই তিনটি কাজ করার বিষয়ে ইচ্ছাকে আমরা তিন রকম অর্থে ব্যবহার করি। সাধারণত 'ইচ্ছা' শব্দ আমরা ব্যবহার করি এমন কোন একটি জিনিসের পরিবর্তে—যা আমাদের সুখের কারণ হয়, অথবা প্রীতিকর কোন অনুভূতি আমাদের মনে জাগিয়ে দেয়; কিম্বা এমন একটি জিনিস চাই যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। অভিলষিত বস্তু যে আমরা পাব সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা থাকে না। তবে সমস্ত ইচ্ছার সাথে শারীরিক গতিবিধির যোগাযোগ থাকে; যেমন, আমি হাত নাড়্‌তে ইচ্ছা করি। সুতরাং ইচ্ছা এই তিন রকম ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানের মতে, ইচ্ছার যথার্থ কারণ সম্বন্ধে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে জান্‌তে পারি না।'[৫৭]

কিন্তু যথার্থ মনোবিজ্ঞানের (True Psychology) মতবাদ এ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মতে সচেতন প্রাণীমাত্রের পিছনে ইচ্ছার অভিব্যক্তি বা বিকাশ থাকবেই। সকলের মূলে থাকে ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা ব্যক্তিমাত্রেব সৃজনীশক্তি। ইচ্ছাই আমাদের ভোগ-চরিতার্থের জন্তে উপযোগী ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করে; অর্থাৎ দেখার ইচ্ছা যদি আমাদের ভিতরে না থাক্‌ত তবে চক্ষুর সৃষ্টি কোনদিন হোত না। তেমনি আমাদের মনের কোণে যদি শোনার ইচ্ছা না থাক্‌ত তবে কর্ণেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি কখনও হোত না; খাবার ইচ্ছা না থাক্‌লে দাঁত বা হজমের যন্ত্র সৃষ্টি হোত না। সুতরাং প্রত্যেক সৃষ্টির মূলে ইচ্ছাই কারণ। * * কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করে, অথচ যথার্থ মনোবিজ্ঞান (True Psychology) প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়সৃষ্টির কারণ নির্ণয় করেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হোতে পারে যে, তাহোলে আমাদের মস্তিষ্ক তৈরী করেছে কে? যদি প্রাণপঙ্কের (protoplasm) আদিম অণুকোষের মধ্যে মনের সত্তা অথবা বুদ্ধির কোন বিকাশ না থাকত তবে মস্তিষ্ক যন্ত্রটির সৃষ্টি হওয়া সত্যই অসম্ভব ছিল; কিম্বা এই সকলের মূলে যদি ইচ্ছা না থাক্‌ত তবে মস্তিষ্কের মতন অত্যন্ত জটিল যন্ত্রের উৎপত্তি আদৌ হোত না। ইচ্ছা মনের সৃষ্টিময়ী প্রচেষ্টা; জগতে প্রত্যেকটি কাজের পিছনে মনের সত্তা আছে। সংস্কৃত ভাষায় একেই বাসনা' বলে। এই বাসনাই চেতন প্রাণীমাত্রের আদিম ইচ্ছা।[৫৮]

স্বামী অভেদানন্দের মতে ইচ্ছা বা বাসনাই বিশ্বসৃষ্টি মূল। সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-ভালবাসা —এই সকল-কিছু দ্বন্দ্বের মূলে সেই বাসনার পরিচয়ই পাওয়া যায়। 'তিনি বলেছেন, পরস্পর-বিরোধী ধর্মাক্রান্ত বস্তুদুটির মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভাব (synthesis) নিশ্চয়ই আছে। বাস্তব জগৎ কম্পন অথবা গতিছাড়া অন্ত কিছু নয়। পার্থিব জগতে এই গতির বহিঃপ্রকাশমাত্রই আছে।

৫৭। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৮৩-৮৪

৫৮। ঐ, পৃঃ ৮৪-৮৫

আন্তর তথা মনের জগতে যখন এই গতির প্রকাশ হয় তখন তাকে আমরা বলি ভাব বা মনোবৃত্তি (emotion)। এরই নাম আন্তর বিকাশ। এর নামই আ্গার বিরোধী বস্তুদুটির মধ্যে সমন্বয়। * * যদি কোন বিশেষবৃত্তি প্রবল হয় তবে সেখানে আর একটি নিয়মের বিকাশ দেখা যায়, যাকে আমরা বলি কার্য-কারণ নিয়ম। * * যেমন, ভালবাসা যখন বৃদ্ধি পায় তখন তারি পাশে ঘৃণা, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার ভাবও লুকানো থাকে। * * ভালবাসার অপর নাম আকর্ষণ, অথবা যা নিজের প্রীতিকর অনুভূতির অনুকূল ভোগ তার প্রতি প্রবল বাসনার নামই ভালবাসা।[৫৯]

স্বামী অভেদানন্দ বিচার বা বিবেককেও মনের একটি বৃত্তি বলেছেন। অপরোক্ষতা মানসিক জ্ঞান অনুভূতি শক্তির একটি অন্যতম বিকাশ। একে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞানও বলা যায়। অপরোক্ষজ্ঞানে কোন সংশয় বা অমীমাংসার ভাব থাকে না। প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন হোল সে সম্বন্ধে আমরা তর্ক বা বিচার করি না। প্রত্যক্ষ[৬০] দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। সহজাত ও প্রত্যক্ষজ্ঞান এ'দুটি মনের একটি বিকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। তবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে প্রত্যক্ষের নাম সহজাতজ্ঞান (instinct) এবং মানুষের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অপরোক্ষতা (intuition) বলে। অপরোক্ষজ্ঞানের সাথে যোগসূত্র থাকে স্মৃতি ও বিগত অভিজ্ঞতার, সুতরাং পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে স্মৃতি যদি আমাদের না থাকে তবে সহজাতজ্ঞানের আশা করা বৃথা। প্রত্যেকটি সহজাতজ্ঞান অভ্যাস বা পুনঃপুনকৃত পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। যেমন, আমরা সাইকেলে চড়তে আরম্ভ করলাম। তার জন্যে প্রথমে জ্ঞাতভাবে আমরা শরীরের পেশীগুলির ব্যবহার করি ও সেগুলিকে গড়ে তুলি। তারপর অভ্যাসের বশে পেশীগুলি আপনিই ক্রিয়াশীল হয়। এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার নামই সহজাত বা প্রকৃতিসিদ্ধ (instinctive)। প্রত্যেক সহজাতজ্ঞানের পিছনে থাকে ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ও এমন কিছু যা 'পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সমন্বয়' (*pre-established harmony*)। প্রত্যক্ষজ্ঞানকে আমরা শক্তি হিসাবে গণ্য করতে পারি। সেই শক্তির সাহায্যেই বিষয়ী-মন কোন রকম বিচার না কোরে, কোনও রকম প্রশ্ন না তুলেও ফল বা পরিণতিকে লক্ষ্য করে। চোখের সামনে ছবি যেমন ভাসে ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে বস্তু প্রতিভাত হয়, আর যদি আমরা কোন জিনিস

৫৯। ঐ, পৃঃ ৮৯-৯০

৬০। প্রত্যক্ষজ্ঞান তথা 'ইনটুইসন'-এর সম্বন্ধে ইমানুয়েল কাণ্ট বলেছেন: প্রত্যক্ষ অর্থে জ্ঞান বা বিষয়ের সাথে মনের পরিচয়। কাণ্ট অপরোক্ষ বা ইনটুইসন বলতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলেছেন, অতীন্দ্রিয়জ্ঞান বলেন নি। প্রত্যক্ষের পরিচয় দিতে গিয়ে কাণ্ট তাঁর 'প্রোলেগোমেনা' বইয়ে (পৃঃ ৩৭) বলেছেন, " * * that every thing which can be given to our senses (to the external sense in space, the internal in time) is intuited by us as it *appears* to us, not as it is in itself". কাণ্টের ভাষ্যকার অধ্যাপক কেম্প স্মিথও কাণ্টের 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন'-এর ভাষ্যে লিখেছেন: Intuition "is knowledge which is in immediate relation to objects. So it is quite explicit that Kant means to say: Intuition is the immediate apprehension of a content which as given is due to the action of an independently real object upon the mind."—পৃঃ ৭৯-৮০

সাক্ষাৎভাবে জানতে চাই ও কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে সেই জানার কারণ কি, তাহোলে আমরা বলবো 'যেহেতু'। কিন্তু এটি হোল মেয়েলি 'যেহেতু', কেননা এর অর্থ—মেয়েটি যেহেতু সে বস্তুটি জানে। এতে কিন্তু কোন যুক্তি বা বিচারের বালাই নাই। সেরকম অপরোক্ষজ্ঞানে কোন 'কারণ' জিজ্ঞাসা থাকে না। একে যুক্তি-বিচারের নেতিবাচক প্রণালী বলা যায়, কিন্তু এটিই আবার জ্ঞানের কারণ। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, এই জ্ঞান নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু যখনি আমরা ইতিবাচক প্রণালীর সাহায্যে এই জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝ্‌তে চাই তখনি সেটি হয় বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধিও মনঃশক্তির একটি বিকাশ। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞানের ধারাটি যুক্তিপ্রণালীর একেবারে বিপরীত, অর্থাৎ কোন জিনিসকে জানা মানেই বিচারকে বাদ দিয়ে জানা। অবশ্য এ' সমস্তই মানসিক শক্তি—যা থেকে মনের বিচিত্র বিকাশের সৃষ্টি হয়। আমাদের মনটি কম্পনবিশিষ্ট কতকগুলি সূক্ষ্মপদার্থের সমষ্টির ন্যায়। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা-রূপ সংবেদন পেলে ঐ মনে আবর্ত বা তরঙ্গের মতন বিভিন্ন বৃত্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে জানে ও নিয়মন করে একটি চেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত আত্মা। এই আত্মাই আমাদের বিষয়ী-জীবাত্মা—যা প্রত্যেক প্রাণীর সৎ-স্বরূপ বা সত্তা। মন এই বিষয়ী-আত্মা বা সৎ-এর যন্ত্রস্বরূপ। মনের অর্ধেক ভাগকে আমরা সকল-কিছু বৃত্তি, ভাব, ইচ্ছা, বাসনা ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের আধার-রূপ 'বিষয়ী' ও অপর অর্ধেক ভাগকে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত 'বিষয়' বল্‌তে পারি। মনই সকল রকম সংস্কারকে গ্রহণ কোরে জীবাত্মার তথা অন্তঃকরণ-যুক্ত আত্মার কাছে প্রেরণ করে[৬১] ও পরে জীবাত্মা (মানুষ) বিষয়ী-মনের মাধ্যমে সকল-কিছুর ভালমন্দ বা সদসৎ বিচার করে। আন্তর বিষয়ী-মনেই যাবতীয় বহির্বিকাশের শক্তি নিহিত থাকে। মন ও তার বৃত্তিগুলি বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়; সেই নিয়মগুলির নাম কার্য-কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি। এই সমস্ত নিয়ম আমাদের বিষয়ী-মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু সকলের নিয়ামক একমাত্র আত্মচৈতন্য।[৬২]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বামী অভেদানন্দ অপরোক্ষজ্ঞান (intuition) ঔপনিষদিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে ব্যবহার করেছেন, কেননা তাঁর অপরোক্ষজ্ঞানে সন্দেহের বা যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই, যদিও তাকে তিনি মনেরই একটি বৃত্তি হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন: "Intuition is another modification of the power of the mind. It is a direct perception. The word is derived from the verb *intuit*, which means 'to look upon'. Intuition is never doubtful nor undecided. We cannot argue it".[৬৩] কাণ্টের মতে এই অপরোক্ষতা বা 'ইন্‌টুইসন'

৬১। আসলে মনের রূপ সংস্কারের সমষ্টি। অন্তঃকরণকে সাধারণভাবে আমরা মন বলি, কিন্তু মন অন্তঃকরণের একটি বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং মন সকল সংস্কারকে গ্রহণ কোরে আত্মার কাছে প্রেরণ করে অর্থাৎ—অন্তঃকরণের বৃত্তি জীবাত্মায় আরোপিত হয়।

৬২। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাব্‌সোলিউট', পৃ: ১৪-১৬

৬৩। ঐ, পৃ: ১৪

ইন্দ্রিয়জ্ঞান (sensibility or sense-experience), যদিও তা আন্তর জ্ঞানেরই বহির্বিকাশ, কেননা কাণ্ট বলেছেন যে, "pure intuition exists *a priori* in the mind, as a mere form of sensibility and without any real object of the senses or any sensation". নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী আলেকজাণ্ডারের অপরোক্ষতাও ঐন্দ্রিয়িক। তবে কাণ্টের প্রত্যক্ষজ্ঞান আন্তর মনের বহির্বিকাশ হোলেও তা মানসিক বিচারের বহির্ভূত নয়, অথবা সাক্ষাৎ জ্ঞান হোলেও তাতে যে সন্দেহ থাক্‌বে না এমন-কিছু কথা নেই। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যক্ষে সন্দেহ বা যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই তা আগেই বলেছি। ঔপনিষদিক অপরোক্ষতাও তাই, তা দিব্যজ্ঞানের পর্যায়েই পড়ে। সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ভেদ ও সকল সংশয় নষ্ট না হোলে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ হয় না; উপনিষদ্‌ তাই বলেছে: "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"। কাণ্টের সাথে স্বামী অভেদানন্দের এখানেই পার্থক্য। হেনরী বের্গসোঁর অপরোক্ষজ্ঞান (intuition) অনেকটা স্বামী অভেদানন্দের মতন মনে হোলেও ঠিক এক নয়। বের্গসোঁ বলেছেন: প্রত্যক্ষজ্ঞান বল্‌তে বুঝি সত্যবস্তুর প্রতি বৌদ্ধিক সহানুভূতি (intellectual sympathy), অর্থাৎ কোন প্রণালীর মাধ্যমে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি অখণ্ডভাবে এবং সত্যবস্তুর অন্তরতম দেশের সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। বের্গসোঁর উপলব্ধি স্পিনোজার বুদ্ধিসহকৃত ঈশ্বরীয় ভালবাসার ('intellectual love for God') মতন বৌদ্ধিক প্রত্যক্ষ।[৬৪] কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ অপরোক্ষজ্ঞানে যুক্তিতর্ক তথা বুদ্ধির সহযোগিতাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন। ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লের অপরোক্ষতাও অনেকটা এই রকম, তাঁর মতেও অপরোক্ষতায় বুদ্ধির উপকারিতা কিছু থাকে না। কিন্তু তাহোলেও ব্র্যাড্‌লের প্রতিপাদিত অপরোক্ষজ্ঞান অদ্বৈতের ছদ্মবেশে দ্বৈতভাবকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছে।

অধ্যাপক হফ্‌ডিঙ বের্গসোঁর প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাকে চাররকম শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: (১) বাস্তব প্রত্যক্ষ (concrete intuition) (২) কার্যকরী প্রত্যক্ষ (practical intuition), (৩) বিশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষ (analytical intuition), (৪) সংযোগাত্মক প্রত্যক্ষ (synthetic intuition)। বাস্তব প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে হোলেও তার প্রণালীর সাথে যোগাযোগ থাকে সংবেদন, স্মৃতি ও কল্পনার। কার্যকরী প্রত্যক্ষে উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি সহজাত ঐক্যের ভাব থাকে। বিশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষে সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। একে সংবেদন, স্মৃতি বা কল্পনার বিষয়ীভূত দুটি প্রতিবিম্বের ব্যবধানে ভেদ বা অভেদের সম্বন্ধে চিন্তাপ্রণালীও বলা যায়। সংযোগাত্মক প্রত্যক্ষে অংশ-বা পূর্ণের জ্ঞান হয় মিলনের মনোবৃত্তি নিয়ে।

৬৪। "It is a kind of 'intellectual sympathy'—a direct approach to integral experience of reality which enables us to enter into the core of it. This intellectual apperception is the only inexpressible medium through which we can enter into the citadel of the unique absolute Reality, and for want of it we can only move round the Reality, but cannot touch or penetrate its region." —বের্গসোঁ: 'ইন্‌ট্রোডাক্‌সন টু মেটাফিজিক্স'।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্য (consciousness), জ্ঞান, (knowledge) ধারণাশক্তি (understanding), অধ্যাস (illusion), ভ্রান্তি (hallucination) প্রভৃতির প্রসঙ্গও তুলেছেন। চৈতন্যকে (consciousness) তিনি জ্ঞান তথা পার্থিব ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের কারণ বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, চৈতন্যকে যদিও এক ধরণের জ্ঞান বলা যায় তবুও একথা ঠিক যে, চৈতন্য জ্ঞানের অধিষ্ঠান-বিশেষ।[৬৫] জ্ঞান ও চৈতন্য এক কিনা এ' সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে তিনি আবার লিখেছেন : "তাহোলে চৈতন্য আমরা কাকে বলব ? চৈতন্য ও জ্ঞান কি এক ? * * চৈতন্যকে আমরা জ্ঞানেরই প্রাথমিক অবস্থা বল্‌তে পারি। * * জ্ঞানের সৃষ্টি হয় সাদৃশ্যের বিচার (comparison) থেকে। তুলনামূলক প্রণালীর ভিতরে থাকে বিচার, কেননা বিচার না থাকলে আমরা একটি থেকে অপরটির পার্থক্য মোটেই বুঝ্‌তে পারিনা"। তিনি চৈতন্যের আর একটি পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যা, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে তাকেই আমরা বলি চৈতন্য ("consciousness means the establishment of relations between subject and object"), সম্পর্কটি যদিও ক্ষণকাল-মাত্র স্থায়ী হয়। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে মুহূর্তমাত্র সময় লাগে, সময়ের ব্যবধান এক রকম নেই বল্লেই চলে।

স্বামী অভেদানন্দ আত্মাকে চৈতন্যের যথার্থ রূপ বলেছেন। বস্তুতন্ত্রবাদী ও অনেক বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক আত্মা সম্বন্ধে নানান যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। কারো মতে চৈতন্যের উৎপত্তি জড়পদার্থ থেকে, কেউ বলেছেন—গতি বা কম্পন থেকে, কারো মতে মন বা বিজ্ঞান থেকে আত্মার সৃষ্টি। এসবের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : "ধরে নিলাম যে, তুমি বল্‌ছ জড়পদার্থই চৈতন্যকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটা ধারণা বা প্রত্যয় মাত্র, অর্থাৎ এটি চৈতন্যের বিকাশ-রূপ মনের অবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ থেকে একথা বোঝায় না যে, চৈতন্যকে বাদ দিয়ে তুমি তারই কারণ অনুসন্ধান করছো। অপর কোন জিনিষের পিছনে অনুসন্ধান কোরে তার কারণ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু চৈতন্যের পিছনে গিয়ে বা চৈতন্যের বিকাশকে বাদ দিয়ে তার কারণ নির্ধারণ করা অসম্ভব, যেহেতু কারণের অনুসন্ধানী বৃত্তিই তো চৈতন্যের আর একটি বিকাশ, সুতরাং তার বিকাশের বাইরে আমরা কোনদিনই যেতে পারি না। তাছাড়া চৈতন্যকে ছেড়ে তার কারণ নির্ধারণ করাও বৃথা, কেননা চৈতন্য তো আমাদের প্রত্যেকের ভিতরই আছে, তাকে আমরা কখনও ত্যাগ করতে পারি না, চৈতন্যের সাথে আমাদের সত্তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত"।[৬৬] স্বামী অভেদানন্দের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি পাই আমরা ম্যাক্স্‌ প্ল্যাঙ্ক্‌, লর্ড হ্যালডেন, ডাঃ হীরালাল হালদার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের লেখার ভিতর। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌ প্ল্যাঙ্ক বলেছেন : "চৈতন্যকে

৬৫। "And that consciousness is a kind of knowledge which gives the foundation of all our knowing states. It is the substratum."—'আওয়ার রিলেশান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৩৫

৬৬। "Suppose you say * *. But can we go behind the state of consciousness ? No. * *."—অভেদানন্দ : 'আওয়ার রিলেশান টু দি এ্যাব্‌সোলিউট', পৃঃ ৩৩-৩৪

আমি মূলতত্ত্ব বোলে গণ্য করি ও জড়পদার্থকে আমি বলি চৈতন্ত থেকে উৎপন্ন। চৈতন্তকে আমরা বাদ দিতে পারি না। যে কোন বিষয় নিয়ে আমরা কথা কই, যে কোন জিনিসকে 'আছে' বোলে আমরা গণ্য করি, সে সমস্তই চৈতন্তের সত্তাকে জানিয়ে দেয়"।[৬৭] ডাঃ হীরালাল হালদার লর্ড হ্যালডেনের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন: "আমরা যা-ই করি না কেন, জ্ঞানকে কখনই অতিক্রম করতে অর্থাৎ জ্ঞানের বাইরে যেতে পারি না। কারণ হ্যালডেন বলেছেন, পরমসত্য জ্ঞানরূপ অধিষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত আছে এবং দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এ-দুটির মধ্যে যে পার্থক্য বা ভেদ তাও অধিষ্ঠান-রূপ অখণ্ডতার অন্তর্ভুক্ত, কারণ দ্রষ্টা ও দৃষ্টির বিষয়, অথবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানকে অবলম্বন বা অধিষ্ঠান কোরেই সৃষ্টি হয়েছে, তারা জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই পড়ে।"[৬৮]

স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্তকে (consciousness) বলেছেন—জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থায় তা পার্থিব বিকাশ রূপে অনুভূত হয়। ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তের কারণ-জ্ঞানের নাম নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং কার্য-জ্ঞানের নাম সবিকল্পক জ্ঞান। স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্তকে (consciousness) নির্বিকল্পক ও পার্থিব জ্ঞানকে (knowledge) সবিকল্পক বলতে চেয়েছেন।

স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্ত বা কারণ-জ্ঞানের চারটি বিকাশ স্বীকার করেছেন: অবচেতন (subconscious), চেতন (conscious), পরচেতন (superconscious) ও ব্রহ্মচেতন (Godconscious)। এই বিভাগ অনেকটা ডাঃ ফ্রয়েডের মতনই, তবে ডাঃ ফ্রয়েড অবচেতনকে পঙ্কিল করেছেন কামপ্রবৃত্তির (sexual instinct) কেন্দ্র-রূপে গণ্য কোরে; স্বামী অভেদানন্দের মতে তা সৃষ্টিরূপিণী বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি (cosmic energy)। ফ্রয়েডের শিষ্য ডাঃ ইয়ুঙ ও অনেকটা এই ধরণের কথাই বলেছেন, যদিও তিনি স্বামী অভেদানন্দের মতন দিব্যমহিমার আসন অবচেতনকে দিতে পারেন নি। স্বামী অভেদানন্দ পরচেতন জ্ঞান বা অবস্থাকে কখনো কখনো ব্রহ্মচেতনের সাথে সমান বোলে পরিচয় দিয়েছেন; যেমন—"He was in a trance-like condition, in superconscious state, and he was communing with

৬৭। "Consciousness, I regard as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness". —*Observer*, Jan. 25, 1931.

৬৮। (ক) "Do what we may, we cannot go behind knowledge itself. Because Haldane says: 'Reality lies in the foundational character of knowledge, and in the distinction between perceiver and percieved, knower and known, as being distinctions falling inside the entirety of that foundational character, in as much as they are made by and with knowledge itself."—ডাঃ হালদার: 'নিও-হেগেলিয়ানিসম্,' পৃঃ ৩৯৫; লর্ড হ্যালডেন: 'রেন্ অব রিলেটিভিটি', পৃঃ ২৭

(খ) আর্থার এ্যাভেলন: 'দি সার্পেন্ট পাওয়ার' (১৯৩১), পৃঃ ১০৭; সার জন উডরফ: 'শক্তি এ্যাণ্ড শাক্ত' (১৯২৯), পৃঃ ৩৭

God then."[৬৯] প্রকৃতপক্ষে পরচেতন জ্ঞান বা অবস্থাকে শুদ্ধজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, জড়জগৎ থেকে আরম্ভ কোরে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পর্যন্ত ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত রচনা করলে সেই বৃত্ত অজ্ঞানের রাজত্বেই পড়বে, শুদ্ধব্রহ্ম তার পারে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর মায়াধীশ হোলেও মায়ার কল্পনা তাঁতে করা যায়, কাজেই ঈশ্বর মায়ার এলাকার অতীত নন, কিন্তু শুদ্ধ বা তুরীয় ব্রহ্মে মায়ার কল্পনামাত্র করা যায় না, তাই পরচেতন (superconsciousness) তথা ঈশ্বরচেতন ও ব্রহ্মচেতন (Godconsciousness) এক জিনিস নয়। 'গডকন্‌সাস্‌নেস'-এর 'গড্' বলতে স্বামী অভেদানন্দ 'ব্রহ্মই' বলতে চেয়েছেন, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলা তাঁর অভিপ্রায় নয়। তবে যেখানে তিনি পরচেতনের সাথে ব্রহ্মচেতনকে সমান বলেছেন ("A man was lying in a state of Godconscionsness, or superconsciousness, on the roadside"[৭০]) সেখানে 'পর' অর্থে শ্রেষ্ঠ তথা ব্রহ্মচেতন বুঝেছেন, কেননা অপরাপর জায়গায় পরচেতন বা 'সুপারকন্‌সাস্‌নেস্' বলতে তিনি 'the greatest and highest' অথবা 'the realm of Absolute' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

অবচেতন জ্ঞান (subconscionsness) ডাঃ ফ্রয়েডের ভাষায় 'আন্‌কনসাস' বা অবচেতন বোলে প্রতীত হোলেও তা মোটেই নিজ্ঞানের অচেতনের অবস্থা নয়, বরং জ্ঞানের অথবা জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার তা অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার, আর সেজন্যে স্বামী অভেদানন্দ তাকে "It is the vast field"[৭১] অথবা "this subconscious realm is a vast realm"[৭২] বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ একে "great boundless ocean of subjective mind"[৭৩] বলেছেন তা আগেও আমরা উল্লেখ করেছি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'লাইফ ডিভাইন'-এ একে পরমন বা 'সুপারমাইণ্ড' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে অবচেতন মনকে ঈশ্বর, অব্যক্ত, প্রাজ্ঞ, সুষুপ্তও বলা যায়। শ্রদ্ধেয় আর্থার এ্যাভেলন উল্লেখ করেছেন:

"Shabda-brahman is thus the kinetic ideating aspect of the undifferentiated Supreme consciousness of philosophy and the Saguna Brahman of religion, It is chit-shakit vehicled by undifferentiated Prakriti-shakti, that is, the creative aspect of the one Brahman who is both transcendent and formless (Nirguna) and immanent and with form (Saguna)."[৭৪]

পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিক ও দর্শনকারেরা তো বটেই, ভারতীয় দার্শনিকেরাও অবচেতন (subconscious) ও পরচেতনের (superconscious) ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য দেখিয়েছেন। তন্ত্রে অবচেতনের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে মূলাধারে ও পরচেতনের

৬৯। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট' (১৯৪৬), পৃঃ ৩৯

৭০। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৩৯

৭১। ঐ পৃঃ ৪৪

৭২। ঐ পৃঃ ৪৮

৭৩। বিবেকানন্দ: 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ' (৩য় সংস্করণ), ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ২৭

৭৪। আর্থার এ্যাভেলন: 'দি সার্পেন্ট পাওয়ার' (১৯৩১), পৃঃ ৯৯

সুষুম্নায়। তন্ত্রে চৈতন্যের স্তর তথা বিকাশগুলিকে চক্র বা পদ্ম-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে, মূলাধারে সুপ্ত জীবচৈতন্য-রূপে অবচেতন জ্ঞান যখন জাগ্রত ও ক্রীয়াশীল হোয়ে সমস্ত চক্র ভেদ করে ও সহস্রারে পরমশিব শুদ্ধচৈতন্যের সাথে মিলিত হয় তখনি মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ হয়। এখানে কুণ্ডলিনীশক্তি জীবচৈতন্য মূলাধার বা অবচেতনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ বা শূন্য কোরে মস্তকে সহস্রারে ওঠে কি-না এ নিয়ে আর্থার এ্যাভেলন তাঁর প্রসিদ্ধ 'সর্পেন্ট পাওয়ার' বইয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, এমনকি অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের[৭৫] সাথে যেসব আলোচনা ও পত্র আদানপ্রদান হয়েছিল সে সবও তাঁর ঐ বইয়ের তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবচেতন অব্যক্ত শক্তি নিজের স্থান মূলাধারকে একেবারে ত্যাগ করে না, তার কতকটা মাত্র উর্ধগামী হোয়ে যেন পরমশিবের সাথে মিলিত হয়।[৭৬] প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনীর 'স্থানত্যাগ' বা অজ্ঞানাবদ্ধ জীবের ব্রহ্মত্ব 'লাভ' এসব কল্পনার বিলাসমাত্র, আসলে কুণ্ডলিনীই পরমশিব, জীবই ব্রহ্ম। মনের অবচেতন স্তর বা অবচেতন জ্ঞানকেই অব্যক্ত, প্রকৃতি বা ঈশ্বর বলা হয়। বিরাট প্রকৃতিতে (Cosmic mind or energy) যেমন অসংখ্য জন্মের সংস্কাররাশি সঞ্চিত থাকে, জীবপ্রকৃতিতেও তাই। মানুষের ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস, সংস্কার সকল-কিছুই অব্যক্ত অবচেতন জ্ঞানে সঞ্চিত থাকে, অভিব্যক্ত হোলে তাদের স্থূল বিকাশ হয় চেতন স্তরে। অনেকে অবচেতনকে সুষুপ্তির ও পরচেতনকে সমাধির সাথে তুলনা করেন এবং সাধারণত করাও স্বাভাবিক। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, সুষুপ্তি ও সমাধি এ' দুটির অবস্থা সমান হোলেও সুষুপ্তিতে অজ্ঞান কারণাকারে থাকার জন্যে সমাধির সাথে তার পার্থক্য অনেক, কেননা সমাধির অবস্থায় জ্ঞানমাত্র তথা শুদ্ধজ্ঞানই থাকে, তারই উপলব্ধি হয় পরিপূর্ণভাবে, অজ্ঞানের আর লেশমাত্র থাকে না। তাছাড়া সুষুপ্তিতে লোকে প্রতিদিন ব্রহ্ম-চৈতন্যের সাথে একীভূত হোলেও জাগ্রতে ফিরে এলে আবার অজ্ঞানকে নিয়েই আসে, কিন্তু সমাধি থেকে ফিরে এলে (বুত্থিত হোলে) আর অজ্ঞান থাকে না। একথা অতীব সত্য। কিন্তু একথাও আবার ঠিক যে, জ্ঞান ও চৈতন্যের আধার অবচেতন স্তর; সকল-কিছু জ্ঞান ঐ আধার থেকে ওঠে আবার ওখানেই ডুবে যায়। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "Our consciousness lies on the crest of there waves which are rising from the subcouscious and going back to the consciousness". শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, "mind having arisen from the Supermind has the potentiality to go back to it." বাস্তবিক অজ্ঞান থাকা ও না-থাকা নিয়ে অচেতন ও পরচেতনের মধ্যে

৭৫। বর্তমানে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

৭৬। "It is not that static energy at the Mula wholly passes over into a dynamic form—the coiled Kundalini leaving the Mula, thus making it a void; that cannot be, and, were it so, all dynamic operation in the body would cease directly for want of a background. The coiled power remains coiled or static, and yet something apparently passes out of the Mula—*viz*. the dynamic equivalent."—'দি সার্পেন্ট পাওয়ার', পৃ: ৩০৬; ৩০৭—৩১০

জাগতিক তথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রের পার্থক্য থাকলেও পারমার্থিক ভাবে ও স্বরূপত উভয়েই এক—অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্য।

মানুষের সত্তা (individuality) ও ব্যক্তিত্ব (personality) নিয়েও স্বামী অভেদানন্দ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণত এ-দুটি শব্দ আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু এ'দুটির মূলে আছে আত্মার প্রতি প্রীতি ভালবাসা। আমাদের সকলের মধ্যে দুটি সত্তা বা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই: একটি 'আমি' ও অপরটি 'আমাকে'। মোটকথা 'আমি' ও 'আমাকে' এদুটি সত্তা মানুষের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। 'আমাকে' বলতে কোন-কিছু একটা বিষয়—যাকে আমি জানি, আর 'আমি' বলতে বোঝায় একটি জিনিস যা 'আমাকে' জানে। সুতরাং 'আমাকে' ও 'আমি' প্রকৃতপক্ষে আংশিক বিষয় ও বিষয়ী; এই বিষয় ও বিষয়ীই মানুষের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে।[৭৭] কিন্তু জার্মানি দার্শনিক হেগেল এদের ভিন্ন অর্থ করেছেন। তাঁর মতে সত্তা (individuality) বলতে বোঝায় 'মিথ্যা আমি' ও ব্যক্তিত্ব অর্থে 'যথার্থ আমি'। শুধু তাই নয়, সত্তা আমাদের মধ্যে প্রার্থক্য সৃষ্টি করে ও ব্যক্তিত্ব এনে দেয় মিলনের ভাব।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজন-পরিজন এঁরা সকলেই এক একজন আমাদের ব্যক্তিত্বের অংশবিশেষ। সমাজের দিক থেকে প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা এবং সম্মানও ব্যক্তিত্বের অংশরূপে গণ্য। ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকও আছে। আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিশক্তি, নৈতিক গুণ, চরিত্র, অধ্যাত্ম-ভাব, ভগবান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে।[৭৮] প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ব আমাদের অপরিবর্তনীয় নয়, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আছে, প্রতিমুহূর্তেই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। শরীরের পক্ষেও তাই। প্রতি সাত বৎসর অন্তর আমাদের নূতন শরীর সৃষ্টি হয়। এমন কি মস্তিষ্কের বিকাশ আজ যেভাবে আছে, দশ বৎসর পরে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। স্মৃতিশক্তির পক্ষেও তাই।

ব্যক্তিত্বকে সংবেদন, চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি বলা যায়। এই সমষ্টিকে অনেকে স্রোতের বা জলধারার মতন বোলে চিন্তা করেন। এ'ধারা চিরপরিবর্তনশীল, কিন্তু পরিবর্তনের পিছনে একটি অপরিবর্তনীয় বস্তু আছে যার মর্যাদা মনোবিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত ঠিক ঠিকভাবে দিতে পারে না। বেশীর ভাগ মনোবৈজ্ঞানিক এই সংবেদন, চিন্তা ও ভাবধারাকেই মানুষের আত্মা বোলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে এম্পিডোক্লেস, হেরাক্লিটাস, হিউম, বের্গসোঁ, আলেকজাণ্ডার ও বৌদ্ধ যোগাচার-সম্প্রদায় অন্যতম। অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিক মননকারী ও মননকে, দ্রষ্টা ও দৃষ্টিকে অভিন্ন বোলে প্রমাণ করেন। কিন্তু যথার্থ মনোবিজ্ঞান (True Psychology) সেখানে তাঁদের ভুল দেখিয়েছেন দ্রষ্টা ও মননকারীকে দৃষ্টি ও মনন-কার্য থেকে আলাদা কোরে। পাশ্চাত্য জগতে কাণ্ট, ফিক্টে প্রভৃতির ও প্রাচ্যে উপনিষদের ঋষি ও বেদান্ত-অনুশীলন-

৭৭। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', (১৯৪৬), পৃঃ ১২১-১২২

৭৮। ঐ, পৃঃ ১২৪

কারীদের এদিক থেকে নাম করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 'আমি' ও 'আমাকে'-রূপ ব্যক্তিত্ব জীবাত্মার ওপর নির্ভর করে তা আগেই বলেছি। সমস্ত সংবেদন, চিন্তা ও ভাবধারাকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে আমাদের সত্তা (individuality), যা চিন্তা নয়, মনের শক্তি নয়, বুদ্ধিশক্তি, প্রত্যয় বা অনুভূতি কোনটাই নয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আছে, কিন্তু সত্তার কোন পরিবর্তন বা বিকার নেই। সত্তাকে আত্মাই বলা যায়। সত্তা বল্‌তে যা অবিভাজ্য, যাকে কোনদিনই বিভক্ত করা যায় না এমন একটি বস্তু ("The word *individual* literally means 'that which is indivisible, that which cannot be divided'")। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চৈতন্য, আমাদের সত্তা, আমি-বোধ —এদের কোনটাকেই আমরা কথনো আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে বা ভুলে যেতে পারি না। আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌তে গেলেও সত্তা তার পিছনে থাকে চিন্তার কর্তা হিসাবে।[৭৯]

অস্তিত্ব (existence) ও তার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিয়েও স্বামী অভেদানন্দ আলোচনা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা বিকাশ চিরদিনই পরিবর্তনশীল, কিন্তু অস্তিত্ব অবিকারী ও তা সত্তার অভিন্ন রূপ। স্বামী অভেদানন্দ তাই অস্তিত্বকে আত্মা বা ব্রহ্মের সাথে তুলনা করেছেন। অনেকে অস্তিত্বের স্থায়িত্বকে আপেক্ষিকতা অথবা কোন সম্বন্ধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত বলেছেন, অর্থাৎ একটি জিনিসকে যখনই আমরা 'আছে' বলি তখন সেই 'আছে' বা থাকা নির্ভর করে আর একটি জিনিসকে অপেক্ষা কোরে। দেশ-কালের প্রশ্নকেও সেখান বাদ দেওয়া যায় না। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, তাই অস্তিত্ব বা সত্তা একটাই, অর্থাৎ অখণ্ড আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্য থেকে তা অভিন্ন। সকল 'অস্তি', 'আছে' বা 'থাকা'-র সার্থকতা নির্ভর করে আত্মসত্তার থাকার ওপর। কাজেই সত্যিকারের অস্তিত্ব বা সত্তা কোন আপেক্ষিকতা ও সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না, তা স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শাশ্বত। তবে দেশ ও কালের মধ্যে তার বিকাশ চিরদিনই বিচিত্র ও আপেক্ষিক, সুতরাং অনিত্য।

৭৯। ঐ, পৃঃ ১২৭-১৪৫

—অষ্টম আলোচনা—

অভিব্যক্তি ও জন্মান্তরবাদ

স্বামী অভেদানন্দ বিশ্বসৃষ্টির মূলে পরমেশ্বরের তথা সগুণব্রহ্মের ইচ্ছাকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে স্বীকার করলেও তার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশকেই বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত বোলে বিশ্বাস করেন। বিরাট পৃথিবী তার সকল-কিছু ঐশ্বর্যকে নিয়ে একদিনে গড়ে ওঠেনি, বহুসহস্র বৎসর লেগেছিল এই বর্তমান আকারে রূপায়িত হোতে। ভাঙা-গড়া এর আগে সহস্রবার হয়েছে, অসংখ্যবার ভবিষ্যতের বুকেও চল্‌তে থাক্‌বে। বিশ্বের সৃষ্টিকে স্বামী অভেদানন্দ খাঁটি ভারতীয় দার্শনিকের মতন অনন্ত বলেছেন তার আদি ও অন্তের ভাবকে মুছে ফেলে। তিনি বলেছেন: "This theory of evolution has opened our eyes to the truth that this world was not created six thousand years ago, but it is beginningless and endless., that it is eternal."[১] তিনি বিজ্ঞানের সৃষ্টি-রহস্যকে মেনেছেন পুরোপুরিভাবে এবং সাংখ্যকার কপিলের বর্ণিত সৃষ্টিক্রমকেও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যান নানান দেশের লোক নানান রকম ভাবে করেছেন, সে সকল ব্যাখ্যানের মূলে ছিল তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস। বেশীর ভাগ বিশ্বাসের মূলে পাওয়াযায় আবার সৃষ্টি-কর্তা ভগবানের অলৌকিকী শক্তি। ইহুদী, ক্রিশ্চান ও ইসলামধর্মীরা প্রায় দু হাজার বছর ধরে প্রাচীন সেমিটিক জাতিদের মতবাদকে মেনে এসেছেন। সেমিটিক জাতিদের বিশ্বাস ছিল যে, একজন দিব্যস্রষ্টা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে শূন্য থেকে তাঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। জেন্দাবস্তায়ও ঠিক এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ বা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে সকল-কিছুকে দেখার রীতি ছিল না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভিযান যখন শুরু হোল তখনই মানুষের চিন্তাধারা বিকশিত হোতে লাগ্‌ল বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অভিব্যক্তিবাদের প্রসার লাভ করল বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইউরোপে, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাণ্ট ও লাপ্লাস সর্বপ্রথম নিউটন প্রবর্তিত নিয়মের সহায়ে সৃষ্টির রহস্যজাল ভেদ করতে গিয়ে তার কারণ নির্ণয় করলেন বিরাট নিহারিকা-পুঞ্জকে। লাপ্লাস তাঁর নীহারিকাতত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের যান্ত্রিক উপায়ে গঠণ ও পরস্পর-বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যান করেছিলেন, তবু একথা ঠিক যে, ডারুইন ও আর্নেষ্ট হেকেলের আগে পর্যন্ত অভিব্যক্তিবাদ ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশনীতিকে যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ডারুইন ও হেকেলই, যে নীতি বর্তযুগেও অপরিহার্য-রূপে গণ্য হয়েছে।[২]

১। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন্' (১৯৪৭), পৃঃ ১০২—১০৩

২। "The ancient Semitic tribes had a particular theory of creation

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ঋগ্বেদে ও উপনিষদে[৩] ক্রমবিকাশের ধারার উল্লেখ আছে, কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকদের ভিতর সাংখ্যকার কপিলই প্রথমে সুশৃঙ্খলভাবে ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সৃষ্টিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক ও নব্য-পেটো-বাদীরাও সাংখ্যীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[৪] গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, গতিরুচ্ছল স্রোতস্বিনীর মতন পৃথিবীর সকল জিনিসই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন তথা গতিবাদের প্রচারক হিসাবে তিনি অভিব্যক্তিবাদকেই সমর্থন করেছিলেন।

অভিব্যক্তি বলতে আমরা বুঝি ক্রমবিকাশ, অর্থাৎ যে রূপায়ণ বা পরিবর্তনে থাকে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক ক্রমোন্নত বিকাশ তাকেই আমরা বলি ক্রমবিকাশ। গোড়াকার দিকে অভিব্যক্তি বললেই জৈববিকাশ (organic evolution) বোঝাত। মনীষী কংগার (Conger) বিকাশের তিন রকম ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন : (১) সময়ের মধ্যে পরিবর্তন, (২) ক্রমিক ধারণানুযায়ী পরিবর্তন, (৩) আন্তর কারণ। এ ছাড়া তিনি 'সৃষ্টিমুখী সমন্বয়' (creative synthesis) নামে চতুর্থ একটি ধারণার কথা বলেছেন। জৈববিকাশে প্রাণীদের অভিব্যক্তি হয় সামান্য থেকে বিশেষে—অনুন্নত থেকে উন্নত রূপে। প্রাণপঙ্ক থেকে আরম্ভ কোরে প্রাণবান বস্তুমাত্রেই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। মনীষী ডারুইন এই মতবাদ প্রচলন করেন। ডারুইন প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুর মধ্যে তিনটি ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও পৃথক হবার প্রবৃত্তি। কি প্রাণী ও কি উদ্ভিদজগৎ উভয়ের মধ্যেই পরিবেশ অনুযায়ী বৈষম্য সৃষ্টির এবং অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঐ বৈষম্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার অনুযায়ী একটি প্রবৃত্তি থাকে। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে পরস্পর পার্থক্য হবার ভাবটি সুপ্তভাবে নিহিত থাকে ও তা জীবনরক্ষার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। কাজেই জীবাণুরা বেঁচে থাকার জন্যে হয় অনুকূল পরিবেশ নির্বাচন করে, নয় পরিবেশ বিপরীত হোলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিল রাখার জন্যে নিজেদের রূপও পরিবর্তন করে। অবশ্য জীবনসংগ্রাম থাকার জন্যেই এই ধরণের নির্বাচনপ্রণালী সম্ভব হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মতে সমগ্র বিশ্ব একটি বিরাট অভিব্যক্তির প্রবাহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই প্রবাহ জড়পদার্থ, গতি ও শক্তির (matter, motion, force) মধ্যেই দেখা যায়। এই তিনটি চরমসত্যের বিকাশ মোটেই নয়, পরন্তু এরা আমাদের জ্ঞানের সীমাটুকুকে মাত্র জানিয়ে দেয়। স্পেন্সার এদের বলেছেন—অজ্ঞাত পরমসত্তার বাইরের বিকাশ (modes)। প্রথমে এই জগৎ ছিল বিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতন ও তরল। পরে তা গাঢ় ও একত্রীভূত হোতে থাকে ও সূর্য থেকে গ্রহগুলি আলাদা হোতে থেকে।

* * * beeome an essential element in the modern scientific attitude"—'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস রিলিজিয়ান,' পৃঃ ১০১-১০২

৩। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

৪। অভেদানন্দ : "কস্‌মিক ইভোলিউসন্‌ এ্যাণ্ড ইট্‌স্‌ পারপাজ", পৃঃ ৫

ক্রমে ভূমি, জল, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির আবিষ্কার হয়। প্রাণীরাও প্রথমে ছিল অবিভাজ্য প্রাণপঙ্ক। পরে তাদের মধ্যে বিচিত্র বিকাশ-রূপ বিভাগ সৃষ্টি হয়। মানুষের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভবও ঠিক এই রকমভাবে হয়েছিল।

ক্রমবিকাশতত্ত্বে ফরাসী প্রকৃতিবাদী লামার্কের অবদানও বড় কম নয়। ডারুইনের পর লামার্ক একটু ভিন্নভাবে অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করেন। লামার্কের মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রাণীশরীরে রূপান্তর সৃষ্টি করে ও সেই রূপান্তর মাতাপিতা থেকে সন্তানে সংক্রমিত হয়। জীবজন্তুর বেলায়ও অনেকটা তাই, তবে তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার প্রভাব সেখানে বেশী দেখা যায়। প্রবল ইচ্ছা ও কোনকিছু অভাব পরিপূরণের বাসনাই জীবজন্তুর শরীরে নানা রকম পরিবর্তন সৃষ্টি করে ও সেই পরিবর্তন বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়।

স্বামী অভেদানন্দ বংশানুক্রমিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: যাঁরা বংশানুক্রমিকতায় (heridity) বিশ্বাস করেন তাঁরা স্থূলদেহ, মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুমণ্ডল থেকে আলাদা চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মনীষী ডারুইনের হাতে এই মতবাদ সঞ্জীবিত হোয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায়, কি পশু ও কি মনুষ্যজগত—সর্বত্রই সন্তান যে মাতাপিতার অনুরূপ স্বভাব চরিত্র ও শরীর লাভ করবে এমন কোন বাঁধাধরা প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, বরং এ' সমস্যা আরও জটিল হোয়ে উঠেছে। কিভাবে একটি অণুকোষের মধ্যে মাতাপিতার শারীরিক গঠনের যাবতীয় বংশানুক্রমিক প্রবণতা, তাদের প্রকৃতি, মন ও আত্মা নিহিত থাকে তা সত্যিই জানার বিষয়। ডারুইনের মতে, জন্মগ্রহণের পরও প্রাণীদের শরীরের প্রত্যেকটি অংশ নূতনভাবে আবার গড়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত অণুকোষ থেকে অতিসূক্ষ্ম আকারের পরমাণুসকল ক্রমাগত নির্গত হয়। এই পরমাণুগুলি পুনরুৎপত্তিশীল অণুকোষে সঞ্চিত হয়। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত প্রাণীর শরীর থাকবে ততদিন কোন-না-কোন শারীরিক পরিবর্তন অনুকোষগুলিতে সংক্রমিত হোতে থাকে। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসও অনেকটা এই ধরণের মতবাদ সমর্থন করতেন। কিন্তু অধ্যাপক গল্টন, রথ্, আগাষ্ট ওয়াইজম্যান প্রভৃতি মনীষীরা এই বংশানুক্রমিক মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অর্জিতপ্রকৃতি বা সংস্কার (acquired characters) একজন থেকে অন্যে সংক্রামিত হয় না। মাতাপিতারা নিজের চেষ্টায় কোন একটি বা একাধিক স্বভাব অর্জন করতে পারেন সত্য, কিন্তু সেই স্বভাব বা স্বভাবগুলিকে তাঁদের সন্তানদের ভিতর কখনও সংক্রামিত করতে পারেন না। আগাষ্ট ওয়াইজম্যানের মতে কোন প্রাণীর অর্জন করার প্রবৃত্তি না থাকলে নূতন কোন জিনিস সে আর জীবনে সঞ্চয় করতে পারে না। ওয়াইজম্যান জীবাণুর ক্রমসংসরণবাদ (continuity of the germ-plasm) প্রবর্তিত করেন। মাতাপিতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা সব-কিছুই পাই, অথবা বংশপরাম্পরাক্রমে মাতাপিতার স্বভাব্ ও প্রকৃতি প্রথমত তাদের সন্তানদের ভিতর হয়তো প্রবল হয়, দ্বিতীয়ত—পিতামহের প্রকৃতি ও সংস্কার, তৃতীয়ত—মাতামহীর, চতুর্থত—প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ-প্রমাতামহের প্রকৃতি বা স্বভাব হয়তো সন্তানদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়—এই ধরণের প্রাচীন মতবাদ ওয়াইজম্যান্ সমর্থন করেন না। তিনি বরং প্রাণ বা জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার কোরে এ' সমস্যার

সমাধান করেছিলেন। ওয়াইজম্যান বলেছেন, যখনি রাসায়নিক ও সর্বোপরি আণবিক গঠনের সাথে এক ধরণের পদার্থ কোন একটি বংশ (generation) থেকে অন্য বংশে সংক্রামিত হয় তখনি বংশানুক্রমিকতারূপ ধারার ঠিক ঠিকভাবে উৎপত্তি হয়। তিনি এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন জীবাণু বা প্রাণপঙ্ক।[৫]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ওয়াইজম্যানের মতে কোন একটি প্রাণীর ভিতরে যে সব প্রকৃতি বিকশিত হয় তাদের সকল বৈশিষ্ট্যই ঐ জীবাণুর মধ্যে নিহত থাকে। প্রাণপঙ্কের অণুগুলি (protoplasmic molecules) ভিতরে বিকশিত ও বর্ধিত হয়। খাদ্য-পরিপাক-করণ ও তার বিভাগের সাহায্যে বর্ধিত হবার শক্তি অণুগুলির মধ্যেই থাকে। জীবাণুগুলি একটি বংশ থেকে অন্য বংশে সংক্রমিত হয়, আর তাদের মধ্যে সমান রকমের আণবিক গঠন থাকে বোলে নির্দিষ্ট কোন একটি বিকাশকে অবলম্বন কোরে তারা ঠিক একই স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। ওয়াইজম্যান বীজাণুদের পূর্বানুবৃত্তি বা ধারাবাহিকতা স্বীকার করেন, তাই তাঁর মতে প্রাণীরা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তিনি বলেছেন, শিশু-সন্তানদের প্রকৃতি বা চরিত্র পুরোদস্তুর অর্জিত বস্তু নয়, কিংবা মাতাপিতাদের কাছ থেকে সেগুলি হুবহু ধার করা নয়। কেবল যে-প্রকৃতিগুলি বীজের আকারে তাদের সন্তানদের মধ্যে সুপ্ত থাকে সেগুলিই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়। স্বামী অভেদানন্দের মতে, ওয়াইজম্যানের যুক্তি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, মাতাপিতাগণ কোনদিনই প্রাণপঙ্কগুলিকে সৃষ্টি করতে পারেন না; প্রাণবীজগুলি শাশ্বত, তারা মাতাপিতাদের জন্ম-মৃত্যুর পূর্বে এবং পরেও বিরাট-প্রকৃতির গর্ভে লীন থাকে, কখনই নষ্ট হয় না। প্রাণপঙ্কগুলি ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে কারণ শরীরীপ্রকৃতি, সেখানে অজ্ঞানরূপী জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য অগণিত সংস্কার ব্রহ্ম-চৈতন্যের সাথে একীভূত হোয়ে থাকে। একেই বের্গসোঁ বলেছেন—'এলাঁ ভ্তিা', লয়াড মর্গ্যান বলেছেন[৬] 'ঈশ্বর', বুডিন বলেছেন 'কারণ'।

স্বামী অভেদানন্দ বিশ্বের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ক্রমবিকাশনীতি স্বীকার করেছেন। এমন কি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রত্যেকটি জীবনে ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও তাই। স্বামী অভেদানন্দের মতে, ভারতের প্রত্যেকটি দর্শনের ভিত্তি বিজ্ঞান ও ক্রমবিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এমন কি বেদান্তের সার্বভৌমিক ধর্মেও ক্রমবিকাশের স্থান আছে। তিনি বলেছেন: "বেদান্তের সার্বভৌমিক ধর্মে নির্দিষ্ট কোন একটি সময়ে শূন্য থেকে বিশ্বসৃষ্টি হয় নি, বা এরকম ধারণার স্থান নাই, পরন্তু ক্রমোন্নত ধারায় আকাশ থেকে বাষ্প, তা থেকে তরল, তা থেকে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' এইরূপে পৃথিবী যখন কঠিন হয়েছিল তখনি তাতে শাকসবজীর আকারে প্রাণবীজ বিকশিত হয়েছিল, তারপর জীবজন্তুর ও পরিশেষে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হয়। ক্রমবিকাশের এই স্তরগুলির মধ্যে পার্থক্য কেবল তারতম্যে, বস্তুগত নয়। এই বিকাশ আরম্ভ

৫। অভেদানন্দ: 'রিইন্‌কারনেসন্' (৫ম সং), পৃঃ ৩৩—৩৫

৬। "For the better or worse, I acknowledge God as the Nisus through whose Activity emergents emerge, and the whole course of emergent evolution is directed"—মর্গ্যান: 'ইমার্জেন্ট ইভোলিউসন', পৃঃ ৩৬

হয়েছিল হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর আগে, তারপর বিপরীত ধারায় ধ্বংশ আরম্ভ হয়; সমস্ত কার্যরূপী সৃষ্টিই পরে তার কারণে অব্যক্তভাবে থাকে। এরূপ অব্যক্তভাবে থাকায় পর আবার একই ধরণের বিচিত্র বিকাশ আরম্ভ হয়।' এই এক একটি সৃষ্টি ও প্রলয়কে নিয়ে এক একটি কল্প রচিত হয়। এই ধরণের কল্পও আবার অনন্ত, একটির পর আর একটি, সুতরাং অসংখ্য ক্রমবিকাশের প্রবাহ চল্‌তে থাকে। এজন্যে এই প্রবাহকে আদি-অন্তহীন অনন্ত বলা হয়। সৃষ্টির প্রভাতে অনন্ত প্রাণী বা জীবজন্তু বিরাটপ্রকৃতির কারণগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, বিভিন্ন বিকাশের স্তর অতিক্রম কোরে প্রাণবীজগুলি ক্রমশ কারণ, সূক্ষ্ম ও নানান রকমের জড়শরীর এবং পরিশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করে। তারপর তাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলির বিকাশসাধন, নিজেদের বাসনার চরিতার্থ ও সমস্ত রকম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে ক্রমশ অগ্রসর হোতে হোতে পরিশেষে মুক্তি লাভ করে।"[৮]

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, বেদান্তে বিকাশ বা সৃষ্টির অর্থই পরিপূর্ণতা লাভ করা। পূর্ণ থেকে আমরা এসেছি, আবার পূর্ণেই ফিরে যাব, পূর্ণই আমাদের স্বরূপ। আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু জাগতিক বিকাশ; সর্ববিকারবিহীন আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। তবে অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোকের মর্যাদা বোঝা যায় না বা আলোকের উপকারিতা আমরা অনুভব করি না, তেমনি বিকাশ বা সৃষ্টিরূপ অসম্পূর্ণতা সাময়িকভাবে আমরা বরণ করি পরিপূর্ণতা-রূপ মুক্তিকে উপলব্ধি করার জন্যে। কোন জিনিসের আরম্ভ থাক্‌লে শেষ তার নিশ্চয়ই থাকে। মায়িক পার্থিব বস্তুমাত্রের আদি ও অন্ত আছে। বিকাশ বা অভিব্যক্তি যখন আরম্ভ হয়, তখন তার সমাপ্তি অবশ্যই থাকে। বিকাশের ক্রমোচ্চসোপান অতিক্রম কোরে সমস্ত প্রাণীই পরিশেষে নিজেদের শাশ্বত স্বরূপকে উপলব্ধি করে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিপূর্ণতা-রূপ স্বরূপোপলব্ধি করা। জড় জৈবশরীরের বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে মানবশরীর গ্রহণ করলে। বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীতে মানবশরীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন বিকাশ নাই। মানবশরীর অবশ্য জৈবশরীরের পূর্ণপরিণতি। সুতরাং এ' থেকে আমরা অনুমাণ করতে পারি যে, অভিব্যক্তিবাদের উদ্দেশ্য পূর্ণতা-রূপ মুক্তি লাভ করা, পূর্ণতা লাভ হোলে ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।"[৯]

এছাড়া মানুষের আন্তর বিকাশের প্রসঙ্গ তুলে স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন: বিশ্বে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য ও ধারা যখন সর্বত্র একই রকমের তখন বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্য তখনি সাধিত হয় যখন ঐ তিনটির অভিব্যক্তি হয় পরিপূর্ণ। বৌদ্ধিক পরিপূর্ণতার অর্থই বুদ্ধিবিকাশের পূর্ণতালাভ। বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে তখনি যখন আমরা প্রত্যেকটি জিনিসের আসল স্বরূপ বুঝ্‌তে পারি এবং অসৎকে সৎ, জড়কে চৈতন্য ও অনিত্যকে নিত্য বোলে ভুল করি না। মানুষের নৈতিক পরিপূর্ণতা আসে স্বার্থপরতা দূর হোলে। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা বল্‌তে বোঝায়—আত্মস্বরূপ যে, শাশ্বত, স্বাধীন, দিব্য এবং তা

৭। ঋগ্বেদেও "সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ" মন্ত্রে একই সৃষ্টিধারার পুনরাবৃত্তির কথা পাওয়া যায়

৮। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস রিলিজিয়ন,' পৃঃ ১৫৬-১৫৭, এবং ১০২-১০৫

৯। অভেদানন্দ: রিইন্‌কারনেসান্‌ (৫ম সং), পৃঃ ৬২-৬৩

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন এই যথার্থ উপলব্ধি। বিকাশের চরম-উদ্দেশ্য তখনি সার্থক হয় যখন চৈতন্যের নিবারণ মহিমময় রূপ আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির উন্মুখতা হোল তার সকল-কিছু শক্তির পূর্ণবিকাশ সাধন করা। বিকাশোন্মুখী প্রবল শক্তিগুলি প্রথমে অভিব্যক্ত হয় ও অপরাপরগুলি সুপ্ত থাকে। বিকাশের সময়ও আমরা দেখি যে, পশুপ্রবৃত্তির উন্মেষের সময় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। আবার দিব্য-নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশের সময় পশুপ্রবৃত্তিগুলি অনভিব্যক্ত থাকে; তার কারণ নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুতে অথবা সে সকল মানুষ পশুপ্রবৃত্তি নিয়ে বাস করে তাদের ভিতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ হয় না। মানুষই একমাত্র প্রাণী যার মধ্যে ঐদুটি দিব্যপ্রকৃতির অভিব্যক্তি একই সাথে হয়।"[১০]

স্বামী অভেদানন্দের মতে, দেবমানবও সাধারণ মানব থেকে ক্রমবিকাশের পরিণতি; সাধারণ মানুষই সাধনার ক্রমোচ্চসোপানে আরোহণ কোরে দিব্যভাব লাভ করে। রোম-নগরীর সৃষ্টি একদিনে হয় নি। বৈদিক মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ অকস্মাৎ হয় নি, হাজার হাজার বছর লেগেছিল তাদের উন্নত ও সুসংস্কৃত সৌধ গড়ে উঠ্‌তে। অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ। পরিবর্তন ঋজু, বক্র, ধীর অথবা দ্রুত যেকোনভাবে হোতে পারে। বাহ্য ও আন্তর বিকাশের আবার দুটি রূপ। ভারতীয় দর্শনে মনের বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্তরভেদ স্বীকার করা হয়েছে। স্তরগুলি বিকাশের ক্রমোচ্চসোপান। আচার্য শংকর তাঁর 'পঞ্চীকরণ'-স্তোত্রে ও সুরেশ্বরাচার্য 'পঞ্চীকরণবার্তিক'-এ জ্ঞান বা উপলব্ধিকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। চারটি বিভাগ বেশীর ভাগ দার্শনিকেরাই মেনে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে প্রধানত তিনটি স্তরের উল্লেখ দেখা যায়। মনোবিশ্লেষণকারী ডাঃ ফ্রয়েড, এ্যাড্‌লার, ইয়ুঙ প্রভৃতি তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। ভাস্কররায় তাঁর 'বারিবাস্যরহস্য' বইয়ে জ্ঞানের দশটি ও 'নারদপরিব্রাজক' উপনিষদে ষোলটি স্তরের বর্ণনা আছে। মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'সিদ্ধান্তবিন্দু' বইয়ে নয়টি ও 'ভক্তি-রসামৃত' গ্রন্থে এগার রকম স্তরের উল্লেখ করেছেন। যোগ ও তন্ত্রসাহিত্যে সাতটি চক্র তথা পদ্মের পরিচয় আছে। এছাড়া তন্ত্রকারগণ আজ্ঞা ও সহস্রারচক্রের মধ্যে আরো কয়েকটি সূক্ষ্মস্তরের নামোল্লেখ করেছেন। মহোপনিষদে ও যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে চিত্তশুদ্ধির জন্যে সাতটি ভূমির বর্ণনা আছে। বেদান্তে পঞ্চকোষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসাহিত্য ও বিশেষ কোরে 'নারদপঞ্চরাত্র' ও রামানুজ-সম্প্রদায় প্রদ্যুম্নাদি চার রকম ব্যূহের পরিচয় দিয়েছেন।[১১] মোটকথা স্তর, চক্র, পদ্ম, ভূমি বা ব্যূহ এ' সমস্তই জাগতিক জ্ঞান বা উপলব্ধির স্তরমাত্র। রাজযোগে ও তন্ত্রে যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার চক্র তথা কল্পিত পদ্মের নাম আছে সেগুলি অনুভূতির ক্রমোচ্চভূমি; এক একটি ভূমিতে এক এক রকম অনুভূতি হয় ও সেই অনুভূতিগুলির মধ্যে তর-তম ভেদ আছে। মূলাধারে যে অনুভূতি হয়, স্বাধিষ্ঠানের অনুভূতি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র। এইভাবে সহস্রারের অনুভূতি চরম, সেখানে জীব সমস্ত অজ্ঞানরূপ মালিন্য-বিবর্জিত হোয়ে পরমশিবের স্বরূপ ও দিব্যমহিমা লাভ করে। তাই

১০। ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৪

১১। প্রজ্ঞানানন্দ: 'প্রগ্রেস এ্যাণ্ড পারফেক্‌শন' (১৯৬৯), পৃঃ এগার-বার

ক্রমবিকাশের ধারা সর্বত্রই আছে, সকলেই ক্রমবিকাশের পথ অতিক্রম কোরে তবে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী অভেদানন্দ বিজ্ঞানসম্মত ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার ও সকল-কিছুর পূর্ণতার পথে ক্রমবিকাশকে অপরিহার্য নীতি হিসাবে গণ্য করেছেন।

* * * * * *

জন্মান্তর বা পুনর্জন্মবাদ স্বামী অভেদানন্দ স্বীকার করেছেন। শুধু মানুষ কেন, সমস্ত প্রাণীর আত্মা চৈতন্যময়, সুতরাং জড়শরীর থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আত্মা শাশ্বত, দেহের মৃত্যুর সাথে তার কোনদিন ধ্বংশ হয় না, আত্মা দেহের মৃত্যুর পরেও থাকে, সূক্ষ্মশরীরী হোয়ে লোকান্তরে তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে—এরূপ বিশ্বাসের নামই জন্মান্তরবাদ। আত্ম-সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত আত্মা তথা সূক্ষ্মদেহী জীবাত্মা বারংবার জন্মগ্রহণ করে। একটি দেহ পরিত্যাগ কোরে জীবাত্মার অন্য দেহ গ্রহণের নাম পুনর্জন্ম।

এক লোকায়ত-সম্প্রদায় ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা ছাড়া প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক আত্মা তথা অন্তঃকরণ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবাত্মার জন্মান্তর বা দেহান্তরবাদ স্বীকার করেন। বৃহস্পতিমতের অনুবর্তী দেহাত্মবাদী লোকায়ত বা চার্বাকেরা প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত: ধূর্ত ও শিক্ষিত। ধূর্তেরা কেবলমাত্র ক্ষিতি, অপঃ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি ভূতদ্রব্য স্বীকার করতেন ও শরীর তথা আত্মাকে এই চারটি ভূতের সমষ্টিতে গঠিত মনে করতেন। শিক্ষিত চার্বাকেরা দেহ-ব্যতীত পৃথক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। আচার্য জয়ন্ত তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' ও মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' বইয়ে চার্বাকদের মতবাদ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।[১২] শিক্ষিত চার্বাকেরা পরলোক স্বীকার করেন না; তাঁরা বলেন যে, দেহনাশের সাথে সাথে আত্মাবও ধ্বংশ হয়। আচার্য জয়ন্ত ন্যায়মতের আলোচনায় চার্বাকমত খণ্ডন কোরে আত্মার নিত্যত্ব ও পারলৌকিকত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "তস্মাদনন্তরোক্তেন প্রক্রমেণোপপাদ্যতে, নিত্যত্বাদ্ব্যাপকত্বাচ্চ পারলোকিত্ব-মাত্মনঃ।"[১৩] আচার্য জয়ন্ত নিত্য বা শাশ্বত আত্মার (জীবাত্মার) জন্মান্তর-গ্রহণের স্বপক্ষে

১২। (ক) ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত চার্বাক-মতবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "অথ সুশিক্ষিতাশ্চার্বাকা আহুঃ। যাবচ্ছরীরমবস্থিতমেকং প্রমাতৃতত্ত্বমনুসংস্থানাদিব্যবহারসমর্থমস্তু নাম কস্তত্র কলহায়তে শরীরাদূর্ধ্বং তু তদস্তীতি কিমত্র প্রমাণম্। ন চ পূর্বশরীরমপহায় শরীরান্তরং সংক্রামতি প্রমাতা * *।"—ন্যায়মঞ্জরী (ভিজিয়ানাগ্রাম সংস্কৃত সিরিজ, নং ১০; ১৮৯৫), পৃঃ ৪৬৭-৪৬৮

(খ) মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচনা করেছেন: "তদেতৎ সর্বং বৃহস্পতিনাপ্যুক্তম্—ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। * * যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ। কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥" —সর্বদর্শনসংগ্রহ (দি ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, পুণা, ১৯২৪), পৃঃ ১৩-১৫

(গ) স্বামী অভেদানন্দ: 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৪), পৃঃ ৮

(ঘ) ডাঃ দাশগুপ্ত: 'এ হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (১৯৩২), ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৮-৭৯; এ'ছাড়া গুণরত্ন তাঁর 'তর্কসংগ্রহদীপিকা'-গ্রন্থে চার্বাক মতবাদ আলোচনা করেছেন। মহাভারতে আছে রাজা যুধিষ্ঠির কোন চার্বাকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

১৩। বিস্তৃত আলোচনা 'ন্যায়মঞ্জরী' (ভিজিয়ানাগ্রাম সং), পৃঃ ৪৬৯-৪৭৩

যুক্তি দেখিয়ে কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে একটি হোল : নবজাত শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হোয়েই কাঁদে ও মাতৃস্তন্য অন্বেষণ করে। এই অন্বেষণ করার পূর্বসংস্কার শিশুর মধ্যে না থাকলে ভূমিষ্ঠ হবামাত্র কখনই সে দুগ্ধপানের জন্যে মাতৃস্তন্যের অন্বেষণ করত না—"অয়ং তু স্তনাভিলাষেণ কুচক্ষীরকলশাবলোকনোপসর্পণাদয়ো দারকস্য তদনুস্মরণকৃত এবেতি সর্বথা জন্মান্তরসংবন্ধানুমানামিত্য আস্থেতি।"[১৪] প্রায় সকল ন্যায়ের গ্রন্থেই জন্মান্তরনীতি প্রমাণ করার জন্যে এই উদাহরণটির উল্লেখ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে অনেকে আত্মার তথা অত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করায় পরলোক ও জন্মান্তরবাদ খণ্ডন করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে যে 'ভব' তথা জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, কেননা তাঁর একশত পূর্বজীবনের ঘটনা তিনি জানতেন। বুদ্ধদেব সম্ভবত 'ভব' শব্দটি কর্মফলের পরিবর্তে ব্যবহার কোরে থাকবেন। 'মাধ্যমিক-বৃত্তি' গ্রন্থের টীকাকার চন্দ্রকীর্তি 'ভব' অর্থে জন্মান্তর বলেছেন—"পুনর্ভবজনকম্ কর্ম"। ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, 'ভব' শব্দটি কোন প্রাচীন উপনিষদের পাতায় পাওয়া যায় না, একমাত্র দার্শনিক পরিভাষার ছদ্মবেশে সর্বপ্রথমে ব্যবহার হয় পালিসাহিত্যে।[১৫] বৌদ্ধসাহিত্যে আমরা 'জাতি' শব্দের উল্লেখ দেখি। 'জাতি' অর্থে জন্ম যা জরা-মরণের কারণ। রত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ জাতিকে দেহ ও পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তির নিমিত্ত বলেছেন—"জাতির্দেহজন্ম পঞ্চস্কন্ধসমুদায়:"। বেদান্তে ও অন্যান্য দর্শনে কর্মকেই দেহ-ধারণের ও সুখ-দুঃখভোগের কারণ বলা হয়েছে। কর্মের পিছনে থাকে তৃষ্ণা বা তন্‌হা—যাকে সাধারণভাবে আমরা বাসনা বলি। সুতরাং বুদ্ধদেব যে 'ভব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার কর্ম, তৃষ্ণা, উপাদান, স্কন্ধ, দেহান্তর-গ্রহণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের অর্থ-প্রকাশের সামর্থ্য থাকলেও আসলে তা জন্মান্তরকে বুঝায়।

তবে বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যেও জন্মান্তরবাদ-স্বীকার নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন, সর্বাস্তিবাদী ও বৈভাষিকেরা মৃত্যুর পর আত্মার (জীবাত্মার) আতিবাহিক শরীর ও জন্মান্তর-গ্রহণ স্বীকার করেন। কিন্তু মহাসাঙ্ঘিক, একব্যবহারিক, লোকোত্তরবাদী ও কুক্কুটিকেরা দেহান্তরবাদ বিশ্বাস করেন না। 'মিলিন্দপহো' গ্রন্থে নাগসেন জন্মান্তরকে সোজাসুজিভাবে অস্বীকার করেছেন।[১৬] বেশীর ভাগ বৌদ্ধ দার্শনিকেরা আত্মা বা অত্তা বলতে পুদ্গল, সংস্কার অথবা বিজ্ঞানসন্তান এই অর্থ করেছেন। বিশেষ কোরে সৌত্রান্তিকদের মতবাদ তাই। কিন্তু বিজ্ঞান বা সংস্কারসন্তান (impressions) স্বীকার করলেও অধিকাংশ বৌদ্ধ দার্শনিক আতিবাহিক আত্মার নূতন জন্মগ্রহণ সমর্থন করেন। অধ্যাপক কিথ তাই বলেছেন: "In any case from their standpoint it is clear that the consciousness is the essential element which determines the new life; whether or not it takes a body with it, it is the seed of consciousness, which through the physiological appa-

১৪। ঐ, পৃঃ ৪৭১

১৫। ডাঃ দাশগুপ্ত : 'এ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (১৯৩২), ১ম ভাগ, পৃঃ ৮৭

১৬। 'মিলিন্দাপহ', পৃঃ ৮৩, এবং ডাঃ এ. বি. কিথ : 'বুদ্ধিষ্ট্‌ ফিলজফি' (১৯২৩), পৃঃ ২০৭—২০৮

ratus of the union of the parents produces the shoot of name and form, the concrete individual."[১৭]

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এই প্রসঙ্গে পালিবৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেততত্ত্বের উল্লেখ কোরে বলেছেনঃ "মৃত্যুর পর মানুষের পরলোকগত আত্মা ভাল ও মন্দ কাজ অনুসারে ফলভোগের নিমিত্ত পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ' ধারণা বৌদ্ধধর্মের একটি গোড়ার ধারণা। বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেত শব্দটি আত্মা শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। * * পেতবত্থু নামক পালিগ্রন্থে প্রেত এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। পেতবত্থুকে এইজন্য সূত্রপিটকের ক্ষুদ্দকনিকায় গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পালি-ধর্মসংহিতা প্রভৃতির পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের বহুপূর্বেও পরলোকগত পূর্বপুরুষদের অস্তিত্বে হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন[১৮] এবং তাঁহাদের নামে তর্পণ করার পদ্ধতি হিন্দুদের ধর্মেরও একটা অঙ্গ ছিল। হিন্দুদের এই চিরন্তন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধগণ প্রেতলোক—প্রেত বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"[১৯]

জৈনদর্শনেও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হয়েছে। জৈন-দর্শনকারেরা উল্লেখ করেছেন, শুদ্ধিকরণের দ্বারা কতকগুলি কর্মের নাশ হয়, কিন্তু কতকগুলি কর্ম আবার থেকে যায় ও তারা আত্মার বন্ধনের কারণ হয়। এই কর্মশুদ্ধি ও কর্মবন্ধনের দ্বন্দ্বস্রোতে আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের মৃত্যুর পর তার আত্মা ও কর্মশরীর কিছুক্ষণের জন্যে নবজন্ম-গ্রহণের উপযোগী লোকে গমন করে ও সেখানে নূতন শরীর গ্রহণ করে। সাংখ্যকার কপিল পুনর্জন্ম স্বীকার করেছেন। প্রকৃতি-বিবেক না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত-না পুরুষ (জীব) প্রকৃতির মিলন-বাসনা ত্যাগ করতে পারেন ততক্ষণ তাঁকে জন্মমৃত্যু-চক্রের অধীন থাকতে হয়। পতঞ্জলি জন্মান্তর মেনেছেন, কেননা তিনি জাতিস্মরতা সমর্থন করেন। পাতঞ্জলদর্শনের ৩।১৮ সূত্রে তিনি বলেছেনঃ "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্",—সংস্কারের ওপর মনোনিবিষ্ট করলে পূর্বপূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। পতঞ্জলির মতে চিত্তনিরোধ ও স্বরূপা-বস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত পুরুষকেও দেহান্তর গ্রহণ করতে হয়। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনেও কর্ম, অদৃষ্ট ও সুখদুঃখ-রূপ ফল স্বীকার করা হয়েছে। প্রাণীমাত্রের কর্মজন্য অদৃষ্ট সৃষ্টি হয় ও তাই সে ভাল ও মন্দ ফলের অংশভাগী হয়। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ভোগসাধন শরীর ধারণ করতে হয়, আর সেজন্যে জন্মান্তরকে মেনে নেওয়া হয়েছে। মীমাংসাদর্শনে লোকান্তরবাদ স্বীকার করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের স্থান মীমাংসাদর্শনে

১৭। ডাঃ এ. বি. কিথ: 'বুদ্ধিষ্ট ফিলজফি' (১৯২৩), পৃঃ ২০৮

১৮। (ক) স্যর চার্লস ইলিয়ট: 'হিন্দুইজিম্ এ্যাণ্ড বুদ্ধিজিম্', ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৩৮

(খ) রগোজিন্: 'বেদিক ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১১৭, ৩৩৬

১৯। ডাঃ লাহা: 'বৌদ্ধসাহিত্যে প্রেততত্ত্ব' (১৩৩১), পৃঃ ১

নাই। মানুষ তার ভাল এবং মন্দ কর্মের অনুযায়ী সুখদুঃখ-রূপ ফল ভোগ করে ও মাতাপিতাকে অবলম্বন কোরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। যাগযজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা যে 'অপূর্ব' সৃষ্টি হয় তাই তাকে স্বর্গপ্রাপ্তি-রূপ অপবর্গ দান করে। অপবর্গ না পাওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর পথে মানুষকে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করতে হয়।

বেদান্তদর্শনে প্রাণীদের মৃত্যুর পর লোকান্তর-গমনের কথা আছে। বাস্তব জগতের মতন প্রেতাদি লোকান্তরও ব্যবহারিকভাবে সত্য। কর্মই মানুষের ও সকলের ফলদাতা, ঈশ্বর স্বাক্ষী ও উদাসীন, অপরোক্ষানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ভালমন্দ কর্মের অনুযায়ী মানুষকে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। আচার্য শংকর বেদান্তের অধিকারী নির্ণয় করার সময় যে-সমস্ত গুণের পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে মানুষমাত্রেরই যে পূর্বজন্ম আছে তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। উপনিষদে জন্মান্তরের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। কঠ উপনিষদে যম ও নচিকেতার উপাখ্যানে লোকান্তরের পরিচয় আছে। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কৌষিতকী ও অন্যান্য উপনিষদে প্রাণীদের ও বিশেষ কোরে মানুষের দেহান্তর গ্রহণের কথা আছে। ভাল-মন্দ কর্মই অবশ্য ভাল-মন্দ ফল-রূপী জন্মের জন্যে দায়ী। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণ, যোগবাশিষ্ট, ভাগবত প্রভৃতিতেও জন্মান্তরবাদ সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

গ্রীসিয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে দেখা যায়, চিন্তাশীল মনীষীরা আত্মার অমরত্ব ও লোকান্তর স্বীকার করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ সে সম্বন্ধে বলেছেন, যদিও পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের অনেকে এই পুনর্জন্মবাদকে ঠিক ঠিকভাবে স্বীকার করতে চান না, তথাপি বেশীর ভাগ লোক নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই মতবাদকে গ্রহণ ও সমর্থন করেছেন। এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা একমাত্র হিন্দুদের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়, অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। তবে একথা সত্যি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিক মনীষী ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সুপ্রাচীন কাল থেকে এই মতবাদকে বিশ্বাস কোরে আসছেন। প্রাচীন ইজিপ্টের সভ্যতা এই পুনর্জন্মবাদের ওপরই গড়ে উঠেছিল, যদিও তা অপরিণত ও স্থূলভাবাপন্ন ছিল। মনীষী হেরোদোতাস বলেছেন: 'ইজিপ্টবাসীরা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের আত্মা অবিনাশী শাশ্বত। যেখানে কোন একটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেখানে তার আত্মা অপর একটি প্রাণীর শরীরকে আশ্রয় করেছে, আর ঐ প্রাণীর শরীর মৃত মানুষের আত্মাকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হোয়েই থাকে'।[২০] পাইথাগোরাস[২১] ও তাঁর অনুবর্তীগণ গ্রীস ও

২০। মিঃ জে. এফ্. ক্লার্ক লিখেছেন: "According to Herodotus (II. 123) the soul must pass through all animals, fishes, insects, and birds; in short, must complete the whole circuit of animated existence, before it again enters the body of a man; and this circuit of the souls in performed in three thousand years."— 'দি গ্রেট রিলিজিয়ন্‌স্', পৃঃ ২২৩

২১। পাইথাগোরাসের চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, কেননা পাইথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় ভাবধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন ইতিহাসে সে-প্রমাণের অভাব নেই।

ইতালীতে এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। পাইথাগোরাস বলেছেন, সকলেরই আত্মা আছে; সকল আত্মাই বিরাট ইচ্ছা বা নিয়মের নিয়ন্ত্রাধীন হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন: 'জীবাত্মা দেহের চেয়ে প্রাচীন। জীবাত্মারা বারংবার জন্মগ্রহণ করে। গ্রীস ও ইতালীতে পাইথাগোরাস, এম্পিডোক্লিস, প্লেটো, ভার্জিল ও ওভিড প্রভৃতি দার্শনিক ও কবিগণ পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেছিলেন। এম্পিডোক্লিস বিশ্বাস করতেন যে, দেহান্তর গ্রহণ করা পাপ এবং ত্রিশ হাজারবার নূতন নূতন দেহ ধারণ করার পর আত্মা দেবশরীর গ্রহণ করে'। এই মতবাদ অনেকটা হিন্দুদের পৌরাণিক আখ্যানের মতন। পুরাণে আছে, চুরাশী লক্ষবার দেহধারণ করার পর জীবাত্মা মনুষ্যশরীর লাভ করে। পিণ্ডার বিশ্বাস করতেন যে, পাপীরাই জন্মমৃত্যুর পথে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে, পুণ্যাত্মারা আকাশে বাতাসে ইলিসিয়াম বা ওলিম্পাসে গমন করে। প্লটিনাস, নিও-প্লটিনাসবাদীগণ ও প্রোক্লাস পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতেন। প্লটিনাস বলেছেন, আত্মা শরীর থেকে বার হোয়ে গেলে তাঁর শক্তি সামর্থ্য আরো বর্ধিত ও বিকশিত হয়, সুতরাং এই পৃথিবীলোক থেকে লোকান্তরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। মনোলোক অথবা বোধির রাজ্যে যাওয়াই আমাদের উচিত, কারণ সেখানে গেলে জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয়রূপ আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটে আর মর্ত্যজীবন-যাপন করতে হয় না।[২২]

স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, পারস্যদেশীয় মেজাই বা যাজকমণ্ডলীর ধর্মসূত্রেও জন্মান্তরের উল্লেখ আছে। গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট হিন্দুদার্শনিকদের সংস্পর্শে এসে লোকান্তরবাদ স্বীকার করেছিলেন। জুলিয়াস সিজার-এর অভিমত ছিল যে, মানুষ মরে ও তার আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে—একথা গলদেশের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন। প্রাচীন গলদেশের ড্রুহিদের ভিতরও এই বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের আত্মা সমান প্রকৃতি ও চরিত্রবিশিষ্ট শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কেল্টবাসীরা অথবা ব্রিটনরাও জন্মান্তরনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আরবীয় দার্শনিক ও অনেক মুসলমান সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত মরমীদের কাছেও এই মতবাদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ব্যাবিলোন-ক্যাপটিভিটির পরে ইহুদীরাও এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আলেকজান্ড্রিয়ার ফাইলো জুডিয়া হিব্রুদের ভিতর প্লেটো-প্রদর্শিত লোকান্তরবাদ প্রচার করেছিলেন। ফাইলো বলেছিলেন: 'মৃত বিদেহী জীবাত্মাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা দলে ভাগ করা যায়। মৃত আত্মাদের কারো কারো ভিতর এরকম নিয়ম ছিল যে, তারা মর্ত্যশরীরে প্রবেশ করবে ও নির্দিষ্ট কয়েকদিন পরে আবার সেই দেহ ছেড়ে দিয়ে মুক্ত হোয়ে চলে যাবে'। ইহুদীদের ভিতর জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট এই মতবাদ স্বীকার করতেন।[২৩] নষ্টিক ও ম্যানিচিয়ান ধর্মী-সম্প্রদায় পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাঃ হেনরী মোর-প্রমুখ কয়েকজন কেম্ব্রিজ-প্লেটোপন্থীগণ এই পুনর্জন্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন।

২২। অভেদানন্দ: 'রিইনকারনেশন' (৫ম সং)

২৩। ঐ পৃঃ ১১-১২

এছাড়া মধ্যযুগীয় ও বর্তমান বেশীর ভাগ পাঁশ্চাত্য দার্শনিক যেমন, স্পিনোজা, লাইবনিজ, বার্কলে, কাণ্ট, ফিক্টে, হেগেল, সোপেনহাওয়ার, বোসাংকে, উইলিয়াম জেমস্, জোসিয়া রয়েস, ডাঃ ম্যাক্‌টাগার্ট, ক্রোচে, জেমস্ এইচ. হিস্‌লপ, মেটারলিঙ্ক, সি. ফ্ল্যামারিয়ন, ডাঃ ফ্রেজার, অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতি ও কবিদের ভিতর ড্রাইডেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ম্যাথু-আর্ণল্ড, শেলী, ব্রাউনিঙ, সুফীদের মধ্যে অল্-গজলি, জামী প্রভৃতি সকলেই লোকান্তরবাদ সমর্থন করতেন।

জন্মান্তর বা পুনর্জন্মবাদের সপক্ষে স্বামী অভেদানন্দের আলোচনা পুরোপুরি যুক্তি ও বিচারসম্মত। তিনি বলেছেন: "পুনর্জন্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ক্রমবিকাশনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুনর্জন্ম বল্‌তে কোন একটি জীবাণুর নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশ ও তার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ও তেজ অব্যক্ত আকারে নিহিত থাকে তাদেরই ধীরে ধীরে পুনঃপ্রকাশ বুঝায়"।[২৩] শূন্য থেকে অকস্মাৎ কোন-কিছুর সৃষ্টি হয়নি, ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ এ'সমস্তের আবির্ভাব হয়েছে।[২৪] স্বামী অভেদানন্দ ফ্রিম্যান ক্লার্কের যুক্তি তুলে বলেছেন বিকাশ বল্‌তে শরীর ও জীবাত্মা এ' দুটির অভিব্যক্তিকে একসাথে বুঝায়, কেননা এ'ধরণের বিকাশনীতিতে বিশ্বাস না করলে জীবাত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন নূতন শরীর ধারণ করে তা প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়।[২৫] পরন্তু এর সপক্ষে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রত্যেক প্রাণীর সূক্ষ্মশরীরে পশুপ্রকৃতির মতন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বীজও সুপ্ত থাকে। জীবাণু পশুশরীরকে অবলম্বন কোরে আত্মপ্রকাশ করলে তার পশুপ্রকৃতির বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক, আবার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে জীব তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরও বিকাশ সাধন করে। কোনও একটিমাত্র শরীরে বা জন্মে নৈতিকাদি তিনটি গুণের একসাথে বিকাশ সম্ভবপর নয়। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, তাই পুনর্জন্মনীতিকে আমাদের স্বীকার করতে হবে, নচেৎ জীবাণুদেরও ক্রমবিকাশ আছে, আর প্রত্যেকটি প্রাণী যে অনেকবার জন্মায় ও নূতন নূতন শরীর ধারণ করে একথা মেনে নেওয়া যায় না।[২৬]

পুনর্জন্মনীতি কার্য-কারণ নিয়মসূত্রের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, কার্য কারণেরই অভিব্যক্ত রূপ; কারণ সুপ্ত, কার্য জাগ্রত, সুতরাং কার্য কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে। সাংখ্যকার কপিল বলেছেন: "নাশঃ কারণলয়ঃ"—নাশ বা ধ্বংস বল্‌তে বোঝায় কার্যের কারণাকারে থাকা বা স্থিতি। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাই। বিজ্ঞানের মতে, বিশ্বের যাবতীয় জিনিসের একেবারে ধ্বংস বা নাশ হয় মানেই তারা রূপান্তর গ্রহণ করে; যেমন বরফ নষ্ট হোয়ে জলের আকার ধারণ করে, আবার জল তাপের সংস্পর্শে বাস্পের আকারে পরিণত হয়। প্রত্যেক জিনিসের এই রূপায়ণ বা পরিবর্তনই ক্রমবিকাশের নীতিকে সমর্থন করে। স্বামী অভেদানন্দ কারণের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিরাট বিশ্বসমুদ্রের

২৩। অভেদানন্দ: 'রিইন্‌কারনেশন' (৫ম সং), পৃঃ ৭৭

২৪। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১১৬-১১৭

২৫। ঐ, পৃঃ ৬৬

২৬। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৬৫

ওপর একটি মাত্র দিব্য ও অনন্ত শক্তিপ্রবাহ গতিশীল; সেই অমিত শক্তিপ্রবাহই অসংখ্য তরঙ্গের আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইসব অসংখ্য তরঙ্গের এক একটিকে আমরা বলি অন্যটির কারণ।[২৭] কার্য-কারণের মধ্যে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই, এই মুহূর্তে যাকে আমরা কারণ বলি, পরমুহূর্তে তা স্থূল কার্যের আকারে প্রকাশ পায়।[২৮] মোটকথা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি কার্য-কারণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; ক্রমবিকাশ এই নিয়মকে মেনে নিয়ে সৃষ্টি ও পুনর্জন্ম-নীতিকে চিরদিন সক্রিয় কোরে রেখেছে।

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে সকল সংস্কার আমরা সৃষ্টি করি সেগুলি বীজাকারে আমাদেরি মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। কেবল যে বর্তমান জীবনের সংস্কারই সুপ্ত আকারে থাকে তা নয়, জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত সংস্কার অবচেতন মনে নিহিত থাকে। অনুকূল অবস্থা পেলে সেই সুপ্ত সংস্কারগুলি আবার জাগ্রত হয় ও চেতন স্তরে ফল দেবার জন্যে প্রকাশ পায়। শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি কর্ম ও ইচ্ছা ঐ অবচেতন মনে সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত সংস্কারের প্রেরণা অনুযায়ী আমাদের জীবদেহগুলি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেকে ঐ সংস্কারগুলির নাম দেন অদৃষ্ট বা প্রাক্তন। বেদান্তে এর নাম দেওয়া হয়েছে সূক্ষ্মশরীর অথবা অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্য। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও পরিবর্তন যদিও কারণাকারে উদ্বুদ্ধ ও ক্রিয়মান সংস্কারগুলির প্রেরণা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হয় তবুও প্রত্যেকের কর্ম, কর্মসাধনে শারীরিক বৃত্তি ও চেষ্টা—সমস্তই সূক্ষ্মশরীরে সঞ্চিত সংস্কাররাশির বহির্বিকাশ মাত্র। ঐ সংস্কারগুলির ওপর পশু ও মানবশরীরের নির্বাচন নির্ভর করে, অর্থাৎ কোন্ সংস্কার পশুশরীর অথবা কোন্ সংস্কার মানবশরীর ধারণ করবে সেই নির্বাচন তাদের প্রত্যেকের পশু বা মানবপ্রকৃতির সংস্কারের ওপর নির্ভর করে।"[২৯] যেমন, আমাদের খাবার ইচ্ছা থেকে দাঁত ও পেট, চলার ইচ্ছা থেকে পা, কথা-কওয়ার ইচ্ছা থেকে জিহ্বা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা প্রত্যেক প্রাণীর শারীরিক গঠন তার সঞ্চিত সংস্কার থেকে উৎপন্ন ইচ্ছা, চিন্তা ও প্রকৃতি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়। সংস্কারগুলি আন্তর প্রকৃতি—যাকে চলিত কথায় আমরা 'স্বভাব' বলি। এই স্বভাব বা প্রকৃতির পুনঃপুনঃ আত্মপ্রকাশের নামই পুনর্জন্ম।

গীতায় আছে: "যং যং বাপি স্মরণ-ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং, তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ,"[৩০] অথবা "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং, যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি * *"[৩১] প্রভৃতি। গীতার এই শ্লোকগুলিতে পুনর্জন্ম স্বীকার করা হয়েছে ও বলা হয়েছে যে, মৃত্যুকালে যে চিন্তা, ইচ্ছা বা বাসনা প্রবল থাকে, মৃত্যুর পর তা আরো প্রবল হয় ও সেই ইচ্ছা বা বাসনা পরলোকে জীবাত্মার আন্তর প্রকৃতি ও চরিত্রকে তদনুযায়ী গঠন

২৭। অভেদানন্দ: 'রিইন্‌কারনেশন', পৃঃ ৭৭

২৮। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ৩১-৩২

২৯। অভেদানন্দ: 'রিইন্‌কারনেশন', পৃঃ ২৫-২৬

৩০। গীতা, ৮।৬

৩১। গীতা, ৮।৫

করে। মৃত্যুর পর আন্তর প্রকৃতিই নূতন শরীর-ধারণ করার ব্যাপারে জীবাত্মাকে সাহায্য করে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, যে সকল চিন্তা, আসক্তি অথবা ইচ্ছা আমাদের আন্তর প্রকৃতিকে গড়ে তোলে তাদের মধ্যেও পুনর্জন্মগ্রহণের অনুকূল অবস্থা এবং পরিবেশকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার শক্তি নিহিত থাকে। তবে সেই নির্বাচন ও গ্রহণপ্রণালী প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর নিয়মকেই বেশীর ভাগ অনুসরণ করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুযায়ী মৃত মানুষের নূতনসৃষ্ট মনোশরীর বা সূক্ষ্মদেহ সাধারণ আবেষ্টনীর ভিতর থেকে তার বিকাশ বা জন্মের উপযোগী ক্ষেত্রকে বেছে নেয় ও তার দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। যে-সকল জীবাত্মা মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করতে চায় তাদের জন্মের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেন অবশ্য মাতাপিতা; মাতাপিতারাই আসলে সন্তানদের পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকার অংশ গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী নূতন শরীর ধারণ করায় জীবাত্মাদের বাসনাময়ী মনোবৃত্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের ক্ষেত্রের উপযুক্ত মাতাপিতাকে নির্বাচন করে ও সেই মাতাপিতাদের সাহায্য নিয়েই তারা ভোগের ক্ষেত্র পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে।"[৩২] যেমন, কোন জীবাত্মার মনে যদি প্রসিদ্ধ একজন শিল্পী হোয়ে জন্মাবার ইচ্ছা প্রবল থাকে তবে সে এমনি একটি বংশে ও মাতাপিতাকে অবলম্বন কোরে জন্মগ্রহণ করে যেখানে সে শিল্পশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে।[৩৩] ভারতীয় দর্শনে এই নিয়মটিকেই পুনর্জন্মবাদ বলা হয়, যদিও পাশ্চাত্যের অনেক মনীষী একথা স্বীকার করতে রাজী নন।

স্বামী অভেদানন্দের মতে, প্রত্যেক জীবাত্মা নূতন শরীর গ্রহণ করার পর কর্মক্ষেত্র-রূপ সংসারে তার পূর্বপূর্বজন্মকৃত কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তার সমগ্র জীবনের সুখ-শান্তি বা দুঃখ-যন্ত্রণা নির্ভর করে তার পূর্বকৃত ভাল বা মন্দ কর্ম থেকে উৎপন্ন ফলের ওপর, ঈশ্বরের সেক্ষেত্রে মোটেই হাত নেই। অনেকে বলেন যে, ঈশ্বরই যখন জগন্নিয়ন্তা ও স্রষ্টা, তাঁর প্রতিটি ইচ্ছার ইঙ্গিতে ও করুণায় যখন মানুষের জীবন পরিচালিত হয় তখন তার ভাল বা মন্দ পরিণতির জন্যে ঈশ্বরই দায়ী, মানুষ বা মানুষের কর্মফল নয়। ঈশ্বর মানুষের ভাল-মন্দ বা সুখ-দুঃখের জন্যে দায়ী হোলে তাঁর মধ্যে একদর্শিতা বা পক্ষপাতিত্ব দোষ আসা স্বাভাবিক, কেননা তিনি যদি সমদর্শী ফলদাতা হন তবে তাঁর কর্তব্য হবে সকলকেই সমানভাবে সুখ অথবা দুঃখ দান করা, অথচ পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, কেহ বড় লোক ও কেহ গরীব লোক,

৩২। অভেদানন্দ: 'পুনর্জন্মবাদ' (১৩৫৫), পৃঃ ১২

৩৩। কিন্তু এই নিয়মেরও আমরা ব্যতিক্রম দেখি; কেননা এটিই যদি সার্বভৌমিক নিয়ম হয় যে, প্রত্যেক জীবাত্মা শরীরধারণ করার আগে নিজের নিজের বিকাশের উপযোগী সাংসারিক পরিবেশ ও মাতা-পিতাদের বেছে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে জন্মগ্রহণের পরে কি শারীরিক ও কি মানসিক উভয় দিকেই তার বাধাহীন স্বচ্ছন্দ জীবন-বিকাশের সুযোগ-সুবিধা ও উপায় অব্যাহত থাকা উচিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা হয় না, সংসারে সকলের পক্ষে ইচ্ছার অনুকূল উপায়, পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা ঘটে না। মাতাপিতার চিন্তা, ভাবধারা ও ইচ্ছার সাথে পুত্রকন্যাদের মনের ঐক্য সকল দিক দিয়ে সকল সময় মেলে না, বরং প্রতিকূল ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায়।

কেহ প্রচুর সুখ-শান্তিতে বাস করে, আবার কেহ বা দুঃখ-শোকের বোঝা নিয়েই সারা জীবনকে দুর্বিসহ কোরে তোলে; ফলভোগের তারতম্য মানুষের ও সকল প্রাণীদের মধ্যেই আছে, কাজেই ভগবান এরজন্যে নিশ্চয়ই দায়ী হবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কেননা সূর্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সকল জিনিস ও প্রাণীর ওপর সমানভাবে কিরণ-বর্ষণ ও তাপ দান করে, অথবা প্রদীপ যেমন চোর ও জালিয়াত এবং পুণ্যাত্মা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ওপর সমানভাবে আলো দান করে, তেমনি নিরপেক্ষ উদাসীন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর কাকেও সুখও দেন না, বা দুঃখও দান করেন না, সুখ-দুঃখ মানুষ তার পূর্বজন্মকৃত কর্মফল অনুসারে ভোগ করে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি নাশ এদের কোনটারই কারণ নন। সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, পৃথিবীবাসী মানুষই ঐ সমস্ত গুণ ঈশ্বরের ওপর আরোপ করে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ ঈশ্বর মানুষের কোন-কিছুর জন্যে কোনদিন দায়ী হন না, কৃতকর্মের ফলই মানুষের ভাগ্য তথা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের পুনর্জন্মের জন্ম দায়ী তার কর্মফল; অপরিহার্য কার্য-কারণ-রূপ নিয়ম অনুসারে জগতের যাবতীয় কার্য ও ঘটনা নিষ্পন্ন হয়। ভারতবর্ষে কর্মফল মতবাদ মানুষের জীবনের অনন্ত সমস্যার সমাধান করেছে; পাশ্চাত্যের অনেক মনীষীও এই অপরিহার্য নীতি সমর্থন করেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করেছেন: "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।"[৩৪] অবচেতন মনে সঞ্চিত সুপ্ত সংস্কারগুলিতে যে মনঃসংযোগ করলে পূর্বপূর্বজন্মের জ্ঞান হয় তা আগেও উল্লেখ করেছি। পুরাণে জৈগীষব্য ও জড়ভরত প্রভৃতির কথা উল্লেখ আছে। অবচেতন মনে কোন সংস্কার কখনো নষ্ট হয় না। অবচেতন সংস্কার চেতন স্তরে উঠ্‌লে তাকে আমরা 'স্মৃতি' বলি। যোগীরা অবচেতন মন বা স্মৃতির ওপর মনঃসংযোগ কোরে পূর্বপূর্বজীবনের সকল ঘটনা ইচ্ছা করলে জানতে পারেন। গৌতম বুদ্ধ পাঁচশত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারতেন একথা বৌদ্ধজাতক থেকে আমরা জানতে পারি। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, পূর্বপূর্বজীবনের ঘটনার কথা না জানাই ভাল, এবং জানার কৌতূহলকে বরং দূর করাই উচিত; কারণ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য—বারংবার দেহধারণ করার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ করা। সেই অব্যাহতি পাওয়া যায় একমাত্র নিজের শাশ্বত দিব্যস্বরূপের উপলব্ধির দ্বারা। অলৌকিক বিভূতি, সিদ্ধাই বা জাতিস্মরতা লাভ করা মনুষ্যজীবনের কাম্য ও লক্ষ্য নয়। মানুষ বর্তমান জীবনের পূর্বস্মৃতির প্রভাব ও মমতাকেই এড়াতে পারে না, বরং চিত্তকে তা সর্বদাই চঞ্চল ও বহির্মুখী কোরে রাখে, সুতরাং আবার যদি অসংখ্য অতীত জীবনের ভালমন্দ কর্মের স্মৃতি মনের চেতন স্তরে ক্রিয়াশীল হয় তবে চিত্ত সংযত করা তার পক্ষে কোনদিনই সম্ভবপর নয়, আর চিত্তের সংযমন না হোলে যথার্থ শান্তি লাভ করাও হয় সুদূরপরাহত। কাজেই পূর্বপূর্বজীবনের অসংখ্য ঘটনা ও কাজকে যে আমরা স্মরণ করতে পারি না, এ আমাদের পক্ষে পরম-আশীর্বাদস্বরূপই। জাতিস্মরতাও একপ্রকার মনের শক্তি বা বিভূতি।

৩৪। পাতঞ্জলদর্শন, ৩।১৮

বিভূতি বা সিদ্ধাই মুক্তিলাভের পথে অন্তরায় এবং তা প্রবৃত্তির পথেই টেনে নিয়ে যায়। তাই সাধক কমলাকান্ত গেয়েছিলেন,

"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে,
(তুই) যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
(ও মন) কতমণি পড়ে আছে ঐ, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

চিন্তামণি-রূপ আত্মানুভূতিই মানুষের একমাত্র কাম্য, কিন্তু নাচদুয়ারের 'কতমণি' বা অসংখ্য বিভূতি-রূপ প্রলোভন সাধককে বন্ধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই পূর্ব-পূর্বজীবনের জ্ঞান বা স্মৃতি লাভ করার প্রবৃত্তিকে আমাদের বিচার কোরে ত্যাগ করাই উচিত।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, আমাদের সূক্ষ্মশরীরকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি প্রকৃতির সন্ধান পাই: একটি জৈবিক বা পশুপ্রবৃত্তি ও অপরটি নৈতিক বা অধ্যাত্ম প্রকৃতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তি থাকে, তবে দুটির প্রকাশ প্রায় একসাথে থাকে না, একটি প্রবল হোলে অপরটি অভিভূত হয়। পশুদের মধ্যে পশুপ্রকৃতির বিকাশই থাকে ও নৈতিক প্রকৃতি থাকে একেবারে স্তব্ধ ও নিদ্রিত হোয়ে। তবে কোন কোন পশু, যেমন কুকুর, ঘোড়া, গরু প্রভৃতির মধ্যে প্রভুভক্তি, আজ্ঞাবহতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ভালবাসা প্রভৃতি নৈতিক গুণের বিকাশ দেখা যায়। সে-রকম মানুষে দুটি প্রকৃতির প্রকাশ ও বিশেষ কোরে নৈতিক প্রকৃতির বিকাশ বেশী থাক্‌লেও পশুপ্রকৃতির প্রভুত্ব ও যথেচ্ছাচারিতাও দেখা যায়। সংসারে দেবমানবও যেমন থাকেন, পশুমানবেরও তেমনি অভাব নেই। পশুপ্রকৃতিতে থাকে ভোগসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতা, বিবেকের প্রকাশ মোটেই সেখানে থাকে না। কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে থাকে পরার্থপরতা, দয়া, ক্ষমা, দানশীলতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের প্রকাশ বিচার ও যুক্তির মহিমালোককে নিয়ে। মানুষের মধ্যে যত বেশী দেবপ্রকৃতির বিকাশ হয় ততই সে পশুপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তেজস্বিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা তাকে সাহায্য করে। এই সংগ্রাম চলতে থাকে জন্ম-জন্ম ধ'রে—যতদিন না চরমলক্ষ্যের সন্ধান মানুষ পায়। স্বামী অভেদানন্দ তাই উল্লেখ করেছেন: "পশুপ্রকৃতিতে কেবলই শরীরের ভোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে লালসা, নিজের দেহের ওপর ভালবাসা, মৃত্যুভয় ও সংসারের প্রত্যেকটি প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে জীবনসংগ্রাম কোরে বেঁচে থাকার চেষ্টা থাকে। অবশ্য এগুলি পশুদের ভিতরও যেমন, মানুষের ভিতরও তেমনি, পার্থক্য কেবল প্রচেষ্টার তারতম্যে, শ্রেণীর মধ্যে নয়"।[৩৫] মানুষের মধ্যে নৈতিক প্রকৃতি-গুলিকে অনেকে পশুপ্রকৃতির ক্রমপরিণতি বল্‌তে চান, কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের মতে তা ঠিক নয়। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিকশিত সদ্‌গুণগুলি কখনই পশু-প্রবৃত্তি থেকে ক্রমবিকশিত বলা যায় না।[৩৬] অধ্যাপক হাক্সলি, ক্যাড্‌ওয়ার্থ ও অন্যান্য ইংরেজ ও জার্মান দার্শনিকেরা সে-কথা স্বীকার করেন। তবে একথা ঠিক যে, অধ্যাত্ম-গুণগুলির ক্রম-

৩৫। অভেদানন্দ: 'রিইন্‌কারনেশন', পৃঃ ৫২-৫৩
৩৬। অভেদানন্দ: 'পুনর্জন্মবাদ', পৃঃ ৭০-৭১

বিকাশের পথে শুধু মানুষের কেন, সমস্ত প্রাণীর জীবনযাত্রা সফল হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের চরমপরিণতি হয় দিব্যজ্ঞান লাভ করলে। ক্রমবিকাশের সার্থকতাই তাই। পুনর্জন্মনীতি ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির মর্মকথাই প্রকাশ করে। মানুষই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হোলে জীবাত্মাকে মনুষ্যশরীরই ধারণ করতে হয় আধ্যাত্মিক সাধনার কথা ছেড়ে দিলেও। তাছাড়া দেবতারাও তো মানুষ, দেবত্ব অর্জন করেছেন, তাঁরা দিব্যপ্রকৃতির বিকাশের দ্বারা। পুনর্জন্ম-রূপ ক্রমবিকাশের সোপান প্রত্যেক প্রাণীকে ধীরে ধীরে দিব্যস্বরূপের পাদপীঠে নিয়ে উপনীত করে।

'পুনর্জন্ম' শব্দটি থেকে আমরা দুই ও ততোধিক জন্মের ধারণা পাই। একটি জন্মের পর পুনরায় দেহধারণের মধ্যে সময়ের একটি ব্যবধান পাওয়া যায়। সময় বা কাল (time) বিস্তৃতি অথবা দেশকে (space) ছেড়ে থাকৃতে পারে না, উভয়েই পরস্পরসংযুক্ত। একটি জন্মের ও আর একটি নূতন জন্মের ব্যবধানকে প্রেততত্ত্ববাদীরা প্রেতলোক বা পরলোক বলেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ঋগ্বেদাদি বৈদিক সাহিত্যে ও পুরাণ প্রভৃতিতে আমরা প্রেতলোকের পরিচয় পাই। ভূ, ভুবঃ, স্ব, মহ, জন, তপ, সত্য ও পাতালাদি চৌদ্দটি লোকের কথাও পুরাণসাহিত্যে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রত্যেকটি গ্রহ ও দেবতাদের স্থানকেও 'লোক' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যেমন সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, যমলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি। হিন্দুরা এই সকলগুলিকে স্বর্গলোকের অন্তর্ভুক্ত বোলে মনে করেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে চৌদ্দ থেকে সতের সংখ্যক সূক্তগুলির ভিতর বাহাত্তরটি মন্ত্র পাওয়া যায়, যেগুলি শবদাহ ও সমাধির প্রসঙ্গে পিতৃলোকের, পিতৃলোকের দেবতা অগ্নি, সরযূ, পূষা, যম, সরস্বতী বরুণ, সোম, মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা প্রভৃতির উদ্দেশে রচনা করা হয়েছে।[৩৭] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবযানের (১০।১৯।১) ও পিতৃযানের (১০।২।৭) উল্লেখ আছে। 'যান' বল্‌তে বুঝায় পথ। হিন্দুদের ধারণা এই যে, জীবাত্মারা মৃত্যুর পর হয় দেবযান, নয় পিতৃযান এই দুটি পথকে অতিক্রম কোরে স্বীয় অভিপ্রেত লোকে কর্মফল ভোগের জন্যে গমন করে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অনুসারে পিতৃ ও দেবতা এই দুটি পথের কল্পনা করা হয়েছে; অর্থাৎ যে সমস্ত লোক প্রবৃত্তি বা প্রবল বাসনা নিয়ে দেহত্যাগ করে তারা পিতৃলোকে যাবার জন্যে পিতৃযানকে অনুসরণ করে। তারা পিতৃলোকে কিছুকাল বাস ও ফলভোগ কোরে আবার নূতন শরীর নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাদের উদ্দেশেই গীতায় (৮।১৬) বলা হয়েছে: "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন" অথবা "তে তম্ ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯।২১)। মৃত্যুর পর পিতৃযানের পথিক প্রবৃত্তিকামী জীবাত্মাদের কিভাবে গতি হয় সে-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী প্রভৃতি উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে। এ'থেকে মৃত্যুর পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে ও পুনর্জন্মনীতি সম্ভব তা

৩৭। বাজসনেয়সংহিতা ১৯।৪৫; মৈত্রিয়াণীসংহিতা ৩।১১।১০; কাঠকসংহিতা ৩৮।২; তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৬।৩৪; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ১৯।১২; শাংখ্যায়নগৃহ্যসূত্র ৫।৯।৪; মানবশ্রৌতসূত্র ১।৮।১৯; অথর্ববেদসংহিতা ১৮।৪।৬৭; ১২।২।৪৫, ১৮।৪।৬৪, এবং আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতেও লোকাদির কথা পাওয়া যায়।

প্রমাণ হয়। মৃত্যুর পর পুনরায় দেহধারণ করার জন্যে জীবাত্মারা কি কি অবস্থার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে সে-সম্বন্ধে ছান্দোগ্যে (৫।১০।৪-৬) বর্ণিত আছে: "মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা, তদ্দেবানামন্নং, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ততে যথেতম্, আকাশম্, আকাশাদ্বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, তে ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা ইতি জায়ন্তে; অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং, যো যো হ্যন্নমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি।" 'তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি' (৫।১০।১) মন্ত্রে মৃত্যুর পর দেবযানগামীদের সম্বন্ধে ছান্দোগ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাঁরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, যে সকল বাণপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসী অরণ্যের মধ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যাজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁরা অর্চিরভিমানী দেবতাকে লাভ করেন। অর্চি থেকে অহঃ, অহঃ থেকে শুক্লপক্ষে ও সেখান থেকে উত্তরায়ণে গমন করেন। তারপর সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতিকে তিনি লাভ করেন। দক্ষিণায়ণের পর জীবাত্মারা পিতৃলোকে, আকাশে ও চন্দ্রলোকে গমন করে। চন্দ্রলোকে ভোগ শেষ হোলে আবার যে পথ দিয়ে গতি হয়েছিল সে পথেই তারা ফিরে আসে; অর্থাৎ চন্দ্রলোক থেকে আকাশে, আকাশ থেকে বায়ুতে ধূম বা অভ্রের রূপ প্রাপ্ত হয়, অভ্র থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে ধান্য-যবাদি ওষধি-বনস্পতি প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করে। তারপর পৃথিবীর প্রাণীরা সেই সমস্ত শস্য ও ওষধি খায় এবং জীবাত্মারা তখন শুক্ররূপে পরিণত হয় ও পরে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের দ্বারা স্ত্রীগর্ভে ভ্রূণরূপে জন্মগ্রহণ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৬।২।১৫) "মাসেভ্যঃ পিতৃলোক" ইত্যাদি ক্রমে প্রেতাত্মার গতি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া কৌষিতকী (১।৪), প্রশ্ন (১।৯) প্রভৃতি উপনিষদেও এর বর্ণণা আছে। গীতার "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্" প্রভৃতি শ্লোকেও (৮।২৪) জীবাত্মা বা প্রেতাত্মাদের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া স্বর্গ-নরকাদি সম্বন্ধেও বিভিন্ন ধারণা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। হিন্দুদের মতন মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসেবীদের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের এবং সাথে সাথে সৎ ও অসৎ কর্মের ভাল-মন্দ ফলভোগের জন্যে স্বর্গে ও নরকে প্রেতাত্মাদের গমনাগমনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে জন্মান্তরের ধারণা প্রায় একই রকমের পাওয়া যায়, তার কারণ সকল দেশের ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোলেও সকলের মূল বা কেন্দ্র একই। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বীজ বৈদিক যুগে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যপদেশে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই বীজই বৃক্ষের আকারে পরিণত হোয়ে ফল-ফুল সৃষ্টি করেছিল ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও নামে, কিন্তু বস্তু বা বিষয় ছিল একই ধরণের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত দেশগুলির সমাজ ও ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, মতবাদ ও বিশ্বাসের মধ্যে তাই বেশ একটি সামঞ্জস্য ও যোগসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাছাড়া মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গে (আকাশে বা ঊর্ধ্বলোকে) অথবা নরকে (পাতালে বা নিম্নলোকে) যায় এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল আদিমকালে সূর্যের উদয় ও অস্ত থেকে।

সকলদেশের আদিম অধিবাসীরা সূর্যের গতিবিধি থেকেই মৃত আত্মার স্বর্গ-নরকের ও অন্যান্য লোকে গমনাগমনের কল্পনা করেছিল। মনীষী মাস্‌পেরোর অভিমতও তাই। অবশ্য এই ধারণার জন্মভূমি ভারতবর্ষ, কেননা সকলের চেয়ে প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদে দেব, পিতৃ প্রভৃতি লোকে প্রেতাত্মাদের গমনাগমনের উল্লেখ আছে। বাণিজ্যিক সম্পর্কে পরে ভারতবর্ষ থেকে এই ধারণা ইজিপ্ট, বাবিলোন, ফিনিসিয়া ও মেডিটেরিনিয়ানের উপকূল প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে, কেননা তামুজ, এটিস, এডোনিস, ওসাইরিস, ডিমিটার, ইস্তার, সিবিলি, এ্যাফ্রোডাইট, হার্মিস, মিত্র প্রভৃতি দেবতাদের নিয়ে যে পৌরাণিকী কাহিনী গড়ে উঠেছিল তা সূর্যেরই ইতিকথা, ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে বিভিন্ন দেশে রূপায়িত হয়েছিল মাত্র। মনীষী ষ্ট্রাস, জে. এম. রবার্টসন, আর্থার ড্রুজ, কনিবিয়র প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমতও তাই। তবে স্বর্গ ও নরকে গতিবিধির চেয়ে জন্ম-মৃত্যুর ধারণারই সৃষ্টি হয়েছিল আগে। একেবারে গোড়াকার দিকে মানুষের ধারণা ছিল যে, সূর্যের জন্ম ও মৃত্যু হয় প্রতিদিন। পূর্বাকাশে উদয়ের সাথে সাথে সূর্যের হয় জন্ম ও পশ্চিমাকাশের দিকচক্রবালে ডুবে পড়ার পরই হয় তার মৃত্যু। মৃত্যুর পর সূর্য যায় পৃথিবীর নীচে এক অন্ধকার গহ্বরে, সমস্ত রাত্রি সেখানে বাস করেন ও পরের দিন সকালে আবার নবজন্ম গ্রহণ কোরে উদয়াচলে দেখা দেন। এ'ধারণা থেকেই জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু হোল কল্পিত ও সাথে সাথে অমরাত্মার ধারণাও তাতে হোল সম্পর্কিত। ইজিপ্টে পিরামিডের এবং ভারতবর্ষ, চীন, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালে পিতৃপুরুষদের পূজার পিছনেও ঐ তত্ত্ব লুকানো আছে। বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদের ভিতর পিতৃপুরুষদের পূজার রীতি সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই একমত। মাননীয় এ. ডব্লিউ. অক্সফোর্ড জেনেসিস্ (Genesis) প্রভৃতি থেকে দেখিয়েছেন যে, ইসরায়েলদের ভিতর পিতৃপুরুষের পূজার প্রচলন ছিল।[৩৮] অধ্যাপক সেয়েস প্রাচীন অকোডিয়ানদের ভিতর পিতৃপুরুষের পূজা ও স্যামানিজিম্-এর প্রচলন ছিল তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া গ্রীক, এ্যামাজুলু, হিব্রু, নিকারাগুয়ান, ডিগার ইণ্ডিয়ান ও আদিম আন্দামানী ও ব্রিটনদের ভিতরও এসব রীতি ছিল।[৩৯] ডাঃ জে. জি. ফ্রেজার বলেছেন, আফ্রিকার বণ্টুদের ভিতর, অসভ্য জুলু, থোংগা ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রি, ওয়াবেণ্ডেল, মাসাই, সুক্, নাণ্ডী, জার্মানীর আকিকুয়ূ, আপার নাইলের ডিন্‌কা, বেট্‌সিলি ও মাদাগাস্কার অন্যান্য আদিম অধিবাসী, বর্ণিয়োর ইবন্ ও রোমান-গ্রীকদের ভিতর পূর্বপুরুষকে সাপ ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের আকারে পূজা করার রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে।[৪০] যে কোন আকারে পিতৃপুরুষদের পূজা করার অর্থই তাঁদের আত্মা অমর, তাঁরা—দেহান্তরের পরও বাতাস বা কোন এক অদৃশ্য বস্তুর আকারে বেঁচে থাকেন, শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান করলে তাঁরা সূক্ষ্ম রূপ ধারণ কোরে আসেন ও নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন। হিন্দুদের ভিতর এই বিশ্বাস থাকার জন্যে তর্পণ, মাসিক, ষাণ্মাষিক ও বাৎসরিক প্রভৃতি শ্রাদ্ধের প্রচলন আছে।

৩৮। 'রিলিজিয়াস্ সিষ্টেম্স্ অব দি ওয়ার্লড্', (১৯০১), পৃঃ ৫৩-৫৭

৩৯। মেন্‌জিস্ঃ 'হিষ্ট্রী অব রিলিজিয়ন', (১৯০৮), পৃঃ ১১১-১১৩

৪০। ডাঃ ফ্রেজার: 'দি গোল্ডেন বাও' (৩য় সং), ৪র্থ ভাগ, ১ম অংশ, পৃঃ ৮২-১০৭

এবং এটি তাদের ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যেই গণ্য। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকে পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের আদর্শকে গড়ে তুলতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। এই বিশ্বাসের নিদর্শন আমরা অন্তত যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পাঁচহাজার বছর আগেকার প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যগুলির ভিতর পাই। ঋগ্বৈদিক যুগে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস অত্যন্ত বহুলভাবে ছিল এবং এরজন্যে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে অনেক ঋক্‌সূক্তও পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের সময়ে পিতৃপুরুষগণের আত্মাদের সম্ভাষণ, প্রশংসা ও আহ্বান করা হোত। 'শ্রাদ্ধ' এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ—পরলোকগত আত্মাদের উদ্দেশ্যে যে কোন শ্রদ্ধার দান। এই দানের অপরিহার্য অঙ্গ প্রার্থনা, প্রশংসা ও উপহার।"৪১

হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মতন মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান ও উপহারের প্রথা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। এই প্রথা ও সামাজিক সংস্কারের পিছনে ক্রমবিকাশ ও জন্মান্তরবাদের ভাবই সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়।

কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানের কথা আমরা অনেকে জানি। নচিকেতার পিতা বিশ্বজিৎ নামক সর্বমেধযজ্ঞে নচিকেতাকে পর্যন্ত মৃত্যু বা যমরাজের উদ্দেশে দান করেছিলেন। নচিকেতা পিতার সত্যরক্ষার জন্যে যমলোকে যান। কঠোপনিষদে অবশ্য সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, নচিকেতা সশরীর কি অশরীর অবস্থায় যমরাজের পুরীতে উপনীত হয়েছিলেন। তবে নচিকেতার কাহিনীর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পরলোক বা প্রেতলোকের ইঙ্গিত তাতে সুস্পষ্ট।

দেহান্তর ও পুনরায় দেহধারণের ব্যবধানে কালবিশিষ্ট দেশকে আমরা পরলোক বা প্রেতলোক নাম দিতে পারি। 'প্রেত' বলতে মৃত পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা। এই আত্মা সূক্ষ্ম-শরীরে মন ও স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী। সাংখ্যে একে সতেরটি অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরী বলা হয়েছে। সতেরটি অবয়ব বলতে বুঝায় ৫ কর্মেন্দ্রিয়+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫ বায়ু+মন ও বুদ্ধি। আকাশ বা বায়ুই এর শরীরের উপাদান। পার্থিব স্থূলশরীর থেকে মুখ্যপ্রাণযুক্ত আত্মা বা জীবাত্মা যখন নির্গত হয় তখন শরীরের প্রত্যেকটি অংশ থেকে তেজ ও শক্তি আকর্ষণ কোরে তা মুখ্যপ্রাণে কেন্দ্রীভূত হয়। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন:

"At the time of death, the individual contracts all its forces, all its powers and all these are centralised into a nucleus, and that nucleus retains the life,

৪১। "In India from very ancient times the belief in departed spirit has played an important part in shaping the religious ideals of the Hindus. This belief found expression in the oldest scriptural writings of the Vedic period. As early as the time of Rig Veda, which goes back at least five thousand years before the birth of Christ, this idea was very common, and there we read many hymns with invocations addressed to the *Pitris*, or departed Fathers. They were invoked, praised and invited to accept the offerings made to them at the time of the *shràddha*. The Sanskrit word *shràddha* means anything done in the memory of departed ancestors. It includes prayers, praise and offerings."
—'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৪), পৃঃ ১৬৮-১৬৯

the mind, the powers of senses, and all the impressions and experiences that the individual has gathered. Then, in the course of time, when the favourable conditions come, it manufactures another form." ৫২

প্রেতলোকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বাস কোরে জীবাত্মা আবার নূতন শরীর ধারণ করে। একটি শরীর ধারণ করার পিছনে থাকে প্রবল ইচ্ছা ও পরিবেশ-নির্বাচন। জীবাত্মার প্রবল ইচ্ছা তাকে শরীর-ধারণ করতে প্ররোচিত ও সাহায্য করে। সে উপযুক্ত বংশ ও ক্ষেত্র অনুসন্ধান কোরে আবার জন্মগ্রহণ করে। মাতাপিতাই জীবাত্মার নূতন শরীর-ধারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে বংশে ও মাতাপিতা-রূপ ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করলে অনুকূল পরিবেশ লাভ কোরে মৃত আত্মা তার বাসনা পরিপূরণ করতে পারবে সেই বংশ ও উপযুক্ত ক্ষেত্রই সে নির্বাচন করে। মৃত্যুকালে যে বাসনা প্রবল থাকে সেই বাসনাই জীবাত্মাকে পরিবেশ-নির্বাচন ও নূতন দেহ-গ্রহণের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, জীবাত্মা বা সূক্ষ্মদেহ প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুযায়ী অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে নূতন শরীর ধারণ করে ও সেই শরীর ধারণের প্রধান উপায়-স্বরূপ হন মাতাপিতা। কিন্তু মাতাপিতা জীবাত্মার আত্মা সৃষ্টি করতে পারেন না। তাছাড়া তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী কোন সন্তানেরও তাঁরা জন্মদান করতে পারেন না এবং ও' রকম করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবাত্মা মাতাপিতার কাছে এসে প্রাণজীবকে পরিপুষ্ট করে ততক্ষণ তাঁদের নিজেদের পক্ষে কোন সন্তানকে জন্মদান করা অসম্ভব। মৃতাত্মার সূক্ষ্মশরীরকে জলবিন্দুর সাথে তুলনা করা যায়। জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে জলের আকারেই থাকে, অথবা সূর্যের তাপে সূক্ষ্ম বাষ্প-রূপে মেঘের আকার ধারণ করে ও পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তা মাটির অথবা শক্ত কোন বস্তুর আকার ধারণ করতে পারে, নাশ তার কোনদিনই হয় না, তেমনি জীবাত্মারাও স্থূলশরীর ধারণ করার পর মৃত্যুর সাথে সাথে আবার সূক্ষ্মদেহে থাকতে পারে ও পুনরায় ইচ্ছার বশে পৃথিবীতে স্থূলদেহ ধারণ করতে পারে। অসংখ্য জন্ম ও মৃত্যুর ধারাবাহিক গতি যেন একটি চক্র সৃষ্টি করে—যে চক্র ক্রমাগতই গতিশীল, বিরাম তার কোনদিন নেই। প্রত্যেক জীবাত্মাই জন্ম, মরণ, ইহলোক ও পরলোক-রূপ চক্র সৃষ্টি কোরে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে অনন্তের দিকে। এই অবিরাম গতির কারণ জীবাত্মার অতৃপ্ত বাসনা, পার্থিব ভোগসুখের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ। যেদিন বা যে মুহূর্তে বাসনা ও অজ্ঞানের নাগপাশ সে ছিন্ন করতে পারে সেদিন বা সেই মুহূর্তেই তার যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হয়, জন্ম-মৃত্যুর পথে বা ইহলোক-পরলোকে যাওয়া-আসা-রূপ ক্লান্তি আর তাকে পরিশ্রান্ত করতে পারে না, নিজের শাশ্বত মহিমা উপলব্ধি কোরে তখন সে ধন্য হয়।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, মৃত্যুর যতরকম দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকনা না কেন, মৃত্যু বলতে বুঝায় স্থূলশরীর থেকে মুখ্যপ্রাণ বায়ুর উৎক্রমণ। এই মুখ্যপ্রাণই জীবনীশক্তি। মুখ্যপ্রাণ সাধারণত বায়ু নামে পরিচিত হোলেও তা তেজ, বীর্য ও শক্তির আধার। প্রাণীর

৫২। অভেদানন্দ: 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৪), পৃঃ ৯৮—৯৯

সকল-কিছু শক্তি, ব্যক্তিত্ব, গুণ মুখ্যপ্রাণযুক্ত সূক্ষ্মশরীরে নিহিত থাকে। মৃত্যুর সময়ে বেশীর ভাগ মানুষই সংজ্ঞাহীন হোয়ে যায়। এই অচৈতন্যের অবস্থা কেবল বাহ্যজগতের ব্যাপারে হয়, অন্তরে সে সচেতনই থাকে। মৃত্যুর ঠিক কিছু আগে মানুষের মনের সকল বাসনা প্রবল হোয়ে ওঠে, অতৃপ্ত প্রবৃত্তি ও বাসনার জন্যে মন তখন আকুল হয়, সুতরাং অসহ্য যন্ত্রণাভোগই হয় তখন জীবনের একমাত্র সম্বল। ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজনের বিয়োগচিন্তা মানুষকে তখন পাগল করে। মন-সমুদ্রে সৃষ্টি হয় উত্তাল তরঙ্গরাশি। মূর্ছিত অবস্থায় মানুষের অতৃপ্ত আত্মা পার্থিব শরীরকে ত্যাগ কোরে বায়ুপথে চলে যায়। সংসারের ভোগসুখে আসক্তি যাদের বেশী তাদের মনের অবস্থা তখন হয় দুর্বিসহ, কিন্তু সংযতচিত্ত বিচারশীল মানুষের অবস্থা সে সময়ে ততো দুঃখজনক হয় না। আত্মজ্ঞানী পুরুষদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তাঁরা ইহলোকের সকল বন্ধন ও বাসনা থেকে চিরমুক্ত হন, সুতরাং মৃত্যুর পর দিব্যস্বরূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই হয় তখন তাঁদের একমাত্র গতি। বাসনাসক্ত সাধারণ মানুষের জীবাত্মা যখন অন্ধকারের মধ্যে কোন পথ খুঁজে না পেয়ে বিপর্যস্ত হয়, বিচারবান সাধক ও জ্ঞানীদের আত্মা জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে তখন কল্যাণের পথ খুঁজে পায়।

স্বামী অভেদানন্দের মতে, সত্যিই যারা বিষয়াসক্ত মানুষ, মৃত্যুর পর তাদের প্রেতাত্মা অত্যন্ত কষ্ট পায়। মৃত্যুর কিছু আগে বেশীর ভাগ লোক মূর্ছিত অবস্থায় দেহত্যাগ করে তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রাণবায়ু তাদের ঐ অচেতন অবস্থায় পরলোকে যাত্রা করে। পরলোকে বা প্রেতলোকে গিয়েও কিছুক্ষণ, অথবা কারো কারো দু'তিন দিন পর্যন্ত জ্ঞান মোটেই ফিরে আসে না, আর সেজন্যে সে বুঝতেই পারে না যে সত্যিই তার দেহত্যাগ হয়েছে কি-না। জ্ঞান বা চেতনা ফিরে এলে তখন বুঝতে পারে স্থূলশরীরে সে নাই, তখনি তার অত্যন্ত কষ্ট হয়। পূর্বসংস্কার অনুযায়ী পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কাজ কিন্তু চলতেই থাকে, তাই সে বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়বর্গের কান্না ও হা-হুতাশ শুনতে পায়, তাদের দেখতেও পায়, কিন্তু স্থূলদেহ না থাকার জন্যে কিছুই করতে পারে না, অসহায় অবস্থায় মানসনেত্রে দেখে মাত্র, তাই মনে দুঃখ-যন্ত্রণাও সে পায় নিদারুণ। তবে তার মনের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হোলে মিডিয়ামের সাহায্যে, অথবা মানুষের শরীর থেকে যে ধোঁয়ার মতন এক ধরণের বায়বীয় পদার্থ বার হয় তার সাহায্য নিয়ে শরীর ধারণ কোরে আত্মীয়স্বজনদের সে দেখা দিতেও পারে। ঐ ধোঁয়ার মতন পদার্থটির নাম 'এক্টোপ্লাজম্'। প্রবল ইচ্ছা ও সংস্কারের বশে পূর্বেকার মতন শরীর ধারণ করতে পারলেও সে-শরীর মুহূর্তমাত্র থাকে, তারপর গলে বাতাসে মিশিয়ে যায়। শরীর যে প্রেতাত্মারা ধারণ করে সে-সম্বন্ধে অনেকে আবার জানতেও পারে না, আর সেজন্যে তারা শরীরকে সেই অবস্থায় বেশীক্ষণ ধরে রাখতেও পারে না। পরিত্যক্ত স্থূলশরীরের ওপর প্রেতাত্মাদের অত্যন্ত মায়া ও আকর্ষণ থাকে, তাই স্থূলশরীরটিকে যতশীঘ্র সম্ভব নষ্ট কোরে ফেলা ভাল। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, এজন্যে হিন্দুদের শবদাহপ্রথাই প্রশস্ত ও বিজ্ঞানসম্মত।

মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরে প্রেতাত্মাদের অদৃষ্টে কি ঘটে সে-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন: "মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরের আবরণ ধারণ কোরে ইহলোক ও পরলোকের

মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে; সেখানেই পৃথিবীর এলাকা শেষ হয়েছে ও প্রেতলোকের বিস্তৃতি আরম্ভ হয়েছে। তাকেই 'সীমানা' বা 'বর্ডারল্যাণ্ড' *(border-land)* বলে। তবে আসলে তাকে কোন স্থান, ক্ষেত্র বা স্তর বলা যায় না, কেননা দিগন্ত বা বাইরের কোন দেশ-রূপ সীমার নির্ধারণ বলতে সেখানে কিছু নেই। তাকে তাই একরকম ভিন্ন ধরণের স্পন্দনের (vibration) অবস্থা বলা যায়। প্রত্যেক জীবাত্মা স্থূলশরীর থেকে নির্গত হবার সময়ে নিজের নিজের স্পন্দনকে সাথে নিয়ে যায়। তার চিন্তাধারা বা ভাবধারা সমস্তই স্পন্দন ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবাত্মা যেন স্পন্দন বা কম্পনের একটি কেন্দ্রবিশেষ এবং তা থেকে স্পন্দন ক্রমাগতই বিচ্ছুরিত হয়। একজনের স্পন্দনের সাথে অপরের স্পন্দনের কোনদিনই সংঘর্ষ বা বিরোধ হয় না। মৃত্যুর পর জীবাত্মা তার স্পন্দনাত্মক সংস্কারগুলিকে নিজের লোকে (স্তরে) বহন কোরে নিয়ে যায় এবং যতদিন না গাঢ়নিদ্রার কোলে অভিভূত হোয়ে পড়ে ততদিন কিছুদিনের জন্যে সে সেই স্তরেই বাস করে। পৃথিবীলোকে অবিশ্রান্ত দৈহিক পরিশ্রমের পর প্রেতলোকে তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় এবং তখনকার গভীরনিদ্রাই তারপক্ষে শ্রান্তিপূর্ণ বিশ্রাম। গাঢ়নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লে সেই অজ্ঞাত রাজ্যে কেউ আর তাকে জাগ্রত করে না, এমনকি ঈশ্বরও সুষুপ্ত প্রেতাত্মার নিদ্রাভঙ্গ করেন না। কিন্তু এই পৃথিবীলোক থেকে যারা দারুণ উদ্বেগ, মনস্তাপ, বাসনা ও দুঃখকষ্ট নিয়ে প্রেতলোকে যায়, তাদের মোটেই নিদ্রা শান্তিপূর্ণ হয় না, নিদ্রার শান্তি তাদের পুনঃপুনঃ ব্যাহত হয়, কেননা স্বপ্নলোকের মধ্যে থেকেও পৃথিবীলোকের প্রতি তীব্র আসক্তি ও আকর্ষণের জন্যে তারা মানসনেত্রে দেখে যে, তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সকলেই শোক ও দুঃখ করছে। প্রেতলোকেই নিদ্রাচরের মতন তাই তারা সর্বদা চলাফেরা করে, অথবা আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আকর্ষণের জন্যে তাদের পুনরায় পৃথিবীলোকে নেমে আসতে হয়। নিদ্রার অবস্থায় বিদেহী আত্মারা অনেক সময় তাদের ভাই-বন্ধু, মাতাপিতা বা সন্তানদের কাছে ছুটে এসে তাদের সাহায্য করতে ও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের চেষ্টা বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তারা নিজেরা মোটেই সচেতন থাকে না, অর্থাৎ তারা যে কি করছে সে-সম্বন্ধে মোটেই জানতে পারে না। অনেক প্রেতাত্মা আছে—যারা মৃত্যুর পরও চেতনা হারায় না, পৃথিবীলোকের সকল জ্ঞানই তাদের জাগ্রত থাকে, কিন্তু তবুও তারা জানতে পারে না যে, স্থূলশরীর তাদের নষ্ট হোয়ে গেছে। মৃত্যুর কথাও অনেক সময় তারা জানতে পারে না। সে সময়ে যেন তারা ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে যায়। সত্যিকারের অবস্থা, অর্থাৎ তারা সত্যিই যে মরে গেছে একথা বোঝার জন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, আর তাই পৃথিবীলোকের মায়া-মমতার মধ্যে তারা কিছুক্ষণ বা কিছুদিন আবদ্ধ হোয়ে থাকে। পৃথিবীতে কাকেও যদি তারা অত্যন্ত ভালবেসে থাকে, কিংবা কোন আত্মীয়স্বজনের ওপর যদি তাদের প্রবল আকর্ষণ থাকে তবে প্রেতশরীর নিয়েই সেই প্রিয়জন বা আত্মীয়স্বজনদের চারপাশে তারা ঘুরে বেড়ায় এতটুকু মাত্র সমবেদনা ও সান্ত্বনা পাবার জন্যে; কিন্তু যখনি বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনেরা তাদের কোন সম্ভাষণ না জানায় বা তাদের চিনতে না পারে তখনি তারা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিচলিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক আতিবাহিক

জীবাত্মা নিজের নিজের উপযোগী পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টির কারণ যা অবলম্বন স্বরূপ হয় তাদের চিন্তা ও পৃথিবীলোকে কৃতকর্ম।"১৩

ইহলোক ও পরলোকের সীমানা দুটি যেখানে মিশেছে ইংরেজীতে তাকে 'বর্ডার ল্যাণ্ড' বলে। হিন্দুরা তাকে 'বৈতরণী', পার্শীরা 'চিন্নৎ-ব্রিজ' ও মুসলমানেরা 'সিরাৎ' বলেন। হিন্দুশাস্ত্রে বৈতরণীকে নদী বোলে কল্পনা করা হয়েছে ; সেই নদীর জল উত্তপ্ত ও খরস্রোতযুক্ত। প্রত্যেক প্রেতাত্মাকেই সেই নদী পার হোয়ে যমপুরীতে উপস্থিত হোতে হয়। সেই বৈতরণী নদী পার হোতে পুণ্যাত্মাদের কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু বাসনাসক্ত আত্মারা অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা পায়। আসলে পৃথিবীলোক ও প্রেতলোকের নিরপেক্ষ সীমানায় উত্তপ্ত

১৩। "The soul remaining clothed with the finer garment of the subtle body, enters the border-land, where this earth ends and the new spirit-world begins. This is called the *border-land.* It is not a land; there is no line of demarcation in the external space like the horizon. It is the different state of vibration. * * So each individual soul which passes out of the body takes his own vibration with him. His thoughts, his ideas, all these are nothing but vibrations, and he is the centre radiating all these vibrations constantly; and he takes them with him, and therefore he does not interfere with any other centre of vibration. He carries them in his own realm, and there he remains for some time, until he may go into a state of slumber, which is a sleep-state, because the exhaustion after doing all his physical labour and after living on this earth-life, is so great that the soul likes to rest and remains in that restful sleep. Nothing can disturb the soul when it enters into that sleep. Even God cannot disturb the sleeping soul. But those who have passed out in anxiety, in sorrow, in suffering, will have a disturbed sleep. They cannot go into a perfect rest. But on attachment they dream that their earthly friends and relatives weep and wail and grieve; they are dragged down. They walk, as it were, in sleep, like a somnambulist, a half sleeping, drowsy state. * * They are dragged down by the invocations of their friends, and they come and try in their dream state to help them, but they do not know what they are doing. There are certain souls who have the consciousness, and who retain consciousness, but they do not know that they are dead. They are in a state of confusion. It requires some time for them to realise that they are dead. They remain some time earth-bound. If they have strong attachment for their friends and relatives whom they loved so much on earth, they hover around them, but it causes them great sorrow and suffering when their friends and relatives do not recognise their presence and do not treat them properly. So each soul will make his own environment and his own condition, according to his thought and deed."—অভেদানন্দ : 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৪), পৃঃ ২০২—২০৩

জলবাহী কোন নদী নাই, পরন্তু ঐ স্থানটি আকাশ তথা গতিহীন ইথারের একটি সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী-বিশেষ। ওটিকে neutral zone বা No-man's land বলা যায়, কেননা ওইটি উভয় দিকের সমতারক্ষক নিরপেক্ষ স্থানবিশেষ। উপনিষদে ওই নিরপেক্ষ স্থানটিকে অসূর্য তথা অন্ধকারময় লোক বোলে কল্পনা করা হয়েছে—"অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ, তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ"।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, জীবাত্মা যখন বায়ুর আকারে প্রাণীমাত্রের স্থূলদেহ থেকে নির্গত হয় তখন তার আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফ) তোলা যায়। সেই আলোকচিত্র গ্রহণের ক্যামেরা অত্যন্ত সূক্ষ্মযন্ত্রবিশিষ্ট। আমেরিকায় প্রেততত্ত্ব-অনুশীলনী সভার উদ্যোগে পরলোকগামী আত্মাদের অনেক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেত-শরীর তথা বায়বীয় সূক্ষ্মদেহী আত্মাকে ওজন করারও অতিসূক্ষ্ম যন্ত্র আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত্যুর ঠিক আগে ও পরে স্থূলদেহকে ওজন কোরে নির্ণয় করা হয়েছে যে, প্রেতশরীরের ওজন আধ অথবা তিনকোয়ার্টার আউন্স। মৃত আত্মার আলোকচিত্র গ্রহণের সময় দেখা গেছে যে, তা জ্যোতির্ময়—যেন তেজঃপদার্থ। একেই 'এক্টোপ্লাজ্‌ম্‌' বলে। এক্টোপ্লাজ্‌ম্‌ প্রত্যেক লোকের শরীর থেকেই নির্গত হয়। বিশেষ কোরে মাধ্যম বা মিডিয়াম যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে তখন তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজোময় এক্টোপ্লাজ্‌ম্‌ নির্গত হোতে থাকে। এক্টোপ্লাজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উল্লেখ করেছেন :

"I have handled it, touched it, There is the particular feeling when we feel *Ectoplasm*. It cannot be described. But when it takes a definite shape, it becomes almost like solid, like flesh of our own body. It can take any form."[৪৪]

স্বামী অভেদানন্দ প্রেততত্ত্বের যথেষ্টরকম আলোচনা করেছিলেন আমেরিকায় থাকতে। আমেরিকায় তদানীন্তন সমস্ত প্রখ্যাত প্রেততত্ত্ব-অনুশীলনকারী মনীষীদের সাথে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ আমেরিকার অন্যতম 'প্রেততত্ত্ব-অনুশীলন-সমিতি'-র (সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটী) তিনি সভাপতি ছিলেন। ইংরেজী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরার পর কলকাতা 'প্রেততত্ত্ব-অনুশীলন-সমিতি'-রও তিনি এক বৎসর যাবৎ সভাপতি ছিলেন। সিয়ান্স (প্রেত-আহ্বাহক বৈঠক) প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। অনেক প্রেতাত্মার তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাদের স্পর্শানুভবও তিনি করেছিলেন। বহুদিনের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা থেকে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলতেন, প্রেতলোক ও মৃত আত্মার অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নেই, তবে লোকাদি যেমন প্রেতলোক,

৪৪। অভেদানন্দ : 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৪), পৃঃ ৪১-৪২

এক্টোপ্লাজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ আরো বলেছেন : "This *Ectoplasm* is a substance which contains finer matter in vibration, and this finer matter forms the under-garment of the soul, and the gross physical body is the outer garment."—'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' (১৯৪৪), পৃঃ ৪২

স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক এসমস্ত মানুষের মানসিক সৃষ্টি: জ্ঞান বা অনুভূতিরই এগুলি স্তর বা অবস্থামাত্র। মৃত্যুর পর জীবাত্মা এমন একটি রহস্যময় স্বপ্নলোকে বাস করে যার সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা পৃথিবীবাসী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মাঝখানের একটি ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা আছে যেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মা অপেক্ষা করে। ঐ অজ্ঞাতরাজ্যে চন্দ্র, সূর্য বা গ্রহতারা না থাকায় নির্দিষ্ট সময়েরও কোন পরিমাপ নেই, পৃথিবীলোকের এক বৎসর বা একশত বৎসর রহস্যময় প্রেতলোকের একমুহূর্ত বা একদিনমাত্র হোতে পারে। আসলে সেটি মনেরই রাজ্য; খাওয়া-পরা, চলা-বলা, অনুভূতি, দেখাশোনা সমস্তই সেখানে মন দিয়ে হয়। স্বপ্নের অবস্থায় আমাদের যে গতি ও অনুভূতি হয়, পরলোকেও ঠিক তেমনি হয়; দর্শনকারেরা তাই স্বপ্নকে প্রেতলোকের সাথে তুলনা করেছেন। জীবাত্মার মৃত্যুর আগে যেমন মূর্ছিত অবস্থা হয়, প্রেতলোক থেকে পৃথিবীলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করার পূর্বেও ঠিক তেমনি ধরণের অচেতন অবস্থা হয়। পুনর্জন্মবাদের নিয়মও তাই যে, যতটুকু অভিজ্ঞতা ও মনের প্রসার হয় বর্তমান জন্মে, পরজন্মে ঠিক তারপর থেকে হয় আরম্ভ।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর পূর্বে যেখানে তার কর্ম ও জীবনের প্রবাহ শেষ করেছে, পরজীবনে ঠিক সেখান থেকে আবার আরম্ভ অভিযান করে এবং সেই ধারাবাহিক বিকাশের গতি সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে।"[৪৫] জীবাত্মার যাওয়া-আসার ধারা অনন্তকাল ধরে চল্‌তে থাকে যতদিন পর্যন্ত না সে তার দিব্যস্বরূপকে উপলব্ধি কর্‌তে পারে।

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, পৃথিবীলোক থেকে পরলোকবাসী আত্মাদের সাহায্য করা যায়। পরলোক (spirit-world) ও মনোলোকে (mental world) বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। মনের জগতেই প্রেতাত্মারা বাস করে, তাই তাদের কল্যাণ বা মঙ্গল করতে গেলে তাদের আত্মার উদ্দেশ্যে 'প্রার্থনা' করতে হয়। মনে মনে চিন্তা করতে হয় যে, 'পরলোক-বাসী আত্মার মঙ্গল হোক, সে শান্তিলাভ করুক'। এরকম কল্যাণচিন্তা ও প্রার্থনাই একমাত্র তাদের উপকার ও মঙ্গলসাধন করে। কোন পার্থিব স্থূল জিনিস দিয়ে তাদের কোনদিনই সাহায্য করা যায় না। মনের কল্যাণ-চিন্তা তরঙ্গের আকারে পরলোকবাসীদের কাছে পৌঁছায় ও তাদের যথার্থ উপকারসাধন করে, তাদের মনে শান্তি দেয়। পরলোকগত আত্মাদের উদ্দেশ্যে কখনো শোকদুঃখ করতে নেই, কারণ তাতে তাদের অকল্যাণ করা হয়। তাই সত্যিই যাঁরা পরলোকগত আত্মাদের মঙ্গল ও শান্তি চান তাঁরা যেন সর্বদা তাদের জন্যে কল্যাণ প্রার্থনা করেন। অনেকে ভুলবশতঃ মনে করেন যে, পরলোকগত আত্মা আবার স্থূলশরীর নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে, কেননা ভালবাসার আকর্ষণ সে ছিন্ন করতে পারে না, কিন্তু এটা নিতান্ত ভুল। যে আত্মা একবার পৃথিবীলোক ছেড়ে চলে গেছে সে কোনদিনই আর ফিরে আস্‌তে পারে না, বরং তাদের ফিরে আসার আশা পোষণ করাই অন্যায়। পরলোকগত আত্মারা সূক্ষ্ম-আতিবাহিক দেহে প্রেতলোকে (মনোলোকে) থাকে তা আগেই বলেছি। অনেকে মাধ্যম বা মিডিয়ামের সাহায্যে তাদের পৃথিবীলোকে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করেন। অবশ্য মিডিয়ামের সাহায্যে প্রেতাত্মাদের আত্মীয়-

৪৫। অভেদানন্দ: (১) 'রিইন্‌কারনেশন' (৫ম সং), পৃঃ ৮৩; (২) 'পুনর্জন্মবাদ' (১৩৫৫); পৃঃ ১০৯

স্বজনের কাছে টেনে আনা সম্ভব, কিন্তু এতে তাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, কারণ পৃথিবীলোকের পরিবেশ ও বায়ুকম্পন (vibration) তারা আদৌ সহ্য করতে পারে না। তাই কৌতূহল-চরিতার্থের জন্যে সিয়ান্স বা কোন-কিছু বৈঠকের সাহায্যে প্রেতলোক থেকে আত্মাদের টেনে আনা অন্যায় ও অসঙ্গত।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, অনেকের আবার ধারণা যে, জীবাত্মা স্থূলশরীর ত্যাগ করলেই সাংসারিক সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। অনেকে তাই আত্মহত্যাও করে। কিন্তু এরকম মনে করা একান্ত ভুল। সুখ দুঃখ আসলে স্থূলশরীরে থাকে না, মনই অনুভূতির আশ্রয়। মনেই সুখ, দুঃখ, মান-অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রেম, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি সৎ ও অসৎ গুণগুলি সংস্কারের আকারে নিহিত থাকে। মনই সূক্ষ্মদেহী প্রেতাত্মার আশ্রয়, সুতরাং মন যখন মৃত্যুর পরেও থাকে তখন সৎ-অসৎ বৃত্তি বা গুণগুলিও মনে থাকে, কোনটাই নষ্ট হয় না। বরং একথাই সত্যি যে, জীবিত-কালে যে মানসিক গুণ বা বৃত্তিগুলি সুপ্ত আকারে থাকে, মৃত্যুর পর সেগুলি বেশ প্রবল আকার ধারণ করে। তাই সাধক ও যোগীরা পৃথিবীতে জীবিতকালেই মনকে সংযত ও শান্ত করতে চেষ্টা করেন। সংযতচিত্ত ও সৎপ্রকৃতির জীবাত্মারা মৃত্যুর পর মোটেই দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেন না, বরং তাঁরা শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে সময়াতিপাত করেন।

জন্ম-মৃত্যুর প্রহেলিকা দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই। আত্মা শাশ্বত, তাঁর বিকার ও মৃত্যু কোনদিন নেই; মৃত্যু হয় দেহের, মনের, বুদ্ধির বা জাগতিক জ্ঞানের। ক্রমা-ভিব্যক্তির সোপান এই জন্ম-মৃত্যুরূপ উপাদান দিয়ে তৈরী। পরলোক ও পরজীবন ইহলোক ও ইহজীবনেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলি বর্তমানের চিন্তা ও কর্মধারা দিয়ে; আমরাই আমাদের পরলোকের পরিবেশ ও ভাগ্যকে সৃষ্টি করি ইহজীবনের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে। আমরাই আমাদের অদৃষ্ট, স্বভাব বা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে কর্মের সাহায্যে গড়ে তুলি। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিই মনুষ্যজীবনের কাম্য ও লক্ষ্য, আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধিই ক্রমাভিব্যক্তি ও পুনর্জন্মের উদ্দেশ্য। স্বামী অভেদানন্দ তাই উল্লেখ করেছেন,

"We must realise that the life after death is the continuation of the present life and we make our future according to our thoughts and deeds. We are the creators of our destiny, of our characters, of our future, and we will continue to live and come back and be born again on earth or on some other planet. * * There is no end of experiences, but a perfected soul reaches that state where there is no more birth, no more death, and no more disease, sorrow and suffering." ৪৬

অভিব্যক্তি ও জন্মান্তর-ব্যাপারে স্বামী অভেদানন্দের একটি স্বাধীন মতবাদ আছে এবং তা যুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ক্রমবিকাশ বলতে অগ্রগতিশীল অভিব্যক্তি স্বীকার করেন, কেননা তিনি বলেছেন: "পুনর্জন্মবাদ থেকে আমরা একথাও জানতে পারি যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় পশুশরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, কারণ

৪৬। অভেদানন্দ: 'রিইনকারনেশন' (৫ম সং)

প্রত্যেক মানুষ বা প্রাণী তার নিজের নিজের প্রবৃত্তি, বাসনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শরীর ধারণ করে। বাসনা ও প্রবৃত্তিই শরীর-ধারণের একমাত্র কারণ। সুতরাং যদি কোন লোক ইচ্ছা করে যে, মৃত্যুর পর পৃথিবী বা অন্য কোন লোকে সে আর জন্মগ্রহণ করবে না, নির্দিষ্ট কোন প্রীতিকর বস্তু উপভোগ করবে না এবং সত্যিই যদি স্বার্থপরতা ও কামনার পঙ্কিলতা থেকে চিরমুক্ত হয় তবে নিশ্চয়ই সে আর কখনো পৃথিবীলোকে শরীর ধারণ কোরো জন্মগ্রহণ করবে না"। একজন্মবাদীদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি জাতিরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর শূন্য থেকে প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, মানুষই পৃথিবীতে সকলের আগে জন্মগ্রহণ করেছে, জন্মের আগে তাদের কোনই অস্তিত্ব ছিল না; মৃত্যুর পরে তারা হয় অনন্ত স্বর্গ—নয় অনন্ত নরক ভোগ করে। হিন্দুরা কিন্তু একথা আদৌ বিশ্বাস করেন না।

স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, অনেক দার্শনিক লোকান্তর বা পুনর্জন্মবাদ বলতে বুঝেন—দেহান্তর-গ্রহণ, অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রাণীদের আত্মা মনুষ্য বা জীবজন্তু যে কোন একটি শরীর থেকে শরীরান্তরে গমন কোরে জন্মগ্রহণ করতে পারে। গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস, প্লেটো ও তাঁর অনুবর্তীদের মতে—মনুষ্যশরীর ধারণ করার পরও জীবাত্মা যে-কোন পশুশরীর ধারণ করতে পারে। পাইথাগোরাস বলেছেন: 'প্রজ্ঞাবান জীবাত্মার মৃত্যু হোলে সে পার্থিব দেহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হোয়ে বায়বীয় শরীর ধারণ করে এবং যতদিন পর্যন্ত না আবার কোন মনুষ্য বা পশুশরীরকে আশ্রয় করে ততদিন সে বায়ুশরীর নিয়েই প্রেতলোকে বাস করে'। অবশ্য পাইথাগোরস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণের চিন্তার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ধারণার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, কেননা হিন্দুশাস্ত্রেও আমরা মনুষ্য-শরীর থেকে জীবাত্মার নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর শরীরে সংসরণের কথার উল্লেখ পাই। প্লেটো তাঁর 'ফিউড্রাস' বইয়ে মৃত আত্মারা কেন ও কেমন কোরে মনুষ্য বা পশুশরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে-সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনার ভিতর গীতা ও কঠোপনিষদের প্রভাব বা ভাব সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে আছে,

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥[৪৭]

'শরীরের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ বা লাগাম বোলে মনে করতে হয়। মনীষীরা শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে শরীররথের চালক অশ্ব, শব্দাদি বিষয়কে অশ্বগণের গোচর বা বিচরণস্থান এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনবিশিষ্ট জীবাত্মাকে ভোক্তা বোলে বর্ণনা

৪৭। কঠোপনিষৎ ১।৩।৩—৬

করেন। কিন্তু যে বুদ্ধি-রূপ সারথি সর্বদা অসংযত মনের সাথে যুক্ত, অপর সারথির দুষ্ট অশ্বের মতন তার ইন্দ্রিয়েরাও বশীভূত থাকে না, বরং বিপথগামী হয়। কিন্তু যিনি নিয়ত সংযত মনে কোন্‌টি গ্রহণ করা কর্তব্য ও কোন্‌টি কর্তব্য নয়—এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন, সারথির শিক্ষিত অশ্বদের মতন তার ইন্দ্রিয়েরা আজ্ঞানুবর্তী হয়। মোটকথা বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যার সারথি, মন যাঁর ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বগণের সংযমনের রজ্জু, তিনি পরমপদ-রূপ মুক্তি লাভ করেন।'.

কঠোপনিষদের শিক্ষাগুলির মতন প্লেটোও তাঁর 'ফিউড্রাস্' বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

" * * let us say that the soul resembles the combined efficacy of a pair of winged steeds and a charioteer. Now the horses and drivers of the gods are all both good themselves and of good extraction, but the character and breed of all others is mixed. In the first place, with us men the supreme ruler has a pair of horses to manage, and then of these horses he finds one generous and of generous breed, the other of opposite descent and of opposite character. * * When it is perfect and fully feathered it roams in upper air, and regulates the entire universe; but the soul that has lost its feathers is carried down till it finds some solid resting place; * * * Now the chariots of the gods being of equal poise, and obedient to the rein, move easily, but all others with difficulty; for they are burdened by the horses of vicious temper, which sways and sinks them towards the earth, haply he has received no good training from his charioteer".[৪৮]

প্লেটো 'ফিউড্রাস্' বইয়ে গল্পের ভিতর দিয়ে জীবাত্মার সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা ঔপনিষদিক বাণীরই প্রতিধ্বনি। সদসৎ কর্মের জন্যে জীবাত্মার ভালমন্দ গতির এবং উপনিষদের মতন মন্দ কর্মের ফলে যে মানবাত্মা পশু-পক্ষীদের শরীরেও আবার জন্মগ্রহণ করে এ সকল কথা প্লেটো স্বীকার করেছেন আবার আত্মার অবিনশ্বরত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ফিউড্রাস্-এ তিনি লিখেছেন :

(a) "Every soul is immortal—for whatever is in perpetual motion is immortal. ** Again, since it is uncreated, it must also of necessity be indestructible."[৪৯]

(b) "And then it is that a human soul passes into the life of a beast, and from a beast who was once a man the soul comes back into a man again."[৫০]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, প্লেটো বিশ্বাস করেন যে, কোন কোন জীবাত্মা মনুষ্যদেহে বীতশ্রদ্ধ হোয়ে সিংহ, ঈগল প্রভৃতি পশু-পক্ষীরূপে জন্ম গ্রহণ করতে পছন্দ

৪৮। (ক) 'ফাইভ ডায়ালগ্‌স অব প্লেটো' (এভ্‌রি ম্যানস্ সিরিজ, ১৯৩১), পৃঃ ২৩১-২৩৪

(খ) এ, ই, টেলর : 'প্লেটো দি ম্যান এ্যাণ্ড হিজ্‌ ওয়ার্ক', (১৯২৬), পৃঃ ৩০৭

(গ) অভেদানন্দ : 'রিইন্‌কারনেশন' (৫ম সং), পৃং ৮৯, (ঘ) ডাঃ যু-জল্যাল্ কাণ্ড : 'এ কম্‌পারেটিভ ষ্টাডি অব লাইফ আইডিয়াজ্‌' (১৯২৫), পৃ' ৪১—৪৪

৪৯। 'ফাইভ ডায়ালগ্‌স অব প্লেটো' (এভ্‌রি ম্যানস্ সিরিজ), পৃঃ ২৩০

৫০। ঐ, পৃঃ ২৩৫

করে। অপরে তাদের ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে মনুষ্যশরীরই ধারণ করে।[৫১] কিন্তু অনেক চিন্তাশীল মনীষী প্লেটো-সমর্থিত পুনর্জন্মনীতি সমর্থন করেন না। ডাঃ মায়ার্স তাঁর সুবিখ্যাত 'হিউম্যান পার্সোনালিটি' বইয়ে প্লেটোর এই নীতির যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন।[৫২] প্লেটোর মতন পাইথাগোরাস, ভার্জিল প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা মনুষ্য-শরীর ধারণ করার পরও জীবাত্মা পশুপক্ষীর শরীর ধারণ করতে পারে এই নীতি সমর্থন করলেও গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর অনেকে কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নি দেখা যায়। যেমন, ডাঃ ইনজ্ লিখেছেন, প্রোফাইরি ও আইয়াম্রি-কাসের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে মতবাদ ছিল যে, মানবশরীর ধারণ করার পর জীবাত্মা কখনোই আর পশুপক্ষীদের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। ডাঃ প্রিঙ্গল-প্যাটিসন তাঁর 'দি আইডিয়া অব ইম্মরটালিটি' বইয়ে ক্রমবিকাশ ও জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে জীবাত্মা যে মনুষ্যজন্ম গ্রহণের পর আবার মনুষ্যশরীরই ধারণ করে এই অভিমত সমর্থন করেছেন।[৫৩] স্বামী অভেদানন্দ মানবাত্মার পশুপক্ষীদের শরীরে ফিরে যাওয়ার নীতি সমর্থন করেন নি। তিনি বিকাশের ক্রমোন্নত ধারা ও কার্যকারণনীতির অনুসরণ কোরে বিচারযুক্ত ও অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলেছেন: "প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিকেরা কার্যকারণ-রূপ সার্বভৌমিক (universal) নিয়ম মেনেছেন। এই নিয়মকে বলা হয় কর্ম বা 'কর্মফল'। কর্মফল বলতে বুঝায়—কার্য থাক্‌লে তার একটি কারণ থাক্‌বে। কর্মের একটি ফল থাকে ও সেই ফল সর্বদা কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী হয়, অর্থাৎ যে ধরণের কর্ম হবে, ফলও ঠিক সেইরকম হবে, কেননা কর্ম ও তার ফল সমপ্রকৃতির হয়। সুতরাং কার্য ও কারণ অথবা কর্ম ও তার ফলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ও ঐক্যসূত্র থাকে। * * ভারতের চিন্তাশীল মনীষীরা এই কার্যকারণনীতির মাধ্যমে শুধু মানুষের কেন—সকল প্রাণীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। লোকান্তর-রহস্যের সমাধানও এই অনিবার্য কার্যকারণ-রূপ নিয়মের সাহায্যে করা হয়।"[৫৪]

স্বামী অভেদানন্দ বলেন, কার্যকারণ-রূপ অপরিহার্য নিয়মকে মানুষ কোনদিনই লঙ্ঘন করতে পারে না। মানুষের প্রত্যেকটি চিন্তা ও চিন্তাপ্রসূত কর্ম কারণের আকারে তার সমান প্রকৃতির ফল সৃষ্টি করে। মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ কোন খামখেয়াল বা স্বেচ্ছাচার-প্রণোদিত স্বাধীন নির্বাচনী নীতির (free choice) ওপর প্রতিষ্ঠিত হোতে পারে না, বরং তা প্রাণীমাত্রের পূর্বপূর্বজীবনের চিন্তা ও ভালমন্দ কর্মের অথবা কর্মমলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্লেটোর মতে, বিদেহী জীবাত্মা তার পছন্দ মতন শরীর ধারণ করে; শরীরধারণ-ব্যাপারে জীবাত্মার স্বাধীন নির্বাচনী নীতি থাকে, তাই ইচ্ছা করলে পশুপক্ষীদের শরীরও সে ধারণ করতে পারে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের মতে, এই নীতি সঙ্গত নয়, কেননা জীবাত্মা ইচ্ছা করলেই পশুপক্ষীদের শরীর

৫১। অভেদানন্দ; 'পুনর্জন্মবাদ' (১৩৫৫), পৃঃ ১১৭
৫২। ডাঃ মায়ার্স: 'হিউম্যান পার্সোনালিটি', ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৩
৫৩। ডাঃ প্রিঙ্গল-প্যাটিসান: "দি আইডিয়া অব ইম্মরট্যালিটি", পৃঃ ১০৮
৫৪। অভেদানন্দ: (ক) 'রিইন্‌কারনেশন্' (৫ম সং), পৃঃ ২৩; (খ) 'পুনর্জন্মবাদ', পৃঃ ১২০

ধারণ করতে পারে না; কার্য-কারণ নিয়মই সেখানে প্রবল, মানুষের পূর্বজীবনে কৃত চিন্তা ও কর্মের ফলই তাকে তদনুযায়ী শরীর ধারণ করতে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ জীবন ও ক্রমবিকাশের পিছনে কার্য-কারণ নিয়মশৃঙ্খলাই সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। প্রাণপঙ্ক যেমন অণুকোষেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ এবং তাদের বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংমিশ্রণ অনুসারে সে জড়শরীর গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা কার্যকারণনীতির অনুযায়ী পার্থিব শরীর সৃষ্টি অথবা ধারণ করে। মাতাপিতা বিদেহী আত্মাকে কোনদিনই সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁরা উপায় ও উপলক্ষ্য মাত্র। শক্তিসংরক্ষণ (conservation of energy)-রূপ নিয়মের বশবর্তী হোয়ে প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মনোশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি বিদেহী আত্মার প্রসুপ্ত অবচেতন মনে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, অনুকূল পরিবেশ পেলে তারা আবার বিকাশ লাভ করে।[৫৫] পুনর্জন্মের অর্থ ঐ সুপ্ত পুঞ্জীকৃত শক্তি বা সংস্কারগুলিকে অভিব্যক্ত করা।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, প্লেটো ও তার অনুবর্তীরা পরলোকগত আত্মার ক্রমোন্নত বিকাশের কথা বিন্দুমাত্র বলেন নি, বরং তিনি আন্তর প্রকৃতি বা সংস্কারের বিকার ও পরিবর্তন স্বীকার করেছেন, যা হিন্দুশাস্ত্রের মতে অসঙ্গত। সংস্কারের একমাত্র রূপান্তর ঘটে দিব্যজ্ঞান লাভের পরে, নচেৎ অবিকৃত সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হোয়েই জীবাত্মারা দেহধারণ করে। জীবাত্মা নিম্নস্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ অতিক্রম কোরে তবে মনুষ্যজন্ম লাভ করে ও সাথে সাথে তার মধ্যে মানবোচিত বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়। পশুত্ব ও দেবত্বের সংমিশ্রণে মানুষের প্রকৃতি গঠিত হোলেও দেবত্বের অভিব্যক্তিই তাতে বেশী থাকে, তাই মানবজন্ম লাভ করার পর জীবাত্মা আর পশুদেহ ধারণ করে না।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে মানবজন্মের পরও পশুদেহ ধারণের উল্লেখ আছে এবং নিম্নশ্রেণীর দেহধারণের জন্যে কারণ হয় জীবাত্মার অসৎ কর্মের ফল। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে: "তৎ যে ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।"[৫৬] "ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি"[৫৭] কথাগুলি থেকে মানবশরীর ধারণ করার পরেও অসৎ কর্ম তথা অন্যায়ের জন্যে জীবাত্মা যে

৫৫। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "By the law of persistence of force and conservation of energy they (powers) remain latent in that centre until environmental condition become favourable for their remanifestation. Rebirth means the manifestation of the latent powers which exist in the germ of life or in the individual soul."
—'রিইন্‌কারনেশন' (৫ম সং), পৃঃ ৯৫

৫৬। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১০।৭

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৬।২।১৬) আছে: "অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্"। কঠোপনিষদে (২।২।৭) আছে: "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ, স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।" শাংখ্যায়ন-আরণ্যক (২।২) ও কৌষিতকীব্রাহ্মণ-উপনিষদে (১।১।৬) আছে: "চন্দ্রমসমেব যৎ প্রেত্যঃ * * স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দুলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা * * প্রত্যাজায়তে।"

৫৭। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১০।৮

নিম্নস্তরের বিকাশসম্পন্ন পশুপক্ষীদের জন্ম গ্রহণ করতে পারে তা প্রমাণ হয়। স্বামী অভেদানন্দ তাই এ'প্রসঙ্গে বলেছেন :

"Although there are passages in the scriptural writings of the Hindus which *apparently* refer to the retrogression of the human soul into animal nature, still such passages do not *necessarily* mean that the souls will be obliged to take animal bodies. They may live like animals even when they have human bodies, as we may find among us many people like cats and dogs and snakes in human form and they are often more vicious than natural cats, dogs and snakes. They are reaping their own Karma and manifesting their animal nature, though physically they look like human beings. This kind of retrogression is possible from one who after reaching the human plane goes backward on account of wicked thoughts and deeds on the animal plane. Such a *temporary* retrogression brings knowledge and helps it in its onward progress toward the manifestation of higher powers on the higher plane of consciousness."৫৮

অর্থাৎ, অসৎ কর্ম করার জন্মে মানবাত্মাও অধোগতি-রূপ পশুশরীর নির্বাচন করতে পারে এই ধরণের কথা উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে থাকলেও তার অর্থ এ' নয় যে, মানুষের আত্মা পশুশরীর-রূপ নিম্নস্তরের আবরণ গ্রহণ করে, পরন্তু মৃত্যুর পর সে মানুষের শরীরই ধারণ করে এবং সেই মানুষে পশুপ্রকৃতির বিকাশ বরং অধিক থাকে। স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, এ'কথা বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্যশরীর ধারণ করলেও জীবাত্মাদের ভিতর পশুপ্রকৃতির প্রাবল্য থাকতে পারে, কেননা মানুষের মধ্যেও কুকুর, বিড়াল, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তুদের প্রকৃতির বিকাশ আমরা দেখতে পাই। নৈতিক প্রকৃতি হীন হওয়ার জন্মে জীবাত্মার অধোগতি সম্ভব, কিন্তু সৎ কর্মের আচরণে সৎ প্রকৃতির বিকাশ হোলে আবার তাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌ও ঠিক এ'কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, কোন মৃত আত্মাই তার সঞ্চিত সংস্কারের প্রেরণা লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই মানুষ যদি জীবনে অসৎ কর্ম করে তবে তার ফলে মৃত্যুর পর যে সে নীচজন্ম গ্রহণ করে তার অর্থ—সে মানুষ হোয়েই জন্মায়, কিন্তু তার প্রকৃতি বা মানবীয় প্রবৃত্তি অত্যন্ত হীনস্তরের হয়। তিনি লিখেছেন,

"No human being can take birth in a body foreign to its evolved characteristics. It is possible for man to degenerate into a savage being but he is still a man. * * While it is theoretically possible that the life-process which has now reached the human level may so operate as to sink into the animal, from which it may again spring forward on a different line of evolution altogether or continue to sink below the animal world, we are not concerned with such speculative possibilities. While we need not dogmatically deny the possibility of reversion to animal births,

৫৮। অভেদানন্দ : 'রিইনকারনেশন,' পৃঃ ৯৮—৯৯

* *. It is possible that rebrith in animal form is a figure of speech for rebirth with animal qualities."[৫৯]

এ' ছাড়া কর্মবাদের ও স্বর্গ-নরকের প্রসঙ্গেও তিনি উল্লেখ করেছেন,

"The juridical theory associated in the popular mind with the doctrine of Karma is responsible for this *mistaken view of rebirth* in the form of animals, as also for the notions of heaven and hell as places of resort where we receive our rewards and punishments. It is not, however, a fair representation of the Hindu view, though much popular support can be produced for it. The theory of samsâra is quite inconsistent with any permanent abodes of bliss or suffering".[৬০]

পাপ ও পুণ্যের প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, এ'কথা সত্যি যে, অসৎ বা হীন কার্য সকল দেশের শাস্ত্রে 'পাপ' বোলে গণ্য। কিন্তু উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই পাপ-পুণ্যের যথার্থ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"What is sin? Sin is nothing but a *mistake* and it proceeds from ignorance. For instance, if I do not know that fire burns, I may put my finger into it and get burned. The result of this mistake is the burning of the finger and this has taught me once for all that fire burns; I shall never again put my finger into fire. So every mistake is a great teacher in the long run."[৬১]

পাপ বলতে বুঝায় ভ্রম বা ভুল, যা অজ্ঞতা তথা অজ্ঞানতা থেকে সৃষ্টি হয়। মানুষেই তো ভুল করে এবং ভুল করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং অজ্ঞতা থাকে বোলেই সে মানুষ, সে দেবতা বা ঈশ্বর নয়। তবে এই ভুল সংশোধন করা যায় বিবেক ও বিচার দিয়ে। ভুলও মানুষের জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন এনে দেয়, ভুলও মানুষকে শিক্ষা দেয় সংশোধন করার জন্যে। তাই পাপ যাকে আমরা বলি তা মানুষকে আবার সাহায্য করে পুণ্যের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "মানুষমাত্রেই জীবনে ভুল করে। প্রত্যেকটি ভুলের দ্বারা যখন আমরা অবাঞ্ছনীয় ফল লাভ করি তখনি জগতের মধ্যে অনুস্যূত সার্বভৌমিক নিয়মশৃঙ্খলার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে ও আমরা সচেতন হই। প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র জীবনেই আমাদের সকল শিক্ষা ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, আর তাই পার্থিব জীবনের চরম-উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে আমাদের বারংবার পৃথিবীতে

৫৯। রাধাকৃষ্ণন্: 'এ্যান্ আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অব লাইফ' (১৯৩৭), পৃঃ ২৯২

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ মিঃ টাইলরের 'প্রিমিটিভ কালচার' (২য় ভাগ, পৃঃ ১৭) থেকে তাঁর মতবাদের সমর্থক হিসাবে যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাতেও দেখা যায়': "The beast is the very incarnation of familiar qualities of man, and such names as lion, bear, * * when we apply them as epithets to man, condense into a word some leading feature of a human life."

৬০। রাধাকৃষ্ণন্: 'এ্যান্ আইডিয়েলিষ্ট ভিউ অব লাইফ', পৃঃ ২৯২—২৯৩

৬১। অভেদানন্দ : 'রিইনকারনেশন', (৫ম সং), পৃঃ ৯৯

জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই পুনঃপুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করি বোলেই আমরা ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করি" । ৬২ অধ্যাপক হাক্সলিও বলেছেন,

"None but hasty thinkers will reject it (Reincarnation) on the inherent absurdity. Like the doctrine of evolution itself that of transmigration has its roots in the world of reality."

মানবাত্মার পশুদেহের নির্বাচন-ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বা উপনিষদের নির্দেশকেই সমর্থন করেছেন, তাই ক্রমবিকাশ ও জন্মান্তরনীতি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে স্বামী অভেদানন্দের মতবৈষম্য ছিল যথেষ্ট। স্বামী অভেদানন্দ শ্রুতিবাক্যকে শিরোধার্য বোলে সর্বদা মেনে নিলেও তার প্রত্যেকটি কথা ও নির্দেশকে গ্রহণ করতে বলতেন বিচারসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বিকাশবাদের নিয়মকানুনকে কোনদিনই উপেক্ষা করেন নি, তিনি ক্রমবিকাশ বলতে আত্মার ক্রমোন্নত অভিব্যক্তিকেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু তার সাথে সাথে উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে বিকাশ সম্ভাবনাকেও তিনি মেনেছেন। ক্রমবিকাশের আলোচনায় তিনি বলেছেন,

"The same is the case with the soul. Projected from Brahman, it passed through all sorts of vegetable and animal forms, and at last it is in man, and man is the nearest approach to Brahman." ৬৩

এই কথাগুলিতে জীবাত্মার ক্রমোচ্চবিকাশকেই স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন। কিন্তু দিব্যানুভূতি বা মুক্তির প্রসঙ্গে ক্রমবিকাশের সম্বন্ধে তিনি আবার উল্লেখ করেছেন,

"If we are developed from animals, the animals also may be degraded men. How do you know it is not so? You have seen that the proof of evolution is simply this: you find a series of bodies, from the lowest to the highest, rising in a gradually ascending scale. But from that how can you insist that it is always from the lower upwards, and never from the higher downwards? The arguement applies both ways, and if anything is true. I *believe* it is that the series *is repeating itself in going up and down.* How can you have evolution without involution? Our struggle for the higher life shows that we have been degraded from a high state." ৬৪

এই কথাগুলিতে উন্নত অবস্থা থেকে জীবাত্মার অধোগতির ধারা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই অধোগতি বা নিম্নস্তরের বিকাশের প্রসঙ্গে জীবাত্মার মনুষ্যজন্ম থেকে পশুজন্মের পরিণতির কথা বোঝাচ্ছে না। ব্রহ্ম এই পরিবর্তনশীল বিশ্ববৈচিত্র্যের কারণ; সমগ্র জীবজগৎ যে ব্রহ্মচৈতন্য থেকে বিকাশলাভ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিকাশ ব্রহ্মের দিব্যপ্রকাশেরই বিচ্যুতি বা বিবর্তন। জীব আপাততঃ ব্রহ্মস্বভাব থেকে বঞ্চিত, তাই মৃত্যুময় জীবভাব তার অধোগতিরই লক্ষণ। কিন্তু পুনরায় সে জ্ঞানের

৬২। অভেদানন্দ : 'পুনর্জন্মবাদ,' পৃ: ১২৭—১২৮

৬৩। বিবেকানন্দ : 'কম্‌প্লিট্‌ ওয়ার্কস, স্বামী বিবেকানন্দ', ২য় ভাগ (৫ম সং), পৃঃ ২৫৮

৬৪। ঐ, পৃঃ ১৭৩-১৭৪

আলোকে নিজের অজ্ঞান-মালিন্য ধুয়ে ফেলে নিজের যথার্থ স্বরূপে ফিরে যায়। জীবের এই যাওয়া ও আসা—উত্থান ও পতনকে লক্ষ্য কোরেই স্বামী বিবেকানন্দ বিকাশ বা অভিব্যক্তির উচ্চ-নীচ স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুনরায় কোন একটি প্রশ্নোত্তরের আলোচনায় মানবাত্মা যে পশুশরীর ধারণ করতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"*Q.* Is retrograde reincarnation from the human stage possible?

"*Ans.* Yes. Reincarnation depends on Karma. If a man accumulates Karma akin to the beastly nature, he will be drawn thereto."[৬৫]

কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ যেমন বলেছেন: "They may live like animals even when they have human bodies",[৬৬] স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিও ঠিক তদনুরূপ: "I have seen men worse than animals."[৬৭] কিন্তু উভয়ের মধ্যে আবার সিদ্ধান্তের পার্থক্য পাইও আমরা যথেষ্ট, কেননা যেখানে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "Therefore, the Reincarnation theory or the theory of Transmigration according to the Hindus, rejects this idea of the going back of human souls to animal forms",[৬৮] স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে স্বীকার করেছেন: "The human soul has sojourned in lower and higher forms, migrating from one to another, according to the Samskaras or impressions".[৬৯]

৬৫। ঐ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ২৪০

৬৬। অভেদানন্দ: 'রিইনকারনেশন,' পৃঃ ১৮

৬৭। বিবেকানন্দ: 'কমপ্লিট্ ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২য় ভাগ (৫ম সং), পৃ০ ২৫৮

৬৮। অভেদানন্দ: 'রিইনকারনেশন', পৃ০ ১৭

৬৯। বিবেকানন্দ: 'কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২য় ভাগ (৫ম সং), পৃ০ ২৫৮

—নবম আলোচনা—

নৈতিকতা ও তার বিকাশ

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, নৈতিকতাই ধর্ম ও অধ্যাত্মজীবনের একমাত্র সহায়; নৈতিক জীবন ছাড়া কোনদিনই মানুষ ধর্ম ও অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।[১] অধ্যাত্ম-ভূমির সারকথা দিব্য-আত্মানুভূতি লাভ করা। কর্মবৈচিত্র্যময় মনুষ্যজীবনে এই অনুভূতি-লাভের প্রথম সোপান নৈতিক গুণরাশির বিকাশ সাধন করা। সচ্চরিত্র, দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী, ভালবাসা, পরোপকারসাধন, সচ্চিন্তা, সত্যভাষণ, উদারতা, আত্মবিকাশ, ভক্তি, নিষ্ঠা, অহিংসা, শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নৈতিকতার উপাদান। নৈতিকগুণের বিকাশে মন স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়, সাধারণ মানুষ হয় অসাধারণ অতিমানুষ, মৃত্যুময় জগতেই প্রতিষ্ঠিত হয় মৃত্যুহীন অমরত্বের সিংহাসন।

"স্বার্থপরতাই সকল-কিছু অকল্যাণ ও অনৈতিকতার কারণ, নিঃস্বার্থপরতা এনে দেয় মুক্তিময়ী অনন্ত অনুভূতি। মালিন্যবিহীন শুদ্ধ আত্মস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞার অপর নাম নিঃস্বার্থপরতা। যে কোন পার্থিব জিনিসের সৃষ্টি হয় পার্থক্য ও ব্যবধানের ভাব থেকে, কেননা পার্থক্য ও ব্যবধানই অজ্ঞান। যা ভগবানের কাছ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে ও মানবতার অভিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে তাই অসুন্দর ও মলিন এবং যা সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের মৈত্রী ও ভালবাসার ভাবকে জাগ্রত করে, তাই ঈশ্বরীয় ও দিব্য। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে 'তোমার করা অনুচিত' 'তোমার করণীয়' এই কথাদুটীর উল্লেখ দেখি, এদের অর্থ 'স্বার্থপর হয়ো না, নিঃস্বার্থপর হও'। সুতরাং নিঃস্বার্থপরতা বা অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের উপলব্ধির নাম যথার্থ নৈতিকতা'।[২]

নৈতিকতার বিকাশ ও সাধন সকল দেশেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। ঋগ্বেদে 'ঋত' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ঋত' বললতে বোঝায় সত্য, তার বিপরীত অসত্য বা অনৃত। ঋত মঙ্গল বা কল্যাণবাচী শব্দ। ঋতকে লাভ করার জন্যে পূর্বে ব্রত বা সুসঙ্গত আচরণ ও অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল।[৩] এই ঋতের উদ্দেশ্যে লোকে ব্রত পালন করত। পরে সেই ব্রত-অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞাদি কর্মের আকারে রূপান্তরিত হয়। তখন ঋত-রূপ কল্যাণকার্যের উদ্দেশ্য স্বর্গলোক-প্রাপ্তিতে পর্যবসিত হয়। স্বয়ং বরুণদেব ছিলেন ঋতের উপাসক, তাই বরুণকে বলা হোত ধৃতব্রত।[৪]

১। অভেদানন্দ : "'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', (১৯৪৭), পৃঃ৫২

২। "Selfishness is the cause of all evil and immorality; * *. Therefore, unselfishness or the recognition of oneness in the true basis of morality."—'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃ: ৭৬

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন : "That which is selfish is immoral and that which is unselfish is moral."—'কম্‌প্লিট্ ওয়ার্কস' (১৯৩১), ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৮

৩। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ : 'ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (১৯৪০), ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৯—১১০

৪। ঐ, পৃঃ ১১০

ব্রাহ্মণ-সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়, দিব্যজীবন পালন করতে গেলে প্রত্যেকের সত্যকথন, সাধু ও চতুরাশ্রমবিহিত কর্ম, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও করুণা, প্রেম ও ভালবাসা, অচৌর্য, অপরিগ্রহ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। অধ্যাপক এ. বি. কিথ বলেছেন, সত্যিকার ভাবে দেখা যায়, ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে নৈতিকতাকে ঠিক ঠিকভাবে মর্যাদা দেওয়া হোত না।[৫] কিন্তু বেদে সত্য ও অনৃত, ভাল ও মন্দ এই ধারণা-দুটির আমরা পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণোত্তর ও বিশেষ কোরে পৌরাণিক যুগে নৈতিক আচরণকে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে এবং এর উদাহরণ রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে নৈতিক গুণগুলিকে ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যার অপরিহার্য উপায় বোলে স্বীকার করা হয়েছে। বেদান্তের তো কথাই নাই; বেদান্তের ধর্মে নৈতিকতাকে পরমশ্রেয়স্কর মুক্তির দ্বার-রূপে গণ্য করা হয়।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'এথিক্স অব বেদান্ত' আলোচনায়[৬] বলেছেন, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, কন্‌ফিউসিয়াস, লোৎসে প্রভৃতি মহামানবদের শিক্ষার সাথে বেদান্ত-নির্দিষ্ট নীতিবিজ্ঞানের কোন বৈষম্য নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যদর্শীরা নৈতিক নিয়মগুলিকে বোঝ্‌বার এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করার চেষ্টা কোরে আসছেন। শুধু তাই নয়, যুক্তি-বিচার দিয়ে সেই নিয়মগুলির উপর তাঁরা আলোকপাতও করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, ভাল ও মন্দের ধারণা ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকে আছে। হিন্দুরা এ'দুটির ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে বলেছেন, কার্যকারণ-নিয়মশৃঙ্খল বা কর্ম এবং তার ফলই ভাল ও মন্দ ধারণা-দুটির স্রষ্টা। ভারতের মনীষীরা কর্মবাদ স্বীকার কোরে ভাল ও মন্দ পরিণতি-দুটির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যানই দিয়েছেন। কিন্তু খৃষ্টানধর্মসেবীরা দু'হাজার বছর ধরে চেষ্টা কোরেও এ'সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেন নি, আর তাই তাঁরা 'স্বর্গস্থ পিতা' বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে কর্মফলের নিয়ন্তারূপে মেনে নিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের সিদ্ধান্ত হিন্দুধর্মের মতন। বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানেন নি, কিন্তু কর্মানুযায়ী ফলের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, আর সেজন্যে তিনি নৈতিকতাকে উচ্চাসনও দান করেছেন।

বেদান্তের মতে, ধর্মের ভিত্তি নৈতিক গুণ ও তার আচরণ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এগুলি নৈতিক গুণের অন্যতম। ঘৃণার দ্বারা কোনদিন ঘৃণাকে জয় করা যায় না, একান্ত ভালবাসার জয়যাত্রাই সেখানে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ঘৃণা-রূপ অশুভকে জয় করতে গেলে ভালবাসা, সচ্চিন্তা ও সৎকর্মের প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় নৈতিক নিয়মের দ্বারা। নৈতিক নিয়মের প্রোজ্জ্বল প্রেরণা মানুষকে করে দেবতা, পার্থিব জীবনকে করে অপার্থিব।

পৃথিবীর মানুষই জীবনে ভুল করে, আর ভুল করে বোলেই সে মানুষ,

৫। অধ্যাপক কিথ: 'দি রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড ফিলজফি অব দি বেদ এ্যাণ্ড উপনিষদস্' (১৯২৫), ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৬৮

৬। অভেদানন্দ: (ক) 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন' (১৯৪৭), পৃঃ ৫০-৬০; (খ) 'ফিলজফি অব গুড এ্যাণ্ড ইভিল্'।

সৃষ্টিকর্তা ভগবান নয়। অজ্ঞান-রূপ সংকীর্ণতাকে মেনে নিয়ে মানুষ নিজেকে নিকৃষ্ট ও দুর্বল ভাবে। নিজেকে এই নিকৃষ্ট ভাবাই আসলে মিথ্যাজ্ঞান, আর মিথ্যাজ্ঞানের জন্যেই মানুষ ভুল করে। ভুল করা মানুষের স্বাভাবিক হোলেও ভুলই পরিশেষে তাকে শিক্ষা দেয়, দোষ-ত্রুটিই জ্বালে তার জীবনের অন্ধকারে সংশোধনের ছলে জ্ঞানের শুভ্র আলোকবর্তিকা।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সংস্কৃত ভাষায় আমরা দয়া, ধর্ম, ও দান এই তিনটি শব্দ পাই।[৭] এগুলি নৈতিক গুণের অন্তর্গত। (ক) ধর্মকে প্রথম গুণ বোলে গণ্য করা হয়। ধর্ম থেকে আমরা শিখি যে, আত্ম-অহঙ্কার বিসর্জন দেওয়া উচিত, কাম ও কামনাকে দমন কোরে সকল স্বার্থকে অতিক্রম করা দরকার। (খ) দান বলতে বুঝি—সত্যিকারের দরিদ্র ও প্রার্থীকে সকল রকমভাবে সাহায্য করা। (গ) দয়ার অর্থ, সকল প্রাণীকে নিঃস্বার্থ-ভাবে ভালবাসা। সকলকে অস্বীকার ও অনাদর কোরে নিজেকে মাত্র ভাববাসার নাম স্বার্থপরতা। এই আত্মকেন্দ্রী ভালবাসা সংকীর্ণ, সুতরাং এটি বন্ধন ও অন্ধকারের নামান্তর। বিশ্বপ্রেমই একমাত্র স্বার্থের অন্ধকারকে বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল করতে পারে। শুধুই মানুষকে নয়, বিশ্বের সকল প্রাণীকে আপনার চেয়ে আপনার বোলে চিন্তা এনে দেয় বিশ্বপ্রেমের প্রেরণা। প্রেম ও মৈত্রী সৃষ্টি করে আত্মপ্রসারণা, যার আশীর্বাদে মানুষ ফিরে পায় তার দিব্যচেতনা ও জ্ঞানের অনির্বাণ জ্যোতি।

বৃথা বাক্যব্যয় প্রতিরোধ করার চেষ্টাও নৈতিক কার্যের পর্যায়ভুক্ত। জিহ্বা সংযত করার অর্থ—অনর্থক কথার ওজুহাতে প্রাণশক্তির অপব্যয় না করা। চিন্তায় ও কথায় তাই সংযত হওয়া দরকার। অচৌর্য, অপরিগ্রহ, ও সত্যকথন-রূপ নৈতিক গুণগুলি আত্মবিশ্বাসের দ্বার উন্মুক্ত করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে করে আশাদীপ্ত, সতেজ ও বলীয়ান। সূর্য যেমন দোষী ও নির্দোষী উভয় রকম লোকের ওপরই নির্বিচারে কিরণ বর্ষণ করে, প্রত্যেক মানুষেরও তেমনি উচিত জাতি, বর্ণ ও ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রাণীকে ভালবাসা ও তাদের উপকারসাধন করা, তাহোলেই নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

'ট্রু বেসিস্ অব মোরালিটি'-র আলোচনায়[৮] স্বামী অভেদানন্দ গ্রীক, জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি দার্শনিকদের নৈতিক মতবাদ নিয়ে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেকে শাস্ত্র বা ঈশ্বরের বাণীর দোহাই না দিয়ে নৈতিক নিয়ম তথা নৈতিকতাকে নিছক বিজ্ঞান ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চান। বিজ্ঞান মানুষকে তার জ্ঞানের বিশালত্ব ও নিজের দিব্যমহিমাকে উপলব্ধি করার জন্তে সাহায্য করেছে। বর্তমান বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজকে কতটুকু শিক্ষা দান করেছে সে-সম্বন্ধে বল্তে গিয়ে রাশিয়ান দার্শনিক প্রিন্স ক্রোপোট্‌কিন্ বলেছেন: "বর্তমান বিজ্ঞানের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। একটি মানুষকে দিয়েছে মূল্যবান নিরহংকারমূলক বিনয়ের শিক্ষা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত অসহায় একথাই মানুষ শিখেছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে, যাতে তার সীমাবদ্ধ অহঙ্কারের গণ্ডী গেছে

৭। "Those three words in Sanskrit were *dharma*, *dâna* and *dayâ*. These three words begin with the letter 'D' ".—'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন্', পৃঃ ৫৫,

৮। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড্ অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ৬১—৬৭

জেনেছে, বুঝেছে বিরাট বিশ্বেরই একটি কেন্দ্রবিশেষ সে—স্রষ্টা ভগবানের একান্ত আকর্ষণের বস্তু। বিজ্ঞানই মানুষকে শিখিয়েছে যে, ঈশ্বরকে ছেড়ে দিলে স্বতন্ত্র সত্তা তার অতি তুচ্ছ, 'তুমি' অর্থাৎ ভগবান ছাড়া ক্ষুদ্র 'আমি'-র অস্তিত্ব অর্থহীন একেবারে। আবার অপরদিকে আত্ম-চৈতন্যের উদ্বোধন কোরে বিজ্ঞানই মানুষকে শিখিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে যাতে ক্রমোন্নতির পথে সে হোতে পারে অনন্তশক্তিশালী।[৯]

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে শুধুই নীতিবিজ্ঞান কেন, সকল বিষয়কে বিচার ও বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখা কর্তব্য। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, যে সমস্ত লোক অন্ততঃ যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনকে দেখতে চান, পাশ্চাত্য দেশে তাঁদের দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী বলা হয়। এই দার্শনিকদের ভিতর প্রাচীনতমেরা হলেন খৃষ্টপূর্বকালের গ্রীসের দার্শনিকেরা। তাঁদের পূর্বে জৈববিজ্ঞান ও বিকাশবাদী ডারুইনের নাম করা যেতে পারে। ডারুইনের মতে, সমাজচেতনা থেকে নৈতিকতার সৃষ্টি এবং এই মতবাদকে তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন। সমাজচেতনাকে ডারুইন ভাগ করেছেন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত হিসাবে, তবে তিনি বলেছেন যে, ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টিগত চেতনাই বেশী বলবান, আর সেজন্যে পার্থিব সুখ এবং কল্যাণও মানুষের সামনে আসে দু'রকমভাবে।

স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, সক্রেটিশই (খৃষ্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) নৈতিক সদ্‌গুণ ও তার আচরণের বিচারকে সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ; তাঁর সময় থেকেই দর্শনের ভিত্তি-রূপে পরিগণিত হয়েছিল নীতিবিজ্ঞান (এথিকস্)। সক্রেটিশের মতে, ন্যায়নিষ্ঠা প্রত্যেক নৈতিক কর্মের পথপ্রদর্শক, তাই সদ্‌গুণকে জ্ঞান হিসাবে গণ্য করা উচিত। সৎ বা নৈতিক কর্ম আমরা তাকেই বলি, যা উদ্দেশ্য, উপায় বা নির্দিষ্ট কোন সীমাবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানগত-প্রত্যক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। ভাল ও মন্দ নির্ধারিত হয় মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টির অস্তিত্ব ও অভাব থেকে। ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তের বশবর্তী হোয়ে মানুষ সংসারে অন্যায়ভাবে কাজ করে। মোটকথা সক্রেটিশ বলেছেন, নৈতিক সদ্‌গুণ দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া কোন আদেশ নয়, পরন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তা মন ও বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানবিশেষ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে বোঝা যায়—সত্যিকারের মঙ্গল কি, লোকের বা সমাজের কোন অনিষ্ট না কোরে মৈত্রীভাবে তার কোন মঙ্গলসাধন করা যায় কিনা।[১০]

৯। "Modern science has thus achieved a double aim. On the one side it has given man a very valuable lesson of modesty. It has taught him to consider himself as but an infinitesimally small particle of the universe. It has taught him that without the whole the 'ego' is nothing; that our 'I' cannot even come to a self-definition without the 'thou.' But at the same time science has taught man how powerful mankind is in its progressive march, if it skilfully utilizes the unlimited energies of nature."—প্রিন্স ক্রোপোট্‌কিন্ : 'এথিক্স, অরিজিন এণ্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট' (১৯২৪), পৃ : ৪

১০। "Virtue, he taught, is not a revelation from the gods, but a rational innate knowledge of what is truly good, * * and not himself alone."—প্রিন্স ক্রোপোট্‌কিন : 'এথিকিস, অরিজিন, এ্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট' (১৯২৪), পৃঃ ৯০

দার্শনিক প্লেটো (খৃষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮) তাঁর আচার্য সক্রেটিসের চিন্তাধারাকে আরো বৈচিত্র্যময় করেছিলেন। ন্যায়পরতা বলতে প্লেটো রাষ্ট্রকে বা সমষ্টি নৈতিকজীবনকে বুঝেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, একমাত্র সমাজ-নীতিবিজ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে দমন করতে পারে। আসলে সমাজ-প্রতিষ্ঠানই নিম্নস্তরের প্রকৃতিকে সংযত কোরে নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; সুতরাং সদ্‌গুণ প্রথমে রাষ্ট্রের মধ্যে ও পরে ব্যক্তিগত জীবনে পরিস্ফুট হয়।[১১]

প্লেটো নৈতিকতার পিছনে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানবাদমূলক ধারণাকে (idealistic conception) স্থান দিয়েছিলেন। প্লেটোর মতে, কল্যাণ ও ন্যায়নিষ্ঠা (good and justice) বিশ্বপ্রকৃতির উপাদান ও অন্তরের জিনিস। পার্থিব জীবন অকল্যাণ, অসুন্দর ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহোলেও তাদের অধিষ্ঠানরূপে কল্যাণের দিব্যদীপশিখা সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত রাখে। এই আলোকই মানুষকে জীবনের পথে চিরদিন পরিচালিত করে। তাই তিনি নৈতিকতার অধিষ্ঠানকে অনুসন্ধান করেছিলেন পার্থিব সীমানার বাইরে বিরাট বিশ্বমনের (Ideas) মধ্যে। বিশ্বমনই তাঁর মতে, সমগ্র জগতের ধারয়িতা ও নিয়ন্তা। নৈতিকতার বিকাশ হয় যথার্থসুখ ও আনন্দের ভিতর দিয়ে। এই সুখ ও আনন্দ আবার প্রকাশ পায় স্থান, কাল ও পাত্র-হিসাবে বিচিত্র রূপে। কিন্তু বিকাশ বিচিত্র হোলেও অখণ্ডতা এদের সত্যিকারের রূপ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দই নৈতিকতার অধিষ্ঠান। সকল প্রাণী জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই অফুরন্ত বিরাট আনন্দকে লাভ করার জন্যে লালায়িত এবং ঐকান্তিকতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হোয়ে অবশেষে সেই আনন্দ-অমৃত লাভ কোরে তারা কৃতকতার্থ হয়।

এরিষ্টোটেল (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪—৩২২) শুধু সক্রেটিশের নয়, প্লেটোর মতবাদকেও মেনে নিতে পারেন নি, যদিও নৈতিক গুণগুলিকে মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ বোলে স্বীকার করেছেন। মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণকে তিনি সম্পূর্ণ বুদ্ধিপ্রসূত (purely intellectual) বোলে গ্রহণ করেন নি, বরং বলেছেন—জড়প্রকৃতির ফলরূপে তা গণ্য। তাছাড়া সক্রেটিশ যেখানে নৈতিক ও প্রাকৃতিক গুণদুটিকে পরস্পরবিরোধী এবং নৈতিক আচরণকে যুক্তি-বিচারের পরিণতি বলেছেন, এরিষ্টোটেল সেখানে নৈতিককে প্রাকৃতিক (natural) বোলে স্বীকার করেছেন। সক্রেটিশ বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই বুদ্ধিজীবি, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সে সর্বদাই কাজ করে, সুতরাং নৈতিকতাকে তার আন্তর গুণ হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু এরিষ্টোটেলের মতে, মানুষমাত্রেই রাজনৈতিক জীব, যেহেতু রাষ্ট্র ও রাজনীতি সে ভালবাসে, তাই নৈতিক সংস্কৃতি ও আচরণ এই দুটি বিকাশ তার সমাজ-জীবনেই গড়ে ওঠে।

১১। "But by justice he (Plato) meant the State—the moral life in its complete totality. Plato believed that social ethics can alone govern the sensuous principle, which is so mighty in man. Social institutions, according to his conception, can suppress the 'lower' nature and make man moral."—অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন,' (১৯৪৭); পৃঃ ৭২

সত্যিকারের মনুষ্যজীবন একমাত্র সমাজের মধ্যেই সম্ভব, সুতরাং রাষ্ট্র শুধু ব্যক্তিবিশেষের কেন, সমষ্টিজীবনের চেয়েও বড়।[১২] এছাড়া এরিষ্টোটেল বলেছেন, মানুষ প্রতিদিনই জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয়ে সুখ-শান্তি অন্বেষণ করে। মানুষের সামাজিক জীবনে নৈতিকতার দুটি বিকাশ আমাদের চোখে পড়ে: একটি মিত্রতা (friendship), অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা এবং অপরটি ন্যায়নীতি (justice)। এই মিত্রতা ও ন্যায়নীতিকে তিনি কিন্তু সমান অধিকার (equal rights) দিতে রাজী ছিলেন না।

প্লেটো ও এরিষ্টোটলের পর খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নৈতিকতার জগতে দুটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল: একটি ষ্টোয়িক্ ও অপরটি এপিকিউরিয়ান্স্। ষ্টোয়িক্রা জড়দেহাত্মবাদী। তাঁদের মতবাদ ছিল: প্রকৃতির সাথে পা ফেলে চলা উচিত। স্বাভাবিক সাদাসিদে ভাবে জীবনযাপন করা ভাল, কলানৈপুণ্যের বশীভূত হওয়া ভাল নয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে কোন নৈতিক মূল্য নাই; সুখ আকস্মিকভাবে (accidently) মানুষের কাছে আসে। কাজের ভিতর থেকে যে-কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই আমরা পাই না কেন, সে সব কোনদিন নৈতিক হোতে না। তবে ষ্টোয়িক্রা একথাও বলেন যে, পরিপূর্ণ নৈতিক আচরণ তখনি মানুষের জীবনে সম্ভব হয় যখন কল্যাণের (good) চরমজ্ঞান অর্জন ও সেই কল্যাণকে সে অনুভব করার পক্ষে পূর্ণক্ষমতা লাভ করে।

ষ্টোয়িক্দের মতন সোফিষ্টরা বা জ্ঞানবাদীরা এবং বিশেষ কোরে আণবিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ডেমোক্রিটাস (খৃষ্টপূর্ব ৪৭০—৩৮০) ও সাইরেনেস্থিকেরা নৈতিকতাকে মানুষের সুখ, শান্তি ও আনন্দলাভের উপায় বোলে গণ্য করেছেন। এপিকিউরিয়ান্সরা (খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) নৈতিক প্রকৃতিকে বল্তে গেলে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা বলতেন, মানুষ যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ততদিন সে দুঃখকে ত্যাগ কোরে সুখেরই অন্বেষণ করবে এবং এই নীতি তাঁদের পক্ষে নৈতিকতার চরম-আদর্শ। এপিকিউরিয়ান্সদের সাথে সাথে খৃষ্টপূর্ব কালের গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার অবসান ঘটে ও ইউরোপে খৃষ্টীয় নৈতিক মতবাদের অভ্যুদয় হয়। যীশুখৃষ্টের বাণী ও খৃষ্টধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন কোরে নীতিবিজ্ঞানের অভিযান সুরু হয় মধ্যযুগ পর্যন্ত। ঘাতপ্রতিঘাত ও বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হোলেও চার্চের শাসনতন্ত্র নৈতিকতাকে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত রেখেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে এলো দর্শনজগতে সংস্কারের (Reformation) অভিযান। ইউরোপের নানান দিকে দার্শনিকেরা জন্মগ্রহণ কোরে আত্মা, ঈশ্বর ও নৈতিকনিয়ম প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। ডেকার্ট, মেল্‌ব্রোচ্, স্পিনোজা, লাইবনিজ্, লক্, বার্কলে, হিউম্, কাণ্ট্, ফিক্টে, শেলিঙ্, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের অবদানে মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য দর্শনজগৎ বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ হোয়ে উঠ্ল। কিন্তু ডেভিড হিউমের সময় থেকেই নীতিবিজ্ঞানের জগতে দেখা দিল পরিবর্তন। নৈতিক বিজ্ঞান ক্রমশ আত্মগোপন করলো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের ভিতর। জার্মাণ দার্শনিক কাণ্টের অভ্যুদয়ে নবযুগের সূচনা হয়েছিল।

নৈতিকতার আলোচনায় জার্মাণ দার্শনিকদের মুকুটমণি কাণ্ট বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের

১২। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন' (১৯৪৭), পৃঃ ৩২

মধ্যে নীতিজ্ঞানের চেতনা থাকে সুপ্ত, সেই চেতনাই অভিব্যক্ত হোয়ে তার দৈনন্দিন জীবনে দেখা দেয় সুখ ও দুঃখরূপে। প্রয়োজনীয়তার তাগিদে মানুষ নৈতিক নিয়মকে চিরদিন অনুসরণ করে বটে, কিন্তু সেই নিয়মের মধ্যে কোন পার্থিব উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না।[১৩]

কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম আনুমানিক অনুজ্ঞা (*hypothetical imperative*), কেননা এটাই স্বাভাবিক নিয়ম যে, উপায় বা উদ্দেশ্য থেকে ফলের উৎপত্তি হয়। একে 'ক্যাটিগোরিক্যাল ইমপারেটিভ' (অপরিহার্য অনুজ্ঞা) অথবা পরমনির্দেশও (absolute command) বলে। এই অপরিহার্য গুণ বা নীতি কোন বিচার, উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তি বা বাসনা থেকে সৃষ্টি হয় না, বরং একে নিছক বিচারই (*Pure reason*) বলা চলে। যুক্তি বা বিচার স্বাধীন, অদ্বিতীয় ও সার্বভৌমিক।[১৪] বিচারের নজিরে স্বাধীনতা তথা মুক্তির (Freedom) ধারণা সৃষ্টি হয়। নৈতিক নিয়মের ধারণা হোল: 'তোমার এটি করণীয়, সুতরাং তোমার পক্ষে এটি করা সম্ভব', এ' থেকেই স্বাধীনতা তথা মুক্তিলাভ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা এনে দেয়। এই নীতি কোন বাসনার বিষয় দ্বারা আবদ্ধ নয়, বরং নির্বিষয়।

ধর্মশাস্ত্রসম্মত নৈতিকতাও (Theological morality) তদনুরূপ, কেননা এই নীতির মতে, সগুণ ঈশ্বর মানুষকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করেন, কাজেই এই নীতিজ্ঞানের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভ নয়, পরন্তু পুরস্কারপ্রাপ্তির ও শাস্তিপরিহারে বাসনা। মোটকথা বাসনা থেকেই এই নীতিজ্ঞানের সৃষ্টি। কান্টের অভিমতও তাই। তিনি বলেছেন, ইন্দ্রিয়সুখভোগের ইচ্ছা থেকে যে কর্মের উৎপত্তি হয় তাকে ঠিক ঠিক নৈতিক কর্ম বলা যায় না। একমাত্র নৈতিক নিয়মের বশবর্তী হোয়ে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাকেই নীতিবিজ্ঞানসম্মত কাজ বলা সঙ্গত। কান্টের মতে, ধর্ম নৈতিক গুণের ভিত্তি হোতে পারে না, উপরোক্ত নৈতিকতাই ধর্মের ভিত্তি, কারণ নৈতিকতা যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহোলে সমস্ত নৈতিক কর্মের প্রধান লক্ষ্যই হবে ভয় ও পার্থিব আশা।[১৫]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, আস্তিক্য বুদ্ধি থাকলেই যে মানুষ নৈতিক হবে এমন কোন নিয়ম নেই, তবে এই বুদ্ধি থেকে যে 'আমার বিশ্বাস করা উচিত' এ-ধারণার সৃষ্টি হয় একথা সত্যি। নৈতিকতাকে বাদ দিলে ধর্মের কোন অর্থই থাকে না। ঈশ্বর ত্রিমূর্তি কি দশমূর্তিবিশিষ্ট এই বিশ্বাস দুটির মধ্যে কোন নৈতিক পার্থক্যের স্থান নেই।[১৬]

কান্টের মতে, যুক্তি-বিচারই বাইবেলের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। ঈশ্বরের আদেশ যদি যুক্তির নজিরে না টিকে তবে তাকে ত্যাগ করা উচিত। অখণ্ড নৈতিকতার উৎস মানুষের অন্তরতম প্রদেশে প্রবাহিত, তাই নীতিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম নিরর্থক। নীতিজ্ঞান ভিন্ন ধর্ম কেবল শাস্ত্র-পাঠমাত্রেই দাঁড়ায় এবং ঈশ্বর ও অমরত্বের ধারণাও হয় সংকীর্ণ।[১৭]

কান্টের পর ফিক্টে, শেলিঙ্ ও হেগেল নৈতিক চিন্তার জগতে নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন, কিন্তু তাহোলেও তাঁরা কান্টের ভাবধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা

১৩। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন", (১৯৪৭), পৃঃ ৬৩
১৪। ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৪
১৫। ঐ, পৃঃ ৬৪
১৬। ঐ, পৃঃ ৬৪
১৭। ঐ, পৃঃ ৬৪-৬৫

প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তার অবদান বিশ্ববাসীর সামনে দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু কাণ্টের কাছে তাঁরা সকলেই ঋণী ছিলেন। ফলে সমগ্র জার্মানীতে প্রবল সমালোচনার স্রোত প্রবাহিত হয় এবং তা সংহত হয়েছিল সোপেনহাওয়ারের অভ্যুদয়ে। সোপানহাওয়ারের মতে, সকল কর্মের সৃষ্টি হয় কোন-না-কোন উদ্দেশ্য থেকে। সে-উদ্দেশ্যকে দু'রকম শ্রেণীকে ভাগ করা যায়: (১) 'আরো ভাল হবার ইচ্ছা' (*desire to further well-being*); (২) 'মন্দ-কিছু করার ইচ্ছা' (*desire to cause ill*)। সমস্ত কর্মের ভিতরে এ'দুটী ইচ্ছা খেলা করে, সুতরাং মানুষ যে-কোন কাজই করুক না কেন, তাদের পিছনে লুকানো থাকে ভাল বা মন্দের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দ্যেশ্যকে আমরা আবার চার রকমভাবে দেখতে পাই, সুতরাং ঐ চার রকমের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের কাজকেও চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, (১) কারো অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে কাজ হয় তার নাম 'হিংসা' (malice); (২) নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে কাজের নাম 'অহংকার'; (৩) অপরের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজের নাম 'দয়া' বা 'করুণা', এবং (৪) নিজের অকল্যাণ কোরেও পরহিতার্থে কাজ করার নাম 'সাধুতা' (asceticism)।এই চার রকমের উদ্দেশ্য মানুষের কাজের নৈতিক শুভ বা অশুভ চিহ্নকে প্রকাশ করে। দার্শনিক সোপেনহাওয়ার প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের নাম দিয়েছেন 'বাঁচার ইচ্ছা' (will-to-live) বা 'ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা' (affirmation of will) ও শেষের দুটিকে বলেছেন 'ইচ্ছার প্রতিবেধ' (denial of will)। ইচ্ছার প্রতিবেধকে সোপেনহাওয়ার নৈতিকতার সত্যিকারের উৎস বলেছেন, অর্থাৎ যে সকল কাজ বাঁচবার ইচ্ছাকে সমর্থন করে না, বরং তার বিপরীত হয় তাদের তিনি বলেছেন—নৈতিক ও পবিত্র, কেননা ইচ্ছা বা বাসনা প্রতিনিবৃত্ত হোলে আসে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতা। কাণ্টের দর্শনচিন্তায় এইটুকুরই মাত্র ছিল অভাব, কিন্তু মনীষী সোপেনহাওয়ার তার পরিপূরণ করেছিলেন।[১৮]

নৈতিকতার জগতে উপনিষদের দান অতুলনীয়। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, উপনিষদের মতে নৈতিকতার ভিত্তি অনুভূতিমূলক অদ্বৈতজ্ঞানের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। নিঃস্বার্থপ্রেম ও ভালবাসা অদ্বৈতজ্ঞানের বাহ্য অভিব্যক্তি। বিশ্বচরাচরকে যখন আমরা আপনার হোতে আপনার বোলে জ্ঞান করতে শিখব, তখনি প্রেম ও ভালবাসার যথার্থ রূপ হবে পরিস্ফুট। অভিন্নহৃদয়ে বিশ্বের সকল প্রাণীকে ভালবাসাই নৈতিকতার সত্যিকারের রূপ। সেই দিব্যরূপের উপাসনার মাধ্যমে আসে অপার্থিব শাশ্বত আনন্দের অনুভূতি ও সংসার-শৃঙ্খল থেকে চিরমুক্তি, আর এটিই পার্থিব জগতে নৈতিকতার যথার্থ বিকাশ ও চরম-আদর্শ।

১৮। ঐ, পৃঃ ৬৬

—দশম আলোচনা—

ধর্মের রূপ ও আদর্শ

যা আমাদের ধারণ করে তাই বা তার পরিপালন ও আচরণকে ধর্ম বলে। ইংরেজীতে ধর্মের নাম 'রিলিজিয়ন' (Religion); লাটিন 'রিলিজিও' শব্দের অর্থ 'আবদ্ধ বা বন্ধন করা' (*religio* —'to bind'), অর্থাৎ জীবজগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন কোরে যা পরস্পরের অভিন্নতা সম্পাদন করে তারই নাম 'রিলিজিয়ন' বা ধর্ম।[১] ধর্মের প্রকৃত রূপ অনুভূতি, অর্থাৎ মানুষের আপন স্বরূপের দিব্যানুভূতির নাম ধর্ম। কিন্তু সাধারণভাবে ধর্ম বলতে বুঝি পবিত্র 'আচরণ', যে আচরণ বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা অভিষ্ট কোন দেবতার বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের, স্বর্গের অনাবিল আনন্দ, পবিত্রতা ও আত্মস্বরূপের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করি। সুতরাং ধর্ম শব্দটিতে প্রকাশ পায় উপায় ও উপেয়, পথ ও লক্ষ্য, সাধন ও অনুভূতি দুইই।

ধর্মের ব্যাখ্যান বিভিন্ন মনীষী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্রভাবে দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, সমাজের প্রয়োজনে ধর্ম, কারো মতে ধর্ম রাষ্ট্রের অঙ্গ, কেউ বলেছেন, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের জিনিস, কারো মতে বা ধর্ম মানব-হৃদয়ের পবিত্র অভিব্যক্তি। স্বামী অভেদানন্দের মতে, ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মপ্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দিব্যভাব।[২] আবার কোন স্থানে বা তিনি বলেছেন, ধর্মের অর্থ অনুভূতি, আত্মোপলব্ধি।[৩] অধ্যাপক প্র্যাট্ (Dr. J. B. Pratt) বলেছেন, অধ্যাপক লিউবা ধর্মের পঞ্চাশটি সংজ্ঞা (definition) বা ব্যাখ্যান দিয়েছেন; তাদের মধ্যে আটচল্লিশটি সংগ্রহ আটচল্লিশ জন মনীষীদের কাছ থেকে ও দুটি তাঁর নিজের।[৪] অধ্যাপক প্র্যাট্ ধর্মের ব্যাখান দিতে গিয়ে বলেছেন, ধর্ম বলতে আমরা বুঝি— কোন শক্তির বা শক্তিপুঞ্জের প্রতি ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানবের সুদৃঢ় ও সামাজিক মনোবৃত্তি, যে শক্তি

১। "If you examine the definition of the word religion, you will find that it is derived from the Latin word meaning 'to bind.' To bind with what? Obviously to bind with God. Obviously that which binds man with God is religion." —পল্ বার্টন: 'দি ইনার রিয়ালিটি,' পৃঃ ৩২

২। "Religion is a spontaneous outgrowth of the spiritual nature of a human being."—'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস রিলিজিয়ন,' পৃ০ ৮৩

৩। "And it is the light of religion that opens our sight and enables us to see things *as they are in reality* * * It is the *feeling*, It is the Realixation, the Divine realization."—'আত্মার রিলেশন টু দি এ্যাবসোলিউট্', পৃঃ ১৮৪-১৮৫

৪। অধ্যাপক প্র্যাট: 'দি রিলিজিয়াস্ কন্শাসনেস্' (১৯৩৫), পৃঃ ১, এবং অধ্যাপক লিউবা: 'এ সাইকোলজিক্যাল্ ষ্টাডি অব রিলিজিয়ন,' (১৯১২): এ্যাপেনডিক্স'।

বা শক্তিসমষ্টির সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের স্বার্থ ও অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে।[৫] 'সামাজিক মনোবৃত্তি' বল্‌তে তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত হোতে দিতে নারাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্দিরে, গির্জায় বা উপাসনাগৃহে ভক্তগণ সমবেত হোয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে অন্তরের নিবেদন ভগবানকে জানালেও ধর্মের আন্তর রূপ ব্যষ্টি মানবের হৃদয়কন্দরেই লুকানো থাকে, আর সেজন্যে ধর্ম অন্তত প্রথমে ব্যক্তিগত হয়। পল্ বার্টনের অভিমতও তাই যে—"* * religion must be a personal thing—a relationship between yourself as an individual, and God, the Infinite Spirit—not between you and any organized institution."।[৬] ধর্ম-রূপ পবিত্র ভগবদ্‌প্রেরণা অঙ্কুরিত হয় প্রথমে জিজ্ঞাসু ব্যষ্টিমনের অন্তরে, পরে অনুরাগ ও সাধনার সলিলসিঞ্চনে হয় তা বৃক্ষে পরিণত ও ফল-ফুলে সুশোভিত, কুসুমের সৌরভ তখন হয় দিগদিগন্তে প্রসারিত, সমষ্টিমনে তোলে ভাবের ব্যঞ্জনা, ব্যষ্টির অনুভূতি জ্বালে প্রদীপ সমষ্টির সাধন-মন্দিরে। অনুভূতির প্রকৃতিই হোল যে, তা জাগে প্রথমে ব্যক্তিমনের অন্তরে, আর সমষ্টি থাকে চিরদিনই অবিশ্রান্ত চলার পথে অতৃপ্ত ও পিপাসু হোয়ে।

ধর্ম একটি ভাববস্তু, তা সে মানসিক প্রণালী বা বৃত্তিই হোক, আচার-বিচার বা অনুষ্ঠানই হোক অথবা ঈশ্বরানুভূতিই হোক। ধর্ম সত্তামূলক, তার অস্তিত্ব কিছু-না-কিছু কোন-না-কোন আকারে থাকে। সত্তামূলক ভাববস্তু হিসাবে কার্য-রূপী-ধর্মের তাই একটি কারণ অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। সে কারণটি তাহোলে কি? ধর্ম নিশ্চয়ই কোন-না-কোন কিছু থেকে উৎপন্ন হয়। অনেক বস্তুতন্ত্রবাদীর মতে, ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে 'ভয়' থেকে। ভয় যেমন মৃত্যুভয়, পরলোকের অর্থাৎ পরলোকে নরকের ভয়, জীবনে দুঃখযন্ত্রণার বা পাপপুণ্যের ভয়, কর্মফলের ভয় প্রভৃতি।[৭] মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর; সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের, রক্ষার ও তাকে হারাবার জন্যে সর্বদাই লালায়িত, সচেষ্ট ও ভীত। স্বার্থকে বিসর্জন সে দিতে পারে একমাত্র পরমার্থের জন্যে, নচেৎ স্বার্থের নিমিত্তই তার সংসার। শত-সহস্র কামনা বাসনা থাকে তার স্বার্থের পিছনে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণে সে আত্মহারা, ভোগের আকাঙ্খাও থাকে অফুরন্ত, তাই ভয় হয় তার জীবনের চিরসাথী। ভয়ের ভ্রূকুটি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তার অন্তরে হয় ভাবের আবেগ ও উন্মাদনা। নাস্তিকের মতে, মনের একান্ত আবেগই ধর্ম। আস্তিক এই আবেগকে নিয়ে তাকায় কল্যাণকামী ভগবানের দিকে; জানায় তার অন্তরের আবেদন

৫। "Religion is the serious and social attitude of individuals or communities toward the power or powers which they conceive as having ultimate control over their interests and destinies." —'দি রিলিজিয়াস্ কন্‌শাসনেস্', পৃঃ ৪

৬। পল্ বার্টন: 'দি ইনার রিয়ালিটি,' পৃঃ ৩৩

৭। "Religion, says another group of modern thinkers, of whom Mr Edward Clodd is perhaps the most able English exponent, 'grew out of fear.' It is born of man's terror of the great and mysterious natural agencies by which he is surrounded." —গ্র্যাণ্ট এ্যালেন: 'দি ইভোলিউসন অব দি আইডিয়া অব গড' (১৯৩১) পৃঃ, ১৫৩; মার্কসপন্থীদের সিদ্ধান্তও তাই

ও প্রণতি। আস্তিকের কাছে ভগবানের প্রতি এই ভাবের একান্ত আকর্ষণ ও ভালবাসাই ধর্ম।

আসলে ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি কোনদিনই হয় নি, যদিও স্বার্থবিলাসী মানুষ এরকম সিদ্ধান্ত করে তার জড়দৃষ্টির জন্যে। ধর্ম-রূপ ভাববস্তুর সৃষ্টি হয় পবিত্র বিশ্বাসের উৎস থেকে এবং সেই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু ঈশ্বর বা শাশ্বত আত্মচৈতন্য। মানুষে থাকে অজ্ঞান ও সংকীর্ণতা; কিন্তু যখনি সে বিশ্বাস করে যে, ভগবান বা পরমার্থবস্তু বোলে কিছু আছে, তাঁর প্রতি শরণাগতির দ্বারা সকল বন্ধন ও অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তখনি সে ধর্মভাবের আশ্রয় নেয়, ধর্মের আসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার হৃদয়-মন্দিরে; সুতরাং ঈশ্বর অথবা পরমাত্মার ওপর বিশ্বাস থেকেই হয় ধর্মভাবের বা ধর্মের সৃষ্টি।

আস্তিক্য বা ঈশ্বরবিশ্বাসকে আমরা সাধারণত বলি ধর্মবিশ্বাস। অধ্যাপক প্র্যাট ধর্ম-বিশ্বাসকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (১) পরম্পরাগত বা ঐতিহাসিক ('traditional' or 'historical'), (২) যৌক্তিক বা বিচারসিদ্ধ ('rational') এবং (৩) ইচ্ছাকৃত বা অধ্যাত্ম ('volitional' or 'mystical') বিশ্বাস তথা ধর্মবিশ্বাস। তিন রকমের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি ধর্মকেও তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।[৭] অবশ্য অধ্যাপক প্র্যাট্ মানুষের মানসিক অবস্থাকে লক্ষ্য কোরেই বিশ্বাস ও ধর্মের এই বিভাগ স্বীকার করেছেন। আসলে বিশ্বাস ও ধর্ম কোনটিই কোনদিন সমাজ, রাষ্ট্র বা মানুষকে অপেক্ষা কোরে সৃষ্টি হয় না, যদিও ঐ দুটি ব্যষ্টিমানুষকে কেন্দ্র কোরেই বিকাশ লাভ করে।

ধর্ম নিজের স্বরূপে অখণ্ড হোলেও সামাজিক দৃষ্টিতে তার বিকাশ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। মানুষের মন ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সমাজেরও ক্রমোন্নতি হয়েছে। বুদ্ধি ও ধারণা দিয়েই আমরা বিশ্বের সকল-কিছু ভাল ও মন্দকে গ্রহণ করি ও বুঝি। তাই ধর্ম স্বরূপত এক হোলেও মানুষের বিভিন্নভাবে দেখার ও বোঝার জন্যে রূপভেদ তাতে আরোপিত হয়েছে। একেবারে আদিম যুগে মানুষ যখন সভ্যতার নিম্নস্তরে আসীন ছিল, তখন ধর্ম রূপায়িত হয়েছিল জড়পূজার ভিতর দিয়ে, ধর্মের অঙ্গ ছিল গাছ, স্তূপ, যূপ প্রভৃতি পূজা। ক্রমে জীবজন্তু, প্রেতাত্মা, পূর্বপুরুষ প্রভৃতির পূজা আরম্ভ হোল; প্রকৃতির উপাদান চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকারাও বাদ পড়ল না। বিশ্বস্রষ্টা ভগবান তখনো ঠিক ধারণার জগতে এসে রূপায়িত হন নি। বুদ্ধি-বিকাশের সাথে সাথে চেতন দেবতাদের কল্পনা হোল কল্পনা, জড় থেকে মানুষের মন নেমে এল চৈতন্যের জগতে—যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের যুগে আকাশচারী সূর্য রূপায়িত হোল মানুষের চৈতন্যে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ঈশ্বর, ভগবান বা আত্মজ্যোতিকে নিয়ে, জড় পেল প্রাণ ও চেতনা, ম্যাটারে আরোপিত হোল স্পিরিট, জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের চারটি মুক্তধারা প্রবাহিত হোল সাধনার রূপ নিয়ে, পৃথিবীর

৭। প্র্যাট: (১) 'দি রিলিজিয়াস কনশাসনেস', পৃঃ ১৩-১৪; (২) 'দি সাইকোলজি অব রিলিজিয়াস্ বিলিফ', (১৯০৭), এবং ব্যারণ ভন হিউগেল্: 'দি মিষ্টিক্যাল এলিমেণ্ট অব রিলিজিয়ন্'।

বুকে প্রতিষ্ঠিত হোল স্বর্গের সিংহাসন, ধর্মের সোপানে আরোহণ কোরে মানুষ পেল আশা ও আনন্দের ভিতর দিয়ে মুক্তির আশীর্বাদ।

ডাঃ মার্টিনো ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, ধর্ম বলতে আমরা বুঝি—চিরজাগ্রত ঈশ্বর ও বিশ্বের নিয়ন্তা হিসাবে দিব্যমন ও ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস। এই ধর্মের দ্বারা ভগবানের সাথে রচিত হয় মানুষের নৈতিক যোগসূত্র।[৮] ডাঃ মার্টিনোর মতে, অবিচ্ছিন্নভাবে ধর্মের সাথে থাকবে সত্যের অনুভূতি ও ভক্তির উৎকর্ষ।[৯] ধর্মকে প্রাকৃতিক (*Natural*) ও অতিপ্রাকৃতিক (*Supernatural*) এই দুই শ্রেণীতে তিনি আবার ভাগ করেছেন। ধর্মের মধ্যে থাকে আস্তিক্য বুদ্ধির সাথে প্রেম, পূজা, আবেগ, বিস্ময়, পুলক, প্রণতি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি। বিশ্বাস, ভক্তি ও উপাসনাই যেন ডাঃ মার্টিনোর মতে ধর্মের অপরিহার্য উপাদান। রবার্ট ফ্লিন্টের অভিমত অনেকটা তাই। ফ্লিন্ট বলেছেন, দেবতার সাথে মানুষের ঐক্য অথবা সকল চিন্তা, ভাব ও কাজের সাথে অলৌকিক কোন শক্তির ওপর নির্ভরের ধারণাই ধর্ম।[১০] তাঁর মতেও ধর্মের মধ্যে থাকবে বিচারের সাথে অনুভব ও সহানুভূতি।[১১] ফরাসী দার্শনিক আগাষ্ট্ কোঁতে (Comte) ধর্মকে মানবতার দিক থেকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, জীবসেবা-রূপ মানবজাতির কল্যাণসাধন করাই ধর্ম (Religion of humanity)। এই ধর্মে ঈশ্বর বা ভগবানের কোন স্থান নাই, মনুষ্যসমাজের সেবাই প্রধান। কোঁতে তাই বলেছেন, ঈশ্বরোপাসনা মানব-সভ্যতার আদিযুগের ব্যবস্থা হোলেও বর্তমান কালে তাকে কুসংস্কার ভেবে ত্যাগ করা উচিত। "এই মানবতার ধর্মকে বর্তমানে শুদ্ধমানবতা (humanism) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জগতে ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।[১২] এখন আমরা যাহাকে সমাজতন্ত্রবাদ (socialism), সমভোগবাদ (communism) বা মার্ক্সবাদ (Marxism) বলি সেগুলিও এই মানবতার রূপান্তর মাত্র এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইয়াছে"।[১৩]

৮। "Understanding by 'Religion' belief in an Ever-living God, that is, a Divine Mind and Will ruling the universe and holding Moral relations with mankind, * * ."—ডাঃ মার্টিনো : 'ষ্টাডি অব রিলিজিয়ন', ১ম ভাগ, পৃঃ ১-১৫

৯। "In the soul of Religion, the apprehension of truth and the enthusiasm of devotion inseparably blend." —'ষ্টাডি অব রিলিজিয়ন,' ১ম ভাগ, পৃঃ ১

১০। "Religion is man's communion, then, with what he believes to be a god or gods; his sense of relationship to, and dependence on, a higher and mysterious agency, with all the thoughts, emotions and actions, which proceed therefrom".—আর. ফ্লিন্ট : 'থিইজিম্' (১৯০২), পৃঃ ৫২

১১। "There can be no religion where feeling and affection are not added to knowledge."—'থিইজিম্', পৃঃ ২

১২। বর্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভিতর, বিশেষ্ কোরে এফ্. সি. শিলারই শুদ্ধমানবতা (Humanism) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

১৩। (ক) ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'দর্শন' পত্রিকা (১৩৫৯), ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫৩

বস্তুতন্ত্রবাদী কার্ল মার্ক্স ধর্মকে দেখেছেন সমষ্টি মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে; তাই ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, মার্ক্সের কাছে তার কোন অর্থ নেই। মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও রাষ্ট্রের প্রজার ওপর আনুগত্য যে ধর্মবিশ্বাসে থাকে না, তা ধর্মের মধ্যে গণ্য নয়। কমিউনিষ্টদের ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কেনেথ ওয়ালকার তাঁর 'মিনিঙ্ এ্যাণ্ড পারপাজ' (১৯৫০) বইয়ে (পৃঃ ১৭৯) উল্লেখ করেছেন,

"The attitude of communists to religion is in keeping with their belief that consciousness is a derivative of matter, a belief which is summed up by Engels as follows: 'Religion is nothing but the fantastic reflection in men's mind of those external forces which control their early life'. For them religion was also one of the obstacles of revolution, for it prevented the proletariat from becoming discontented with their lot, and hence the famous dictum of Marx and Engels, 'Religion is the opium of the people'."

মানবধর্ম ভারতবর্ষে অবিদিত নয়, কিন্তু ভারতে কোথাও বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে অস্বীকার করা হয় নি, বরং ভারতবাসীরা মনে করেন যে, ঈশ্বর বা ভগবানই অন্তর্যামী-রূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন, মানুষের সেবার অর্থই জীব-রূপে শিবের সেবা করা। খৃষ্টান মিশনারীদের জীবসেবার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার ভাব নিহিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। জীবকে শিব বা নারায়ণবুদ্ধিতে সেবা-রূপ ধর্ম পাশ্চাত্যের শুদ্ধ-মানবতা-রূপ ধর্মের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।

পাশ্চাত্যদর্শনে ধর্মকে প্রণালী, পথ বা সাধন হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। তাতে কারো মতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, কারো মতে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কারো মতে সেবা, আবার কারো মতে নিছক বুদ্ধির খেলা বা বিচারই ধর্ম। দার্শনিক লাইবনিজ ধর্মকে বলেছেন, বিশ্বাস ও বিচারের যুগ্মরূপ। ডেভিড হিউম ধর্মকে দেখেছেন মনোবৈজ্ঞানিকী দৃষ্টিভঙ্গীতে, তাই ধর্মের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেছেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ভাব ও আবেগকে। ইমানুয়েল কাণ্ট ধর্মকে ঈশ্বরের আদেশপালন-রূপ নৈতিক কর্তব্য ('moral duties conceived as command of God') বোলে বর্ণনা করেছেন, যদিও সেই নৈতিক কর্তব্য বিচার-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অধীন। তিনি বলেছেন, বিচারের বাইরে ধর্মবিশ্বাসের কোন স্থান থাকতে পারে না। দার্শনিক হেগেল ধর্মকে মানবপ্রাণের সার্বভৌমিক ও অপরিহার্য ভাব বলে পরিচয় দিয়েছেন। হেগেলের মতে, ধর্ম জ্ঞানরূপী ভগবানের সাথে একটি মধুর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।[১৪] ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে, ধর্ম নৈতিকতা ও ভাবাবেগের সংমিশ্রণ রূপ। এছাড়া অন্যান্য

(খ) ডাঃ প্রিঙ্গেল-প্যাটিসন্ কোঁতের মানবতার ধর্মকে যথার্থ ধর্মের অর্ধেক অংশ বোলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, কোঁতের ঈশ্বরবুদ্ধিবিহীন মানবতার ধর্ম ও হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয় উপাসনা এই দু'টি অর্ধসত্য ও পরস্পরের পরিপূরক ('complementary half-truths'), কাজেই স্বতন্ত্রভাবে এদের কোনটিই সম্পূর্ণ নয়।

১৪। হেগেল বলেছেন: "In religion man places himself in a relation to this

পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলেই কেউ বা দেবতার প্রতি মনুষ্যযোগ্য ব্যবহারকে, কেউ বা অলৌকিক শক্তির সাধনাকে, আবার কেউ বা অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাস ও তার তুষ্টি-সম্পাদনকে ধর্ম বলেছেন। এঁদের সকলের ধর্মে দেবতা বা অলৌকিক শক্তির স্থান থাকলেও বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের কোন স্থান নেই।

অবশ্য ভারতবর্ষীয় ধর্মেও এ'দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন, মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের জন্যে কোন স্থান নির্বাচন করেন নি, ঈশ্বর অসিদ্ধ বোলেই তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন রকম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে ধর্মের চরমলক্ষ্য বলেছেন। মহামুনি জৈমিনি তাঁর মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বরের আসন দেন নি, মন্ত্ররূপী দেবতাদের প্রভাব মাত্র স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, যাগযজ্ঞ-রূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান তথা ধর্মের আচরণে যে একটি অদৃষ্ট 'অপূর্ব' নামে শক্তির সৃষ্টি হয় তারই মাধ্যমে কর্মনিষ্ঠ সাধক স্বর্গসুখ লাভ করেন। বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনেও ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় নি, কিন্তু সেখানে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে মৈত্রী, করুণা, প্রেম, ভালবাসা ও জীব-সেবারূপ সদ্‌গুণগুলির স্থান দেওয়া হয়েছে।

বেদান্তের ধর্ম এসব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মহান্‌। বেদান্তের ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ধর্ম শুধু মানবজাতির নয়, প্রাণীমাত্রের অন্তরে প্রেম-মন্দাকিনীর অমৃতধারা প্রবাহিত করে। বেদান্তের ধর্ম পৃথিবীর পঙ্কিল মাটিতে মানুষকে করে চিরপবিত্র জাগ্রত ভগবান। আবার এর বিকৃতি বিশ্বের বুকে সৃষ্টি করে প্রলয়ের রূপ, প্রবাহিত করে শোণিতের স্রোতস্বিনী।[১৫] সার্বভৌমিক বেদান্তের ধর্ম একাধারে ধর্ম ও দর্শন দুইই। ইউরোপে গ্রীক ও রোমাদের ভিতর বিভিন্ন দর্শনচিন্তার সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্তু কোনটিই ধর্মের আদর্শের সাথে নিজেদের যোগসূত্র রক্ষা করতে পারেনি, কিংবা ধর্মসেবীদের মনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হোত, তাদের অপসারণ করতে সক্ষম হয়নি, অথবা কোনটিই মানবহৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কোরে স্বার্থপরতার অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ দেখাতে পারেনি। কিন্তু বেদান্তে আমরা সে সকল সমস্যারই পূর্ণ-সমাধান দেখতে পাই। বেদান্তের ধর্ম থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, বিশ্ববৈচিত্র্য ক্রমবিকাশের পথে সৃষ্টি হয়েছে, অকস্মাৎ একদিনে আকাশ থেকে হয়নি এবং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের বুকে বিজ্ঞানের যত-কিছু আবিষ্কার হয়েছে ও হবে তাদের রহস্য মানবমনের সামনে নিশ্চয়ই একদিন উদ্‌ঘাটিত হবে।[১৬]

centre, in which all other relations concentrate themselves. and in so doing he raises up to the highest level of consciousness and to the region which is free from relation to what is other than itself, to something which is absolutely self-sufficient, the uncoditioned, what is free, and is its own object and end".—'লেকচার্স অন্‌ দি ফিলজফি অব রিলিজিয়ন' (১৮৯৫), ১ম ভাগ, পৃঃ ২

১৫। অভেদানন্দ : 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্‌ রিলিজিয়ন,' পৃঃ ৭৮

১৬। ঐ, পৃঃ ৮৬

বেদান্তের ধর্মকে আমরা উদার ও সার্বভৌমিক বলি, যেহেতু সকল সাধকের জন্যে তা একই ধরণের উপদেশ কখনও নির্বাচন করেনি। বিচিত্র রুচি অনুযায়ী মানুষের মন যেমন বিভিন্ন, তাদের সাধনাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। তবে বিভিন্ন সাধনাকে সাধারণত বিভক্ত করা হয়েছে চারভাগে এবং তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'যোগ'—যা চরমলক্ষ্যে পৌছাবার পন্থাবিশেষ।[১৭] বেদান্তের সার্বভৌমিক ধর্ম মৈত্রী স্থাপন করেছে বিজ্ঞান, দর্শন ও সকল দেশের সকল রকম ধর্মের সাথে এবং তারি আদর্শ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সত্যিকারের ধর্ম কোন আচারবিচার, পুঁথিপত্র বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে না, তা স্বচ্ছন্দবিহারী ও স্বাধীন।[১৮]

সার্বভৌমিক বেদান্তধর্মের চরমনীতিই হোল অখণ্ড দিব্যভাবের বিকাশসাধন করা। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি',—ব্রহ্মবস্তু এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু নাম-রূপে তিনি বিচিত্রভাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন। ব্রহ্মচৈতন্য শুধু চেতন প্রাণী কেন, অচেতন বস্তুমাত্রেরও স্বরূপ; সৎ, চিৎ ও আনন্দের অধিষ্ঠান। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ—আত্মার আত্মা। অন্তর্যামী-রূপে প্রত্যেকের অন্তরেই তিনি আসীন। 'কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ,'—'হৃদয়-আকাশ যদি অমৃতস্বরূপ আত্মচৈতন্যের দ্বারা পরিপূর্ণ না থাকে তবে এক মুহূর্তও কোন্ প্রাণীই বা বাঁচতে পারে?' বিরাটপুরুষ অর্থাৎ সর্বব্যাপক আত্মচৈতন্যকে সংস্কৃতে ব্রহ্ম বলে। প্লেটো এঁকে বলেছেন 'পরমকল্যাণ' (গুড্), স্পিনোজা 'চরমবস্তু' (সাব্‌স্ট্যান্‌সিয়া), কাণ্ট 'অজ্ঞেয় জ্ঞানাতীত' (ডিঙ্-এ্যান-সিচ্), সোপেনহাওয়ার 'বিরাট মন' (উইল), ইমার্সন 'পরমাত্মা' (ওভারসোল) ও স্পেন্সার বলেছেন 'অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত' (আন্‌নোন্ এ্যাণ্ড আন্‌নোয়েবেল্)। খৃষ্টানেরা এই বেদান্তের ব্রহ্মকে বলেছেন 'স্বর্গস্থ পিতা', মুসলমানেরা বলেছেন আল্লা।' এঁকে জিহোবা, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি নামে এবং রূপেও পূজা করা হয়। ইনি সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ-ঈশ্বররূপেও প্রতীত হন।[১৯]

'প্রকৃত ধর্মের উদ্দেশ্য' (Aim of True Religion)[২০] সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, 'যেমন মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের অপরাপর সমস্ত জাতির ওপর নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, বর্তমান কালেও বেশীর ভাগ খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ভিতর সেই ভাব দেখা যায়। মুসলমানেরা যেমন একহাতে কোরাণশরিফ ও একহাতে তরবারি নিয়ে ইস্‌লাম-ধর্ম প্রচার করেছিলেন, খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরাও ঠিক সেইভাবে একহাতে বাইবেল ও অন্য হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খৃষ্টানধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আসলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য তা নয়; প্রভাব, প্রতিপত্তি, ভীতিপ্রদর্শন বা অত্যাচারের দ্বারা মানুষের মনে কখনো ধর্মভাব উদ্দীপিত করা যায় না। ধর্ম প্রাণের জিনিস,

১৭। ঐ, পৃ০ ৮৭
১৮। ঐ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫
১৯। ঐ, পৃঃ ১৫৫—১৫৩
২০। ঐ, পৃঃ ১২০—১২৯

অনুভূতির বস্তু, স্বতঃস্ফূর্ত তার গতি, প্রেম আকুলতা অনুরাগ শ্রদ্ধা ও চিত্তশুদ্ধি ছাড়া ধর্মের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আত্মশ্লাঘা ও অতুল ঐশ্বর্যের দ্বারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হোতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মসম্পদ অধিগত করা যায় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, আত্মতত্ত্বের উপাসনা, সকলের প্রতি অকপট আচরণ করা ও সর্বপ্রাণীতে অহৈতুক ভালবাসাই আসল ধর্মের আদর্শ। পররাজ্যলোলুপতা, যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যথার্থ ধর্মের লক্ষ্য নয়, পরন্তু ভ্রাতৃপ্রেম, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সদয়-ব্যবহারই ধর্মের সত্যিকারের উদ্দেশ্য'।

স্বামী অভেদানন্দ ধর্মের রূপকে সাধরণত দুটি অংশে ভাগ করেছেন: 'একটি বাহ্য ও গৌণ (non-essential) ও অপরটি অপরিহার্য ও মুখ্য (essential)'। পূজানুষ্ঠান, আচার-বিচার, যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র এ'সমস্তকে তিনি ধর্মের বহিরাবরণ বলেছেন। কিন্তু তাহোলেও তারা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়, কেননা সাধারণ বিচারবিহীন মন বাইরের ও আনুসঙ্গিক বস্তু বা প্রণালীর মাধ্যমেই ধর্মের সত্যিকারের রূপকে গ্রহণ করতে চায়। তাই সেই সবেরও প্রয়োজন আছে সত্যাপলব্ধির সহায়ক-রূপে। তবে তারা গৌণ। গৌণ সকল-কিছুই কোনদিন মুখ্যবস্তুর অপরিহার্য অঙ্গ হোতে পারে না। মুখ্য চিরদিনই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ধর্মের মুখ্য অংশকে তিনি আবার দু'রকম বলেছেন: আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম (Self-knowledge and Self-control)। ধর্মের গৌণ অংশ যেন আবরণ বা খোলা ও মুখ্য অংশ শস্য। ধর্মের গৌণ অংশ থেকে কুসংস্কার, গোঁড়ামী, ভাবপ্রবণতা, বাইরের আড়ম্বর প্রভৃতি সৃষ্টি হোতে পারে; সাধারণ ধর্মসেবীরা এগুলিকেই ধর্মের আসল রূপ বা উপাদান মনে কোরে ভুল করেন। ধর্মক্ষেত্রে তাই সারল্য, বিশ্বাস ও অনুরাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে'।[২১] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে, ধর্ম মানুষের অন্তরতম বস্তু, মানুষের সত্যিকারে স্বরূপ; তা বাইরের ঐশ্বর্য থেকে চিরদিনই নির্মুক্ত।[২২]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ধর্ম প্রত্যক্ষমূলক ও ব্যবহারিক, তা শুধুই পুঁথিগত নয়। কেবল শাস্ত্রপাঠ ও দর্শন-আলোচনার দ্বারা ধর্মের দিব্যভাব হৃদয়ে জাগ্রত হয় না, ধর্মের আদর্শকে প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিভাত করা দরকার। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলে স্বীকার করেছেন যে, ধর্ম ব্যবহারিক ও পরমকল্যাণস্বরূপ ভগবানের

২১। "Every religion can be divided into two parts * * *, and self-control is the restraint of the lower self or selfish nature."—অভেদানন্দ: 'স্পিরিচুয়াল আনফোল্ড-মেণ্ট', পৃ: ১—৬

২২। "*Dharma* is the innermost nature, the essence, the implicit truth, of all things. *Dharma* is the ultimate purpose that is working in our self."—রবীন্দ্রনাথ: 'সাধনা' (১৯৪৭) পৃ: ৭৪

ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত।[২৩] প্রত্যেক ধর্মগুরু ধর্মকে সাধনার মাধ্যমে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের জীবনই হয়েছিল ধর্মের জলন্ত নিদর্শন। অদৃষ্ট, প্রাক্তন, দৈবশক্তি, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব কোনদিনই ধর্মের আদর্শকে জাগ্রত করতে পারে না। অবৈজ্ঞানিক বিচারবিহীন লোকেই অন্ধের মতন অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির হাতে ক্রীড়নক হয়। মনে রাখা উচিত যে, কোন জিনিসের কারণ জানি না বোলেই তাকে আমরা বলি 'অদৃষ্ট'। কিন্তু অজ্ঞাত অদৃষ্টের পিছনেও একটি কারণ বা নিয়মশৃঙ্খলা নিশ্চিতভাবে থাকে। বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অদৃষ্টবস্তু ক্রমশই মানুষের জ্ঞানের পরিধিতে ধরা দিচ্ছে।[২৪] অধ্যবসায় ও সাধনারই সর্বত্র বিজয়-অভিযান। স্বামী অভেদানন্দ তাই অদৃষ্টের চেয়ে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। এছাড়া আত্মকেন্দ্রগামী ধর্মই মানুষের মনকে সুনির্মল ও স্বচ্ছ করে এবং সেই স্বচ্ছ নিরাবরণ আলোক-বিজ্ঞানে মানুষ জানতে পারে বিশ্বের সকল রহস্য, চরমরহস্য-রূপ আত্মানুভূতির দ্বার হয় তার উন্মুক্ত, সংস্কার-রূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার যায় চিরদিনের জন্যে দূর হোয়ে।

ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যেমন সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পচাতুর্য ও আধ্যাত্মিকতার অরুণোদয় প্রথমে ভারতবর্ষের মাটিতেই হয়েছিল, তেমনি ধর্মও রূপায়িত হয়েছিল সর্বপ্রথম ভারতের তপোবনে। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "বিশ্বের ধর্মেতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সমগ্র দেশের সুমহান্ ধর্মের জন্মভূমি এই সুপ্রাচীন এসিয়া মহাদেশ। সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মের আদর্শ যে বর্বর ও অসভ্য জাতিদের চরিত্রকে গড়ে তুলেছে, নীতিবিজ্ঞান ও নৈতিক আচারের দিব্যপ্রেরণা অসংযত মানুষের মনকে সমুজ্জ্বল করেছে, মানুষকে পশুস্তর থেকে তুলে দেবতার মহিমায় সমুন্নত ও দিব্যস্বভাবে রূপান্তরিত করেছে এবং যুগনায়কদের অধ্যাত্ম আদর্শে মনুষ্য-সমাজ পবিত্র হয়েছে একথা সত্য এবং এ' সকল সম্ভব হয়েছে একমাত্র প্রাচ্যেরই পুণ্যভূমিতে! এসিয়া মহাদেশই সৃষ্টি করেছে মোজেস্ ও যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও জারাথুষ্ট্র, কনফিউসিয়াস ও বুদ্ধ,

২৩। "For religion is practical, therefore still is dominated by the idea of the Good, * *. "—ব্রাড্‌লে: 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' (১৯৩০) পৃ: ৩৮৯

২৪। স্বামী অভেদানন্দ, অন্যত্র এসম্বন্ধে আর একভাবে বলেছেন: 'Even today there are many who believe in accidents. Gradually, when all the supernatural powers were unified into one personal God, the effects of unknown causes were called Providential. But in reality, all accidents have natural causes whether we know them or not. That which appears to be supernatural or Providential to an unscientific mind, is natural to a scientist or a philosopher whose conception of nature is larger and more universal. Therefore, all chance-events or socalled accident occurrences are just as much governed by the law of causation or *Karma* as any ordinary result of some known cause."—'ডক্‌ট্রিন্ অব কর্ম' (১৯৪৭), পৃ: ৮

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতন মহামানবদের। প্রাচ্যের দিকচক্রবালই সর্বদা উজ্জ্বল হয়েছে দিব্যজ্ঞান-রূপ স্বয়ংজ্যোতিষ্মান সূর্যের আলোক-মহিমায়। যখনি বিশ্বের কোনখানে ধর্মের জাগরণ হয়েছে তখনি তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখি যে, আধ্যাত্মিকতার প্লাবন প্রবাহিত কোরে আবির্ভূত হয়েছেন প্রাচ্যমহাদেশেরই কোন অংশে কোন এক মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের অবতার। বর্তমান যুগে বেদান্তের যে সার্বভৌমিক ধর্ম সমগ্র পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত কোরে সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্মাদর্শকে গড়ে তুলছে তারো উদ্ভব হয়েছে বহুদিন পূর্বেই এই প্রাচ্যমহাদেশের বুকে"। [২৫]

স্বামী অভেদানন্দের এই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় উক্তি মোটেই সাময়িক ভাবাবেগ ও স্বদেশ-প্রীতিপ্রসূত একদেশী নয়, বিশ্বের ইতিহাসই বরং জ্বলন্ত অক্ষরে এর সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং অনন্ত অনাগত ভবিষ্যতের বুকেও নিসন্দিগ্ধভাবে এই সাক্ষ্য অধিকতর সুপ্রমাণিত হবে!

স্বামী অভেদানন্দ সকল ধর্মকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন; সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমান শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব অটুট। পাশ্চাত্যে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল থাকার সময় তিনি যেমন সনাতন হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের সার্বভৌমিক আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তেমনি বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, তিব্বতে লামাধর্ম, জাপানে সিন্‌টোধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, ইসলামধর্ম, তাওধর্ম, মিত্রধর্ম[২৬] প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেও বিরত হন নি। আমেরিকায় রেভারেণ্ড হিবার নিউটনের সুবিশাল গ্রন্থাগারে বহুদিন ধ'রে বিচক্ষণ শিক্ষার্থীর মতন বিচারশীল মন ও অপক্ষপাত মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে অসংখ্য রকমের পুস্তক পাঠ করেছিলেন। তিনি বাইবেলের সকল সংস্করণ, ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনি, সমালোচনা, হায়ার ক্রিটিসিজম্ এবং বিভিন্ন চার্চীয় ইতিহাসের পরিপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। যদিও ডাঃ ষ্ট্রাসের মতবাদের চেয়ে আর্নেস্ত্‌ রেণাঁকেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন, তথাপি ষ্ট্রাসের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিপ্রণালীকে, রেভারেণ্ড জে. এম. রবার্টসন, আর্থার ড্রুজ প্রভৃতির বিচারসম্মত আলোচনাকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ডাঃ ষ্ট্রাসের একান্ত ভক্ত। স্বামী অভেদানন্দ কোনদিন খৃষ্টানধর্মের অনুদার গোড়ামীকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি সকল রকম খৃষ্টান-ধর্মসম্প্রদায়ের সাথে নির্বিকার চিত্তে যেমন একদিকে মেলামেশা করতেন, তাঁদের আচার-অনুষ্ঠানের সাথেও অন্যদিকে তেমনি নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। খৃষ্টানধর্মে আর্মেনিয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান,

২৫। "The religious history of the world tells us that from time immemorial Asia has been the cradle of all great religions. All the religious ideals * * which is moulding very long ago in the very heart of the Orient."—অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ১৫৪

২৬। স্বামী অভেদানন্দের (ক) 'বুদ্ধ এ্যাণ্ড হিজ টিচিংস্', (খ) 'লামাইজিম্ ইন্ টিবেট্', (গ) 'সিন্‌টোইজম্ ইন্ জাপান', (ঘ) 'জিসাস্ এ্যাণ্ড হিজ্ টিচিঙ্‌স্', (ঙ) 'ক্রাইষ্ট এ্যাণ্ড ক্রিষ্টমাস্', (চ) 'ডিড্ ক্রাইষ্ট টিচ্ এ নিউ রিলিজিয়ন্' প্রভৃতি ইংরেজী বক্তৃতাগুলি এখনো পর্যন্ত (১৯৫১ খৃঃ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

ক্যাথলিক, লাটিন, ন্যাশানাল প্রভৃতি চার্চের ধর্ম ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল অপরিসীম। কিন্তু খৃষ্টানধর্মের প্রাচীনপন্থী সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও যুক্তিহীন ভাবকে তিনি বলতেন 'চার্চিয়ানিটি' (Churchianity)। 'চার্চিয়ানিটি' পরিভাষটি তার নিজের সৃষ্টি। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত "হোয়াই এ হিন্দু এ্যাক্সেপ্টস্ ক্রাইষ্ট এ্যাণ্ড রিজেক্টস্ চার্চিয়ানিটি" বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, উদার মতাবলম্বী হিন্দুরা বর্তমান খৃষ্টানচার্চের ধর্মকে যীশুখৃষ্ট-প্রচারিত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বোলে মনে করেন। বর্তমান খৃষ্টানজগৎ যীশুখৃষ্টের নামে যে-ধর্ম প্রচার করেন তার নাম 'চার্চিয়ানিটি':

"Speaking from the Hindu standpoint, the religion which the churches uphold and preach today, which has been built around the personality of Jesus the Christ, and which is popularly known as Christianity should be called 'Churchianity', in contradistinction to that pure religion of the heart which was taught by Jesus the Christ and practised by his disciples".[২]

যীশুখৃষ্ট-প্রচারিত ধর্মে কোন আচারবিচার ও অনুষ্ঠানের বাহুল্য ছিল না। সে-ধর্ম ছিল প্রাণের ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির ধর্ম। ঠিকঠিকভাবে বলতে গেলে, বর্তমান খৃষ্টানধর্মের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে ৩২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। সেই সময় চলেছে রোমান্ সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের রাজত্বকালের বিংশতম বৎসর; তখনই নিসিয়ায় বিখ্যাত ধর্মমহাসভার অধিবেশন বসে। সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩২১ খৃষ্টাব্দে একটি ফতোয়া জারী করলেন যে, জনসাধারণ শনিবারে ইহুদীয় সাবাথের (Sabbath) পরিবর্তে যেন রবিবারকে (Sunday) পবিত্র দিন হিসাবে গণ্য ও পালন করে। সূর্যকেই আমরা সকলের ঈশ্বর (Lord) বলি, সুতরাং রবিবার যখন সূর্যের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত দিন তখন এই দিনকেই বিশিষ্ট একটি প্রার্থনার দিন হিসাবে গণ্য করা উচিত।[৩] সম্রাট কনস্টান্টাইনের নির্দেশ তখন থেকে সমস্ত চার্চই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু চার্চের ইতিহাস (এক্লিজিয়াষ্টিক্যাল হিষ্টরী) যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, কিভাবে নিসিয়া-মহাসভায় অসহায় কুমারীরা লাঞ্ছিতা ও নির্যাতিতা, পবিত্র ধর্মমন্দিরগুলি কলুষিত, ধর্মশাস্ত্র ও গির্জাগুলি দগ্ধ হয়েছিল ও প্রকৃত সাধুচিত্ত খৃষ্টান-সন্ন্যাসীরা পদদলিত হয়েছিলেন, যদিও এ' সমস্ত অন্যায় অত্যাচার তদানীন্তন খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক ও যাজকমণ্ডলীই করেছিলেন। এছাড়া ৪৩১ খৃষ্টাব্দে এফিসাসের মহাসভায় খৃষ্টানসন্ন্যাসী ও বিশপদেরও এই বোলে সাবধান কোরে দেওয়া হয়েছিল যে, যে কেউ সম্রাট কনস্টান্টাইনের আদেশ অমান্য করবে তাকে 'নেস্তোরিয়াস্' (অবিশ্বাসী) হিসাবে গণ্য এবং হত্যা করা হবে। তার ফলে হয়েছিল যে, সম্রাটের আদেশ অমান্য করার জন্যে একজন বিশপ অন্য একজন বিশপকে পদাঘাত কোরে মেরে ফেলেন এবং পরে ১৩৭ জন বিশপের মৃতদেহও চার্চের মধ্যে নৃশংস অত্যাচারের নিদর্শন-রূপে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কোরে রাখা হয়েছিল।

২। অভেদানন্দ: 'হোয়াই এ হিন্দু এ্যাক্সেপ্টস্ ক্রাইষ্ট এ্যাণ্ড রিজেকটস্ চার্চিয়ানিটি' (১৯৪৬), পৃ· ১

৩। 'This day shall be regarded as a special occasion for prayer, because it is the Sun's day, the day of our Lord."

যীশুখৃষ্ট নিজে বা তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে কেউ এমন কোন গস্‌পেল লিখে যান নি, যেগুলিকে খৃষ্টানচার্চ পরে ঈশ্বরীয় আদেশ বা বাণী বোলে মেনে নিয়েছিল; এমনকি যীশু-খৃষ্টের সমসাময়িক কোন নথিপত্র বা ইতিহাসও পাওয়া যায় নি—যা থেকে যীশুখৃষ্টের প্রামাণিক কোন জীবনী ও প্রত্যক্ষ বাণী আমরা পেতে পারি। বাইবেলে বা সেই ধরণের কোন পবিত্র পুস্তকেও যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিক জীবনের কোন নিদর্শন নেই; তবে এ'সম্বন্ধে আমরা একমাত্র প্রামাণিক ও প্রাচীন লেখাপত্র (Epistles) পাই মনীষী সেণ্ট পলের। তাও সেণ্ট্ পলের নামে চৌদ্দটি মাত্র এপিসিল্‌স্ পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি মাত্র এপিসিল্‌স্‌কে প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেই বারটি এপিসিলসের নাম: রোমানদের উদ্দেশ্যে লিখিত এপিসিল্‌স্, কোরিনথিয়ানদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় এপিসিল্‌স্ এবং গ্যালেসিয়ানদের উদ্দেশ্যে লিখিত এপিসিল্‌স্। কিন্তু যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে সেণ্ট্ পলের এই সমস্ত এপিসিল্‌স্ যে প্রামাণিক তার কোন নিশ্চয়তা নেই, কেননা সেণ্ট পল যীশুখৃষ্টকে কোনদিনই জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখেন নি, একবারমাত্র দেখেছিলেন নাকি স্বপ্নে বা ভাবচক্ষে। তাছাড়া যীশুখৃষ্টের বাণীও তিনি শেষ-ভোজনের (লাষ্ট-সাফার) উদ্দেশ্যে একবার মাত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাছাড়া আর কোথাও বা কোনদিন যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে তিনি কোন কথার উল্লেখ অথবা তাঁর প্রচার করেন নি। তাই প্রাচীনপন্থী গোঁড়া খৃষ্টানেরা আজো স্বীকার করেন যে, বর্তমান খৃষ্টানধর্মের আচারবিচার, নিয়মকানুন ও রূপ সমস্তই সেণ্ট পলের নিজের উদ্‌ভাবিত বা সৃষ্টি।

খৃষ্টানধর্মের প্রাচীন ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, গস্‌পেল ছিল অনেকগুলি, কিন্তু চারখানি ব্যতীত আর সমস্তগুলি নষ্ট কোরে ফেলা হয়েছে। ১৭৮—২০০ খৃষ্টাব্দে গলদেশে লাইয়নের বিশপ ইরেনিয়াসের সময় থেকে চারখানি 'ক্যাননিকাল্ গস্‌পেল'-এর কথা আমরা শুনতে পাই এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান খৃষ্টানচার্চের নিয়মকানুন ও আচারবিচারগুলি প্রবর্তন করেন। বিশপ ইরেনিয়াসও চারখানি গসপেলের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন এবং চারটি সংখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর যেমন চারটি দিক, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এই চারটিমাত্র ভৌতিক উপাদান, চার ঋতু, চাররকম বায়ু ও চার্চের প্রধান স্তম্ভের সংখ্যা যখন চার, তখন গস্‌পেলেরও সংখ্যা চারটির বেশী বা কম হওয়া উচিত নয়। অবশ্য ইরেনিয়াসের যুক্তির মধ্যে নিজের মতবাদের মূল্যই বেশী, বিচার বা ইতিহাসের কোন স্থান নেই।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, খৃষ্টানদের বিশ্বাসনীতি বা এ্যাপোসলস্-ক্রিডের বারোটি ধারা (Twelve Articles of Faith) পাঠ করলে আমরা দেখি যে, সেগুলি আসলে 'রিফরমেশন-থিওলজি'-র প্রধান সমর্থক এবং উপাদানও বটে। আবার 'এপিস্কোপাল' বিশ্বাসনীতির উনচল্লিশটি ধারা ঐগুলি থেকে সৃষ্টি হোলেও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি তাদের পিছনে বিন্দুমাত্রও নেই। ওই বিশ্বাসনীতিগুলির মধ্যে একটি যেমন, ছ'দিনে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তাও একজন স্বর্গবাসী ঈশ্বর শূন্য থেকে অকস্মাৎ সৃষ্টি করেছিলেন।

দ্বিতীয় নীতি হোলঃ যীশুখৃষ্টই জগতে একমাত্র নির্বাচিত ঈশ্বরের সন্তান ও যুগনিয়ন্তা। অবশ্য অবতার ও শব্দ (শব্দব্রহ্ম) থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে—এই ইন্দো-আরিয়ান মতবাদ ভারতবর্ষে নূতন নয়, বরং ভারতবর্ষেই এই সমস্ত ধারণার সৃষ্টি এবং ভারত থেকে পরে গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়েছিল, কেননা তার প্রমাণ পাই আমরা গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস, পাইথাগোরাস, প্লেটো, নব্য-প্লেটোপন্থীগণ এবং চতুর্থ গস্‌পেলের রচয়িতা ফাইলো জুডিয়া ও তাঁর অনুবর্তীগণের লেখার ভিতর। খৃষ্টানধর্মে আদমের স্বর্গ থেকে পতন ও অভিশপ্তা ইভ জগতে দুঃখ-অনর্থের জন্য দায়ী—এই কল্পনাটি নিছক পৌরাণিকী (কাল্পনিক)। হিন্দুশাস্ত্রে অবশ্য পাপের কথা আছে, কিন্তু পাপের অর্থ সেখানে স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতাই মানুষকে তার পবিত্রতা থেকে চিরবঞ্চিত করে। খৃষ্টানধর্মে আরো কতকগুলি অদ্ভুত মতবাদ আছে, যেমন—মৃত্যুর পর স্বর্গে পাপীদের শাস্তিদান, স্থূলশরীরে যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থান, ঈশ্বর-কর্তৃক পাপীর শাস্তি এবং পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার দান, প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা বা মতবাদগুলির মধ্যে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই। যুক্তিবাদী হিন্দুরা তাই বর্তমান খৃষ্টানচার্চের সাম্প্রদায়িক ধর্মকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন না, যদিও যীশুখৃষ্টকে তাঁরা মহামানব ও সিদ্ধ মহাযোগী হিসাবে পূজা করেন। যীশুখৃষ্ট যথার্থই একজন যোগজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, বেদান্তের সার্বভৌমিক অখণ্ডজ্ঞান তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান খৃষ্টানধর্ম ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যীশুখৃষ্টকে গ্রহণ করতে পারেন নি, আর তাই সে-ধর্ম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ কোরে ফেলেছে।

—একাদশ আলোচনা—

অধ্যাত্ম সাধনা

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সাধনা বলতে আমরা বুঝি অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করবার প্রত্যক্ষ উপায় বা প্রণালী। সাধনার মধ্যে মানসিক ও শারীরিক এই উভয় ক্রিয়ার স্থান আছে। কারণকে জানতে গেলে যেমন কার্যকে অনুসরণ করতে হয়, তেমনি আত্মজ্ঞান, মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করতে গেলে তার সাধনা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। মুক্তি বা জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সাধ্যবস্তু নয়; অর্থাৎ সাধন-রূপ ক্রিয়া থেকে মুক্তি মোটেই উৎপন্ন বা সৃষ্ট-বস্তু নয়। অদ্বৈতবেদান্তের এটাই স্থিরসিদ্ধান্ত। আচার্য শংকর বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে মোক্ষ বা মুক্তিকে বলেছেন 'ব্রহ্মভাব'—"ব্রহ্মভাবস্তু মোক্ষঃ"।[১] সুতরাং মুক্তিতে কোন ক্রিয়ার স্থান নেই, কেননা ক্রিয়া বলতে বুঝায়—যে-ব্যাপার কোন পুরুষের (লোকের) দ্বারা সম্পন্ন হয়; তাতে ক্রিয়া করা বা না-করা বিষয়ে পুরুষের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে;[২] কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ মুক্তিতে কারো কর্তৃত্ব থাকে না, তা পুরুষ-নিরপেক্ষ, স্বয়ংপ্রকাশ, আপনা-আপনিই প্রকাশিত হয়। আকাশে মেঘমুক্ত সূর্য যেমন মেঘাপসারণের পর নূতন একটি সৃষ্টবস্তু-রূপে প্রতিভাত হয় না, পূর্বে থেকে তার অস্তিত্ব আকাশে ছিলই, মেঘের আবরণের জন্যেই কেবল সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল না, আর তারি জন্যে আমরা ভ্রমবশতঃ বলি যে, আকাশে সূর্য নাই, কিন্তু মেঘ-রূপ আবরণ বা আচ্ছাদন সরে গেলে পূর্বের মতন সূর্য স্বতঃই আকাশে প্রকাশ পায়, তেমনি ভ্রম-রূপ মিথ্যাপ্রত্যয় বা অজ্ঞানের জন্যে ব্রহ্মের স্বভাবত স্বচ্ছ প্রকাশমান স্বরূপকে জানতে পারি না, অজ্ঞান সরে গেলে তার চিরদেদীপ্যমান প্রকাশকে আমরা উপলব্ধি করি। সুতরাং অজ্ঞানকে সরানোই সাধনার সার্থকতা, ব্রহ্মস্বরূপকে প্রকাশ করা নয়। আচার্য শংকর ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ মোক্ষ বা মুক্তিকে তাই 'বস্তুতন্ত্র' বলেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশে ক্রিয়া বা সাধনার কোন উপযোগিতা নেই, অজ্ঞান-আবরণ অপসারিত হোলে আপনা-আপনিই তা প্রকাশিত হয়। শংকর উল্লেখ করেছেন: "প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রৈবেতি জ্ঞানমেবেতন্ন ক্রিয়া"।[৩] ব্রহ্ম 'বস্তুতন্ত্র' বলতে ব্রহ্মের প্রকাশ ক্রিয়া-নিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং সেখানে প্রশ্ন হোতে পারে, তাহোলে মুক্তি বা মোক্ষের জন্যে সাধনা-রূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? সূর্যের প্রকাশের জন্যে যেমন মেঘকে অপসারণমাত্রই প্রয়োজন, তেমনি চিরজ্যোতিষ্মান ব্রহ্মসূর্যের প্রকাশের জন্যে কেবল অজ্ঞানকে দূর করাই দরকার। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে কোন জিনিস দেখার জন্যে যেমন আলো জ্বালারই আবশ্যকতা, তেমনি ভ্রম-রূপ অন্ধকারকে সরাবার জন্যে বিবেক-

১। বেদান্তসূত্র ১।১।৪ (বোম্বে সংস্করণ, ১৯৩৮, পৃঃ ১২৮)।

২। "ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ।"—বেদান্তসূত্রভাষ্য ১।১।৪

৩। বেদান্তদর্শন ১।১।৪ (বোম্বে সংস্করণ, ১৯৩৮, পৃঃ ১২৯)।

বিচারের প্রদীপ জ্বালার প্রয়োজন। প্রদীপ জ্বালার উপযোগিতা অন্ধকারকে দূর করার জন্যে, ঘরে যে জিনিস আছে তাকে আবার নূতন কোরে সৃষ্টি করার জন্যে নয়। সেরকম অধ্যাত্ম-সাধনার প্রয়োজন অজ্ঞানতা, মোহ, আত্মবিস্মৃতি বা মায়াকে দূর করার নিমিত্ত; সাধনভজন, উপাসনা এসবের উপকারীতা কেবল পবিত্র আত্মার নিরাবরণ রূপকে দেখার বা উপলব্ধি করার জন্যে। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতি কোনদিনই উৎপন্ন বা সাধ্যবস্তু হিসাবে বুঝায় না, কেননা উৎপন্ন জিনিসমাত্রেরই বিকার ও নাশ আছে। তাছাড়া লাভ করার বস্তুমাত্রই লাভ যিনি করেন সেই ব্যক্তি থেকে ভিন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্মানুভূতির কোন-কিছু বিকার বা নাশ নেই, তা সকল সময়েই আবিভাজ্য, অখণ্ড ও এক, এবং সাধক থেকে তা চিরদিনই অভিন্ন। সুতরাং ঈশ্বরলাভ, অনুভূতি লাভ—এসব ভাষা সাধারণভাবেই লোকে ব্যবহার করে। যেমন, গলায় সোনার হার আছে অথচ ভুলের বশে মানুষ হয়তো তার জন্যে খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু ভুল ভেঙে গেলে সে দেখে যে, হার তার গলায় আগে থেকেই ছিল, তখনো আছে, আর তা মোটেই নূতন হার নয়। সেরকম মানুষ স্বরূপত শুদ্ধচৈতন্য, ভ্রমে বা মোহেই সে কেবল নিজেকে কল্পনা করে মৃত্যুশীল মানুষ বোলে। বিবেক ও বিচারের আলোকে যখন মানুষের সংস্কার-রূপ ভুল ভেঙে যায় তখনি বুঝতে পারে যে, চিরকালই সে পবিত্র ও জ্ঞানস্বভাব, বিকার ও নাশ তার কোনকালে নেই। এই ভুলভাঙার নামই অজ্ঞাননাশ। অজ্ঞানের নাশ ও ব্রহ্মানুভূতির প্রকাশ একই কথা। এই নাশের ও প্রকাশের মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান বিন্দুমাত্রও নেই, অজ্ঞানের নাশই জ্ঞানের প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতি কোন ক্রিয়া নয়, তা প্রত্যক্ষ বস্তু বা চৈতন্য। সাধনা অনুভূতির প্রতিবন্ধকটিকে মাত্র সরিয়ে দেয় ও প্রকাশের সাহায্য করে। সাধনা চিত্তকে নির্মল কোরে তাকে সদসদ্‌বিচারের উপযোগী করে, তাই সাধনাকে গৌণভাবে মুক্তির বা অনুভূতির কারণ বলা হয়।

মুক্তির রাজ্যে কিভাবে পৌছানো যায় ও তার সাধনই বা কি?—এ'প্রশ্নের অবতারণা কোরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "বেদান্তের মতে, পরিপূর্ণ নির্বাসনা-রূপ শান্তির অবস্থায়ই আত্মানুভূতি লাভ করা যায়। একথা হয়তো আমাদের কাণে অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু এ'এমন-কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। শান্তি (silence) বল্‌তে বাইরে থেকে কোন ধার করা জিনিস নয়, মানুষের মনের বা চিত্তেরই তা অচঞ্চল স্থির অবস্থা। মনের সত্যিকারের নিস্তরঙ্গ শান্ত ভাব শুদ্ধচৈতন্যেরই স্বরূপ, তা কোনদিন কখনো ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা বা পার্থিব কোন জিনিসের প্রলোভনের দ্বারা পঙ্কিল হয় না। মনের ঠিক এই অবস্থা হোলে ঈশ্বরানুভূতির পরিপূর্ণ আশীর্বাদ মানুষের ওপর বর্ষিত হয়"।[৪]

জার্মাণ মরমী একহার্ট (Eckhart) বলেছেন: "প্রেমস্বরূপ ভগবানের মৌনবাণী পৌছাবার বা তাঁর দিব্যোজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হোয়ে ঈশ্বরীয় ভাবে রূপান্তরিত করার আগে মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ হওয়া চাই। উদ্দাম বাসনা যখন শান্ত হয়, পার্থিব ভোগসুখের কামনা যখন চিরনিবৃত্ত হয়, তখনি ঈশ্বরের অমৃতবাণী মানুষ শুনতে পায়"।

৪। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃ: ১৭৬—১৭৭

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে থাকে সহস্র সহস্র ভোগের বাসনা; চলমান স্রোতধারার মতন সে যায় ভেসে, অগণিত দুঃখ-যন্ত্রনার তরঙ্গ তাকে করে উদ্বেলিত, তাই জ্ঞানচক্ষু তার হয় অন্ধ, সত্যানুসন্ধানের পথ হয় অবরুদ্ধ, বেদনাশ্রুভরা আকাঙ্ক্ষার জগতেই সে মরে ঘুরে, আর শান্তি চায় সে তখনি, কিন্তু অশান্তির কষাঘাতে সে-চাওয়ার মধ্যে থাকে না তীব্রতা, অথচ চাওয়ার অফুরন্ত প্রেরণায় সাধনার প্রয়োজন হয় ঠিক তখনই।

সাধনার প্রয়োজনীয়তা যখন মনে জাগে তখনি বুঝ্‌তে হবে মানুষ হয়েছে বিদ্রোহী, অতৃপ্তি এসেছে তার গতানুগতিক ভোগের বাসনায়, বিবেকের কষাঘাত পড়েছে তার নির্যাতিত মনের ওপর। ঠিক তখনি সে ফিরে তাকায় পার্থিব ও অপার্থিব এই দুটি জগতের দিকে: পার্থিব দেয় প্রলোভন, আর বিবেক শোনায় তাকে অমৃতের বাণী ও অপার্থিবের মাধুর্য জানায় প্রীতির সম্ভাষণ, সুতরাং এগিয়ে চলার মন্ত্রই জোগায় তখন তার প্রাণে প্রেরণা। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, এটিই হোল ঠিক মানুষের সাধকের অবস্থা। সাধনার অবস্থায় 'সাধক করবে পার্থিব ভোগসুখ ও সকল মায়ার আকর্ষণ থেকে নিজের মনকে সংযত, শিশুর সারল্য নিয়ে ভগবানের কাছে জানাবে আবেদন তার শূন্য হৃদয়-মন্দিরকে মহিমোজ্জ্বল করার জন্যে। * * * যত তীব্র হবে তার বাসনা ভগবানকে লাভের জন্যে, ততশীঘ্র এসে দেবেন তিনি ধরা, সুতরাং ভগবানের সাথে মিলনের বাসনাকেই আমাদের মধ্যে কোরে তুলতে হবে নিবিড়, তবেই বিবেক-রূপ অন্তরাত্মা হবেন জাগ্রত'।[৫]

বিবেককে প্রদীপ্ত করাই হোল অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম সোপান। গাঢ় মায়ানিদ্রা থেকে আমাদের জাগ্রত হোতে হবে, কারণ সাধারণত মায়ার কোলেই আমরা থাকি নিদ্রিত। জীবাত্মার প্রথম এই জাগরণকে সংস্কৃত ভাষায় বলে 'প্রতিভার উদ্বোধন'। প্রতিভার এই জাগরণ হোলে আমরা জানতে পারি যে, কিভাবে জৈবপ্রকৃতি আমাদের করে নিয়ন্ত্রিত ও কোথায় যায় নিয়ে ও তারপর আমরাই বা যাই কোথায় ও কি করি, এবং এ' সকল ঘটনার রহস্যই বা কি। তখনি মানুষের নৈতিক ও ধর্মজীবনের হয় সূচনা এবং সাধনশীল মানুষ করে সকল দোষ-ত্রুটীর সংশোধন এবং তার আন্তর প্রকৃতি হয় ঠিকঠিকভাবে পবিত্র।[৬]

সাধনার দ্বিতীয় সোপান—চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি তখনি সম্ভব হয় যখন আমাদের নিম্নস্তরের পশুপ্রবৃত্তিগুলি হয় সংযত ও তাদের আমরা করি সম্পূর্ণভাবে জয় বা অভিভূত। চিত্তশুদ্ধির জন্যে তাই চার রকম প্রণালীর আবশ্যক হয়। আত্মসংযম এসকলের প্রথম। আত্মসংযম বলতে মনের বৃত্তিগুলিকে দমন করা বুঝায়। মনকে দমন বা বশীভূত করার অর্থই মনের ওপর কর্তৃত্ব করা। * * * দ্বিতীয় প্রণালী—সত্যপরায়ণতা, কেননা সত্যস্বরূপ ভগবানকে মিথ্যা দ্বারা কখনো লাভ করা যায় না। সত্যপরায়ণতার সাধনায় প্রথম কর্তব্য হবে—আমাদের নিজেদের জীবনকে সত্যনিষ্ঠ করা, তারপর প্রতিবেশীর, পরে মানবতার ও পরিশেষে ঈশ্বরের প্রতি সত্যপরায়ণ হওয়া। তৃতীয়, সকল প্রাণীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা। চতুর্থ, স্বার্থশূন্য হোয়ে সংসারে কর্ম করা। এই চারটি প্রণালী চিত্তশুদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য উপায়।[৭]

৫। ঐ, পৃঃ ১৭৮; ৬। ঐ, পৃঃ ১৭৮—১৭৯; ৭। ঐ, পৃঃ ১৭৯।

সাধনার তৃতীয় সোপান—বিবেক ও বিচারের অভ্যাস। জড় ও চৈতন্যের, নিত্য ও অনিত্যের, সত্য ও অসত্যের বিচারপ্রণালী আত্মানুভূতির পথকে সুগম করে। সাধারণতঃ আমরা অনিত্যকে নিত্য, জড়কে চৈতন্য ও চৈতন্যকে জড় বোলে ভুল করি, উভয়ের সত্যিকারের পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে। সদসদ্‌বিচার সত্যনির্ধারণের উপায়কে সাহায্য করে। বিচারের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, জড়রাজ্যের পরিধি কতটুকু ও জড়ের পারে চৈতন্যের পূর্ণপ্রকাশ কোথায়? বিবেক-বিচারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের সকল জিনিসের যথার্থজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারি।[৮]

সাধনার চতুর্থ সোপান—অনাসক্তি। এই অনাসক্তির ভাব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোলে তবেই এই জ্ঞান আসে যে, যা নিজের নয় তা কখনই আমাদের আকৃষ্ট করতে ও চিরদিন আয়ত্তে থাকতে পারে না। আমরা অমৃতের সন্তান, আসক্তি-রূপ অজ্ঞান নিঃশেষে দূরীভূত হোলে তবেই চিত্ত আমাদের সুনির্মল হয়।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সাধনার পঞ্চম সোপান—অধ্যাত্মজ্ঞানের বিকাশ। এই অবস্থায় জ্ঞানসূর্যের আলোক অন্তঃকরণকে সমুজ্জ্বল করে, আর তখনি ঠিকঠিক বুঝি যে, আমরা কোনদিনই মৃত্যুময় পৃথিবীর প্রজা নই, পৃথিবীতে বাসস্থান আমাদের চিরস্থায়ী নয়, পার্থিব সম্পর্ক ক্ষণিক, আমরা কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ নই, স্থূলপঞ্চভূতের শরীর সূক্ষ্মশরীরের আবরণ মাত্র। আবরণ অনিত্য, তাই এ'সকলকে আমাদের ছেড়ে যেতে হবে। আর তখনি আমরা উপলব্ধি করি যে, শরীরের চেয়ে আত্মা অতীব প্রাচীন, শরীরের মৃত্যুতে আত্মা কোনদিনই মরে না, আত্মার বিকার বা পরিবর্তন নাই, জন্ম ও মৃত্যু শরীরের, আত্মা এ'সকলের পারে।[৯]

সাধনার ষষ্ঠ সোপানে আমরা দিব্যানুভূতির পরমাবস্থা লাভ করি। এই দিব্য-অবস্থায় ব্রহ্মের সাথে আমাদের সকল ভেদের অবসান হয়। সাগরসঙ্গমে নদীপ্রবাহ যেমন উদ্দামগতিতে ছুটতে ছুটতে ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করে ও সমুদ্রের অনন্ত জলরাশিতে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিসর্জন দেয়, তেমনি সাধনার এই ভূমিতে ভাগ্যবান সাধক ব্রহ্মানন্দসাগরে নিজের পৃথক সত্তাকে চিরদিনের জন্যে বিলিয়ে দেন,[১০] তাঁর

৮। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিটিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস রিলিজিয়ন পৃঃ ১৭৯—১৮০,

৯। ঐ, পৃঃ ১৮০

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন: "This we can do by winning mastery over self, by rising above all pride and greed and fear, by knowing that worldly losses and physical death can take nothing away from the truth and the greatness of our soul."—'সাধনা' (১৯৪৭), পৃঃ ৩০

১০। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "And the man, whose inner vision is bathed in an illumination of his consciousness, at once realises the spiritual unity reigning supreme over all differences of race and his mind no longer awkwardly stumbles over individual facts of separateness in the human

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একাকারে পরিণত হয়, কালের মায়িক আবরণ তখন আর কিছু থাকে না। সাধনার সপ্তম ও চরমভূমিতে আরোহণ কোরে আত্মতৃপ্ত সাধক নিজের ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন। তখন ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। এই জীবনেই মানুষ অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হোতে পারেন এবং জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ কোরে শরীরপাতের পূর্বমুহূর্ত-পর্যন্ত জগদ্ধিতায় বিশ্বের কল্যাণকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

'বেদান্তের ধর্ম' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, সার্বভৌমিক বেদান্ত-ধর্মের যেমন অনেকগুলি রূপ আছে: দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি,[১১] তেমনি সাধনার রূপভেদ হিসাবে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগও আছে।[১২] 'বাদ' বলতে বুঝায় মানুষের ধর্ম বা অধ্যাত্মবিশ্বাস। বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের চিন্তা ও কর্ম (সাধনপ্রণালী) পৃথক পৃথক হয়। সাধারণত এই সাধনাগুলিকে পরস্পর-বিরোধী বা আলাদা বোলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এরা এক ব্রহ্মানুভূতিরই ভিন্ন ভিন্ন পথ বা উপায়। অথবা বলা যায় যে, এরা একেবারে আলাদা নয়, পরস্পরের মধ্যে বেশ একটি যোগসূত্র আছে, কিন্তু তাই বোলে একটি অপরের ঠিক আপেক্ষিক নয়। তিনি লিখেছেন: "Therefore, Vedanta teaches that dualism, qualified non-dualism, and monism, are the different stages in the process of realisation of that Absolute and its relation to us."[১৩] মহিম্নস্তোত্রেও "বৈচিত্র্যাদৃজু * * নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" শ্লোকটিতে সকলের মধ্যে ঐ অভিন্ন ভাবেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর "হাউ টু বি এ যোগী" বইয়ে 'যোগ' শব্দের অর্থ করেছেন বিচিত্রভাবে।[১৪] তবে যোগের বাস্তব অর্থ হোল 'path by which one can attain to the goal' (লক্ষ্যে পৌছাবার পথ)।[১৫] যোগ-রূপ পথের মাধ্যমে যিনি অসত্য থেকে সত্যকে, অনিত্য থেকে নিত্যকে, জড় থেকে চৈতন্যকে বিবেক বা আলাদা কোরে নিত্য, সত্য ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন তিনিই 'যোগী'। যোগপথে চরমাবস্থার নাম সমাধি, জ্ঞানপথে একে বলা হয় নিদিধ্যাসন।

যোগপথে মন তথা মনোবৃত্তিকে নিরোধ (দমন) করাই উদ্দেশ্য। পতঞ্জলি যোগদর্শনে মনোবৃত্তিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও

world, accepting them as final, he realises that peace is in the inner harmony which dwells in truth, * * ."—'কনটেম্পোরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (অধ্যাপক মুরহেড ও রাধাকৃষ্ণন্ সংপাদিত, ১৯৩৬), পৃঃ ৩৪

১১। অভেদানন্দ: 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ৮৫

১২। ঐ, পৃঃ ৮৭—৮৮

১৩। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেশান্ টু দি এ্যাব্সোলিউট' (১৯৪৬), পৃঃ ১৯৭

১৪। অভেদানন্দ: "হাউ টু বি এ যোগী' (১৯৪৩), পৃঃ ২৮—২৯

১৫। অভেদানন্দ: "এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন', পৃঃ ৮৭

নিরুদ্ধ।[১৬] স্বামী অভেদানন্দ যে চারটি যোগের কথা বলেছেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্য মুক্তি বা আত্মজ্ঞান দান করা।

কর্মযোগ বলতে বুঝায় কর্ম-রূপ সাধন, অর্থাৎ কর্মই সাধন। 'কৃ' ধাতু থেকে কর্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যেকোন কর্ম, শারীরিকই হোক আর মানসিকই হোক সমস্তই কর্ম এবং প্রত্যেক কর্ম থেকে যে ফল উৎপন্ন হয় তাও কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গৌণ-ভাবে দেখা যায় যে, কোন একটি কাজ একই সময়ে কার্য ও কারণ দুইই, সুতরাং কার্য ও কারণ দুটিকেই কর্ম বলা যায়। ব্যাপকভাবে গতি, আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ এবং চলা, কথা কওয়া, দেখা, শোনা, চিন্তা করা, ইচ্ছা বা কামনা করা এসবই কর্ম। মোটকথা যে সকল কাজ শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে সম্পন্ন হয় সে সকল কর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[১৭] শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কর্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, এই সব কর্ম; তাঁর নাম-গুণকীর্তনও কর্ম; আবার দান যজ্ঞ এসবও কর্ম।"[১৮] কর্ম প্রধানত তিন রকম: ভাল, মন্দ ও মিশ্র। (১) যে কাজ আমাদের স্বার্থের অনুকূল ও কোন এক অবস্থায় উপকার সাধন করে তাই ভাল বা সৎকাজ; (২) যে কাজ আমাদের অনিষ্ট সাধন করে তা মন্দ বা অসৎ কাজ, এবং (৩) যে কাজে উপকার ও অনিষ্ট দু'রকমই সাধিত হয় তাই মিশ্রকাজ। এছাড়া সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মান ও আগামী-ভেদে কর্ম আবার চার রকম। এদের ভেতর প্রারব্ধকর্মের ফল ভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়।[১৯] দেশ-কালবিশিষ্ট আপেক্ষিক জগতে ধূম ছাড়া যেমন আগুন থাকে না, ফল ছাড়াও তেমনি কোন কাজ থাকে না; কর্ম যে-কোন রকমেরই হোক ফল উৎপন্ন করে।[২০] কর্মযোগের উদ্দেশ্য—ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে নিরাসক্তভাবে ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কাজ করা। নিরাসক্ত কর্মে চিত্ত নির্মল হয় এবং নির্মল ও স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে আত্মার নিরাবরণ রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

কর্তব্যবুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে স্বামী অভেদানন্দ নিষেধ করেছেন, কেননা সকলের পক্ষে কর্তব্যের কোন নির্দিষ্ট মাপকাটি নেই, কাজেই তা আপেক্ষিক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে যেমন কর্তব্যের পরিবর্তন হয়, মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তনে তেমনি কর্তব্যবোধেরও পরিবর্তন দেখা যায়। তাছাড়া একজনের পক্ষে যা কর্তব্য বোলে মনে হয়, অপরের পক্ষে হয়তো তা বিপরীত। সুতরাং বাস্তবদৃষ্টির দিক থেকে সত্যিকারের কর্তব্য বোলে কোন জিনিস জগতে থাকতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক কাজ বিশেষে যে অপরিহার্য করণীয় বোধ বা বুদ্ধি আমাদের আবদ্ধ করে তাকেই আমরা বলি 'কর্তব্য'। করণীয় বুদ্ধি বা কর্তব্য মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যবধানে একটি বন্ধন সৃষ্টি করে। তাই বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে ভালবাসার ভাব নিয়ে কাজ করা উচিত এবং এ'ধরণের কাজই কাঁটা দিয়ে

১৬। অভেদানন্দ; 'স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট', পৃঃ ৪৫-৪৬
১৭। অভেদানন্দ: 'ডক্‌ট্রিন্ অব্ কর্ম' (১৯৪৭), পৃঃ ৭
১৮। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১৪শ সংস্করণ), ১ম ভাগ, পৃঃ ২০১
১৯। অভেদানন্দ: 'ডক্‌ট্রিন্ অব কর্ম', পৃঃ ৩৮
২০। ঐ, পৃঃ ৯-১০

কাঁটা তোলার মতন শুধু আমাদের কর্মবন্ধন কেন—সকল বন্ধনই ছিন্ন করে।[২১] সুতরাং কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়। স্বামী অভেদানন্দ তাই উল্লেখ করেছেন,

"Love must be higher than duty, and where there is love, there can be no thought of duty. * * When the feeling of love towards every living creatures comes to anyone, that person is free from all duties, from all bondage, from all attachment to his physical nature. * * Even who do their duty with the hope of return, cease to think of results when they begin to be actuated by love; and all work performed through this higher motive of love takes the form of acts of worship of the supreme Spirit."[২২]

স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও তাই। তিনি বলেছেন যে, সত্যিকারের প্রেম না থাকলে কর্তব্যবোধও তিক্ত হোয়ে ওঠে।[২৩]

কর্মযোগ-রূপ সাধনা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, কর্মই যোগ। নিষ্কামভাবে কাজ করলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম পূজার ভাবে উদ্দীপিত হয়। ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে জীবনে কাজের প্রয়োজন হয়, নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে নয়। ঈশ্বরার্পিতবুদ্ধি নিয়ে কাজ করা উচিত, আর এটিই কর্মের কৌশল ও রহস্য। সংসারে কাজ যখন সকলকে করতেই হয়, কাজ যখন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, তখন সমাজের কল্যাণের জন্যে প্রত্যেকের কাজ করা উচিত, তাহোলেই কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা সকল কাজের পারে যেতে সক্ষম হব।[২৪] অনেকের ধারণা যে, শুধু কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও ভগবান লাভ হয় না, তার জন্যে দরকার ধ্যান ও পূজা-অর্চনা প্রভৃতির। কিন্তু একথা ঠিক নয়, কেননা একমাত্র নিষ্কামকর্মের দ্বারাই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে বিচার সকল পথেই দরকার,—কি জ্ঞানযোগ, কি রাজযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্মযোগ।

২১। "The particular duty of individuals, however, will vary according to the nature and circumstances of each one; *for there can be no absolute standard of duty for all, since duty is in its essence relative.* * * *There is no such thing as duty in an objective sense*; we cannot get it from outside. * * The feeling which binds us to these special acts of body and mind is the sense of duty. Duty creates a kind of bondage between the individual and his environment."—অভেদানন্দ: 'ডক্‌ট্রিন্ অব কর্ম', পৃঃ ১০৭—১১০

২২। ঐ, পৃঃ ১১৭-১১৯

২৩। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "Duty is seldom sweet. It is only when love greases its wheels that it runs smoothly; it is a continuous friction otherwise. * * Duty is sweet only through love, and love shines in freedom alone."—'কমৃপ্লিট ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম ভাগ, ১৯৩১), পৃঃ ৬৫

২৪। অভেদানন্দ: (ক) 'এ্যাটিচিউড অব বেদান্ত টুওয়ার্ডস্ রিলিজিয়ন,' পৃঃ ৮৭; (খ) 'হাউ টু বি এ যোগী' (১৯৪৩), পৃঃ ৯৩—৯৪

প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করার পথ বা প্রণালীকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তি গৌণী ও পরা-ভেদে দু'রকম। গৌণীভক্তির সাধনা প্রবর্তকদের জন্যে। ভক্তির চরমপ্রকাশই পরা; পরাভক্তির সাধনায় অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়।[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কিন্তু ভক্তি অম্‌নি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হ'লে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের ওপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না। আর এক রকম ভক্তি আছে, তার নাম বৈধীভক্তি। এতো জপ করতে হবে, এতো উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা করতে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এসব বৈধীভক্তি। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে, কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোলআনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে"।[২৬] শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরো বলেছেন যে, কলিতে 'নারদীয়া ভক্তি,'—জ্ঞাননিষ্ঠা ভক্তি। ভক্তির সাথে জ্ঞানবিচার থাকবে, তবেই তা পাকা হয়, নচেৎ অন্ধবিশ্বাসের মতন ভক্তিও অন্ধ বা গতানুগতিক হয়। মোটকথা ভক্তিযোগের সাধনে হৃদয়ের অনুরাগ কিভাবে পরম-প্রেমস্বরূপ ভগবানকে আশ্রয় করে, মানবীয় ভালবাসা কিরূপে ঈশ্বরীয় প্রেমে রূপান্বিত হয়, সেই গূঢ়রহস্যই সাধকের কাছে প্রকাশিত হয়।

মানবীয় ভালবাসার পরিধি সংকীর্ণ, কেননা জড় ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই তার একমাত্র কাম্য। পার্থিব ভালবাসায় স্বার্থ মেশানো থাকে, দান-প্রতিদান-রূপ দেওয়া-নেওয়ার হিসাব থাকে। একথা সত্যি যে, আত্মার প্রতি আত্মার দিব্য-আকর্ষণ ও আসক্তির নামই যথার্থ ভালবাসা। ভালবাসার মধ্যে থাকে একত্বানুভূতি, সমবেদনা ও অন্তর-বিনিময়ের ভাব। কিন্তু এসবও সীমাবদ্ধ পৃথিবীর পরিধির মধ্যে, স্বার্থের সীমানাকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। মা যে ছেলেকে ভালবাসে ও স্নেহ করে, পতি ও পত্নী উভয়ে উভয়কে যে ভালবাসে, এসমস্তের ভিতরেও প্রতিদান পাবার আশা লুকানো থাকে, এরা স্বার্থমিশ্রিত, সুতরাং পবিত্র নয়। নিঃস্বার্থভাবে আত্মদৃষ্টিতে যে প্রেম ও ভালবাসা তাই স্বর্গীয় ও পবিত্র। যেমন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন: "স হোবাচ, ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। * * ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায়ঃ সর্বং প্রিয়ং ভবতি।"[২৭] পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত এবং সংসারের সমস্তই মানুষের প্রিয় হয় এজন্যে যে, আত্মা চৈতন্য ও অন্তর্যামীরূপে বিশ্বচরাচরের অন্তরে সর্বদা

২৫। অভেদানন্দ: 'হাউ টু বি এ যোগী' (১৯৫৩), পৃঃ ১০৪

২৬। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১৪শ সং), ১মভাগ, পৃঃ ৯৩

২৭। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৫।৬

বিরাজিত থাকেন। মানুষ স্বরূপত আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপই, ভ্রমবশতই সে জড়শরীরে আমিত্ব আরোপ ও তার অভিমান করে। কিন্তু তার মনের অবচেতন স্তরে ব্রহ্মস্বভাবের স্মৃতি লুকানো থাকে, তাই পার্থিব ভালবাসার পিছনে থাকে তার সেই শুদ্ধ আত্মচৈতন্যের প্রতি প্রীতি ও আকর্ষণ; অজ্ঞাতসারে শুদ্ধাত্মার প্রতি স্বর্গীয় ভালবাসাই তাই অজ্ঞানের জগতে স্বার্থমেশানো ভালবাসার আকারে প্রকাশ পায়। ভক্তিযোগের সাধনে মানুষের ভ্রম দূর হোলে সে জানতে পারে যে, সকল-কিছু অনুরাগ ও ভালবাসার উৎস সেই এক ও অদ্বিতীয় প্রেমঘনমূর্তি আত্মচৈতন্য।[২৮]

শুধু ভক্তিযোগে কেন, সকল রকম সাধনাতেই স্বামী অভেদানন্দ বিশ্বাসকে অধ্যাত্ম জীবনের একান্ত সহায় বোলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "Spiritual life begins with faith while doubt is the sign of spiritual death."[২৯] বিশ্বাস বলতে অনেকে বিচার ও পার্থিব জ্ঞানকে বুঝেন, কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, বিশ্বাস জ্ঞান বা বিচারের চেয়ে অনেক বড়। বিশ্বাস কোন অলৌকিক শক্তি বা কুসংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, অন্ধবিশ্বাসই বরং এ'সকলের অধীন। অন্ধবিশ্বাস অজ্ঞান থেকে সৃষ্টি হয়, সুতরাং তার দ্বারা জীবনের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

বিশ্বাসকে অনেকে বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে চান, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাসও (scientific faith) আপেক্ষিক, কারণ তারও অবস্থাবিশেষে পরিবর্তন দেখা যায়; কিন্তু সত্যিকারের বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয় না, চিরদিনই তা অবিকৃত ও একরকম থাকে। আসল বিশ্বাসের রূপ যথার্থজ্ঞান (right knowledge), অথবা বলা যায় বিশ্বাস ও সত্যজ্ঞান একই সাথে আসে ('True faith and true knowledge come simultaneously')। সত্যজ্ঞান বলতে বুঝায়—কোন জিনিসের যথার্থ রূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। বিশ্বসংসারে অবিচল শাশ্বত সত্য একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্য; সত্যিকারের বিশ্বাস চৈতন্যরূপী ভগবান সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান এনে দেয়। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন: "Therefore true faith in God involves right knowledge or realization of God and, conversely, knowledge of Self produces true faith in one's real nature or Self or *Atman*"।[৩০] মোটকথা ভগবদ্দর্শন বা আত্মজ্ঞান না-হওয়া পর্যন্ত কোনদিনই যথার্থ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আসতে পারে না। যথার্থ বিশ্বাসে দেশ, কাল, ও নিমিত্ত-রূপ বন্ধনের কোন বালাই নেই। যথার্থ বিশ্বাসের প্রথম নিদর্শন শ্রদ্ধার বিকাশ। শ্রদ্ধা বলতে বুঝায় ঐকান্তিক ও সরল সত্যগ্রাহী মনোবৃত্তি। সত্যানুসন্ধিৎসু মনই ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞানের দিক্‌দর্শন কোরে সাধককে দিব্যচেতনার আলোকে কৃতকৃতার্থ করে।[৩১]

২৮। অভেদানন্দ: (১) 'হিউম্যান এ্যাফেক্‌সন এ্যাণ্ড ডিভাইন লভ্' (১৯৪৫); (২) 'পাথ অব রিয়ালিজেসন' বইয়ে 'স্যালভেসন থ্রু লভ্' আলোচনা পৃঃ ১৬৬—১৭২

২৯। অভেদানন্দ: 'পাথ অব রিয়ালিজেসন' (১৯৪৬), পৃঃ ৪৬

৩০। ঐ, 'পাথ অব রিয়ালিজেসন', পৃঃ ৪৭—৪৮

৩১। "It is that earnest and unbiased attitude of mind which is receptive

ভক্তিযোগের আর একটি অঙ্গ 'প্রার্থনা' (prayer)। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সকল রকম সাধারণ প্রার্থনার সাথে জড়িত থাকে কোন-না-কোন ধর্মানুষ্ঠানের, আচার-বিচারের বা ধর্মশাস্ত্রের ওপর একান্ত বিশ্বাস। আমরা সর্বদাই প্রার্থনা করি কোন দেবতা, অলৌকিক দৈবশক্তি অথবা সাকার ভগবানের উদ্দেশ্যে। বিপদ-আপদের ও দুঃখ-কষ্টের সময়ই এই ধরণের প্রার্থনা রূপায়িত হয় ঐ সমস্ত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করার ভয়ে অথবা আহার, নিদ্রা ও ভোগের সময় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাবার জন্যেও মানুষ প্রার্থনা করে; তাই ঐ'সকল প্রার্থনার মধ্যে স্বার্থ জড়িত থাকে।[৩] অবশ্য সকল প্রার্থনার পিছনে থাকে ইচ্ছা বা বাসনা। তবে ইচ্ছা বা বাসনা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূলে হোলে প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়। সত্যিকারের প্রার্থনায় মনের মলিনতা হয় পরিশুদ্ধ, চলার পথ হয় স্বচ্ছল, জীবনের চরম-আদর্শ হয় সুপরিস্ফুট। আন্তরিক প্রার্থনায় জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। শুধুই বাচনিক ও গতানুগতিক প্রার্থনা বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে অকিঞ্চিৎকর; অনুরাগপূর্ণ আন্তরিক প্রার্থনাই ভগবানের সাথে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করে। ভক্তিযোগে প্রার্থনা তাই সাধকের পক্ষে বিশ্বাতীত পরমসত্যের রাজ্যে উপনীত হবার সোপানস্বরূপ;[৩৩] ভক্তিপথ সকল সাধকের পক্ষে তাই সুগম ও সহজ। প্রেম ও অনুরাগ যেন ভক্তিসাধনার দুটি পাখা, সাধকরূপী বিহঙ্গ এদের সাহায্যেই শরীরপিঞ্জর থেকে অনায়াসে উড়ে যায় অসীম চৈতন্যের আকাশে ও উপভোগ করে সমাধির অফুরন্ত আনন্দ।[৩৪]

রাজযোগ ধ্যান ও ধারণার সাধনপথ। রাজযোগকে 'ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Science of Applied Psychology) বলা যায়। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আওয়ার রিলেসান্ টু দি এ্যাব্‌সোলিউট' বইয়ে রাজযোগকে 'ট্রু সাইকোলজি' বলেছেন।[৩৫] সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ বোলে এই যোগকে রাজ'-যোগ বলা হয়। যেমন তিনি বলেছেন: "This path is called Râja Yoga or the royal method (*Râja* means

of Truth and which leads the searching mind step by step into the realm of the Unknown and ultimately ends in the realization of the Unknown."—অভেদানন্দ: 'পাথ অব রিয়ালিজেসন' (১৯৪৬); পৃ ৫৮

৩২। অভেদানন্দ: 'পাথ্ অব রিয়ালিজেসন্', পৃঃ ১০৩, ১০৭, ১০৮-১০৯

৩৩। ঐ, পৃঃ ১২৪-১২৫

৩৪। "Bhakti Yoga, or the path of love and devotion, is the easiest of all. Love and devotion are like the two wings by which the bird of the human soul flies out of the cage of the physical body and soars high in the spiritual atmosphere of the Infinite Being and enjoys ecstatic happiness."—'পাথ্ অব রিয়ালিজেসন্', পৃঃ ১৪১

৩৫। অভেদানন্দ: (ক) 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট' (১৯৪৬), পৃঃ ১-১৮, (খ) 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপল্' (১৯৪৭) বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন: "True Psychology you will find today in the Yoga system of Patanjali."

king) because the power of concentration and will-power are not only greater than any physical force, but are essential to the acquisition of all other powers."[৩৬] রাজযোগের প্রধান উদ্দেশ্য ইচ্ছা ও ধারণা-শক্তিকে বিকশিত ও সুদৃঢ় করা এবং ধারণা ও ধ্যানের ভিতর দিয়ে সত্যানুসন্ধিৎসু সাধককে সকল ধর্মের চরমলক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।[৩৭] এই যোগপথের সহায়তা নিয়েছেন বিশ্বের সকল দেশের সকল দার্শনিক, যেমন পাইথাগোরাস, প্লেটো, নব্যপ্লেটোবাদী প্লটিনাস ও প্রোক্লাস, মধ্যযুগের নষ্টিক্‌স্‌ ও খৃষ্টান নষ্টিক্‌স্‌ ও মরমীরা, এমন কি মধ্যযুগীয় রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা, এবং আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে স্পিনোজা, কাণ্ট, সোপেনহাওয়ার, ইমার্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা।

ঋষি পতঞ্জলি সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য এই চারটি পর্যায়ে রাজযোগের সকল-কিছু সাধনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বিভূতির বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই বলেছেন যোগ,[৩৮] কেননা নিরোধের অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, নচেৎ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে একীভূত থাকায় মানুষের পক্ষে আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না।[৩৯] রাজযোগে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটিকে সাধারণভাবে যোগাঙ্গ বলা হয়।[৪০] যম ও নিয়ম মানুষের নৈতিক প্রকৃতিকে সংযত ও সুসম্বদ্ধ করে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, প্রত্যেক প্রবর্তক সাধকেরই (প্রথম শিক্ষার্থীর) মনে রাখা উচিত যে, পবিত্রতা, শুচিতা ও নৈতিকতা যোগবিজ্ঞান-রূপ প্রাসাদের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, সর্বজীবে দয়া, ক্ষমা, সারল্য, পরিমিত আহার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যোগশিক্ষা তথা রাজযোগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। মন, মুখ ও কাজে সমানভাবে অহিংসা পালন করা উচিত। এ'ছাড়া রাজযোগে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রাদি পাঠ, ঈশ্বর-প্রণিধানেরও উপযোগিতা আছে। ধর্মসাধনের পক্ষে সুস্থশরীর বিশেষ দরকার, কেননা যারা ক্রমাগতই রোগ ও অসুস্থতার সাথে যুদ্ধ করে তাদের মন দুর্বল হয়, সুতরাং ধ্যান-ধারণার সাধনও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মনকে কোন একটি বিষয়ে নিবিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করলে মন স্থির এবং তা ধ্যান ও সমাধির উপযোগী হয়। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্যে যোগপথে আসনের ব্যবস্থা আছে। আসনের পরিচয় দিতে গিয়ে পতঞ্জলি বলেছেন: "স্থিরসুখমাসনম্"।[৪১] স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "* * *Asana* or posture of the body in which he (*Sådhaka*) can sit firmly for a long time without feeling

৩৬। অভেদানন্দ: (১) 'হাউ টু বি এ যোগী' (১৯৪৩), পৃঃ ৬৪; (২) 'স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট', পৃঃ ৩১

৩৭। ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৪

৩৮। পাতঞ্জলদর্শন, ১।২

৩৯। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"।—পাতঞ্জলদর্শন, ১।৩—৪

৪০। পাতঞ্জলদর্শন, ২।২৯

৪১। পাতঞ্জলদর্শন, ২।৪৬

pain in the limbs"।[৪২] মোটকথা সহজভাবে শ্বাস ও প্রশ্বাসকে গ্রহণ ও ত্যাগের জন্যে মেরুদণ্ডকে (শিরদাঁড়াকে) সোজা রাখতে হয়, আর সেইজন্যে আসনের প্রয়োজনীয়তা। যোগশাস্ত্রে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি চুরাশী রকম আসন ছাড়াও অন্যান্য আসনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

প্রাণায়াম বলতে শ্বাস ও প্রশ্বাসকে সুসংযত করা বুঝায়। প্রাণবায়ু সুসংযত ও স্থির হোলে মন সহজে কোন লক্ষ্যে স্থির ও তা ধ্যানের উপযোগী হয়। প্রাণায়ামে যে মানসিক শক্তি লাভ হয় তা দিয়ে ইন্দ্রিয়, শরীরের পেশী ও স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে বশীভূত করা যায়। নানান রকমের যোগজ বিভূতিও অনেক সময় প্রাণায়ামের দ্বারা লাভ করা যায়।[৪৩] প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার। মনকে ইন্দ্রিয় ও বাইরের বিষয় থেকে তুলে নিয়ে ইচ্ছানুযায়ী লক্ষ্যবস্তুতে বা অন্তরে নিবিষ্ট করার নাম প্রত্যাহার। প্রত্যাহার ধ্যানের সহায়ক। ক্রমাগত যত্ন ও অভ্যাসের দ্বারা মনের বৃত্তিগুলিকে সংযত ও কেন্দ্রীভূত কোরে একটিমাত্র লক্ষ্যে ধারণ করার নাম ধারণা।[৪৪] স্বামী অভেদানন্দ এটিকে সন্ধানী-আলো বা সার্চ-লাইটের সাথে তুলনা করেছেন—"We may compare the concentrated mind of a Yogi to a mental searech-light";—অর্থাৎ লণ্ঠন বা বাতির আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় তা যেমন তীব্র হয় না, কিন্তু সার্চ-লাইটের সমস্ত আলো মাত্র একটি দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বেশ শক্তিশালী ও তীব্র হয়, তেমনি যোগীর স্থির ও সুসংযত মনের শক্তি হয় তীব্র ও অদম্য। কোন একটি আদর্শ বা লক্ষ্যের দিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অখণ্ড চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার নাম ধ্যান।"[৪৫] পতঞ্জলি বলেছেন: "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"।[৪৬] ধ্যানে চিত্ত বা চিন্তাধারা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা অথবা বায়ুশূন্য স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতন থাকে। ধ্যান গাঢ় হোলে সমাধিতে মন লীন হয় এবং তখনই সাধক শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন। সমাধিকে স্বামী অভেদানন্দ 'the state of superconsciousness'[৪৭] (পরচেতন অবস্থা) অথবা 'the state of Godconsciousness' (ঈশ্বরচৈতন্য) বলেছেন।[৪৮]

মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বরোপাসনা ও ধ্যানের সহায়ক-রূপে প্রতীকের উপকারিতা স্বীকার করেছেন—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"।[৪৯] সাধনার ক্ষেত্রে নাম বা মন্ত্রজপের উপযোগিতা আছে।

৪২। অভেদানন্দ: 'হাউ টু বি এ যোগী' (১৯১৩), পৃঃ ৭৫

৪৩। 'হাউ টু বি এ যোগী' বইয়ে 'সায়েন্স অব ব্রিদিঙ্' আলোচনাটি দ্রষ্টব্য।

৪৪। অভেদানন্দ: (১) স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট', পৃঃ ৪৮; (২) 'হাউ টু বি এ যোগী', পৃঃ ৭৭

৪৫। "Meditation means the continuous or unbroken flow of one current of thought towards a fixed ideal".—'স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট', পৃঃ ৫৫

৪৬। পাতঞ্জলদর্শন ৩।২

৪৭। অভেদানন্দ: 'হাউ টু বি এ যোগী,' পৃঃ ৭৭

৪৮। অভেদানন্দ: 'স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট', পৃঃ ৫৯

৪৯। পাতঞ্জলদর্শন, ১।২৭

মন্ত্রের অর্থ, চিন্তার সাথে সাথে জপ করা বিধেয়। ঈশ্বর স্বরূপত নির্গুণ ও নিরাকার হোলেও তাঁকে ধ্যান করতে হয় নিরবচ্ছিন্ন চিন্তধারা দিয়ে। কোন-কিছু বিষয় ছাড়া ধ্যান বা চিন্তা হয় না, অথচ ঈশ্বর স্বরূপত নির্গুণ ও নিরাকার বোলে নির্বিষয়। তাই দেশ-কাল ও সাধনার ক্ষেত্রে কোন বাচক-রূপ প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা অধ্যাত্ম সাধকেরা স্বীকার করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'নেসাসিটি অব সিম্বল্‌স্' (প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা)[৫০] এবং 'ওয়ার্ড এ্যাণ্ড দি ক্রস ইন্ এন্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর সকল দেশে দ্বৈতবাদী ধর্মসেবীরা সগুণব্রহ্মের উদ্দেশ্যে প্রতীক ব্যবহার করেন এবং প্রতীকের প্রচলন সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায় সকলেই আপনাপন মন্দির ও গির্জার বেদীতে কোন-না-কোন আকারে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রতীকের প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুরা দেবদেবীর, ওঙ্কারের বা কোন প্রাণীদেহের, খৃষ্টানেরা ক্রুশের ওপর যীশুখৃষ্টের, শিশু যীশুখৃষ্টকে কোলে নিয়ে ম্যাডোনার বা ক্রুশেবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মূর্তি প্রভৃতি ব্যবহার করেন ও তাদের সাম্‌নে প্রদীপ অথবা বাতি জ্বেলে দেন। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানেরা প্রধানতঃ ক্রুশই সর্বদা ব্যবহার করেন।

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, খৃষ্টানদের ক্রুশ বা 'ক্রশ' বৈদিক স্বস্তিক-চিহ্ন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেছেন: "The readers of the history of symbolism know that the Cross as a religious symbol had existed in India ages before Christ was born, and many centuries before it was accepted by the Christian church and monopolised by it as its own property".[৫১] ডাঃ ব্রিণ্টন্ বলেছেন, স্বস্তিক ও ক্রুশের উৎপত্তিস্থল এক এবং অন্তত এরা একার্থবোধক —"The Swastika and the Cross, were originally of the same signification, or at least closely allied in meaning". বিদুষী মুরে-এন্‌স্লে (Mrs. Murray-Aynsley) বলেছেন, স্বস্তিক সূর্য প্রভৃতির প্রতীক।[৫২] অধ্যাপক গুড্‌ইয়ারের মতে, পদ্মফুল যেমন সৌরপ্রতীক, স্বস্তিকও তেমনি সূর্য বা কোন সৌরদেবতার প্রতীক। লুডিগ্‌ মূলার, পার্সি গার্ডনার, বিল্, এডোয়ার্ড টমাস,

৫০। অভেদানন্দ: 'পাথ অব রিয়ালিজেসন্' (১৯৪৬), পৃঃ ৬৭—১০০

৫১। অভেদানন্দ: 'হোয়াই এ হিন্দু এ্যাক্‌সেপ্টস্ ক্রাইষ্ট এ্যাণ্ড রিজেক্টস চার্চিয়ানিটি' (১৯০০), পৃঃ ১০

৫২। "Some have held the Svastika to be an emblem of the sun, and others, again, hold that the arms of the Cross represent two pieces of wood and are typical of fire, which at first produced by primitive peoples resulted from two crooked sticks being laid one across the other, and a hole drilled through both; in this a stick was then inserted, and rapidly twisted by hands till all were ignited at the points of contact."—'সিম্বলিজিম্ অব দি ইষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' (১৯০০), পৃঃ ৪০

মোক্ষমূলার, গাইডোজ্, উইলিয়াম সিম্‌সন প্রভৃতি মনীষীদের অভিমতও তাই।[৫৩] কিন্তু পণ্ডিত গ্রেগ্ (Mr. R. P. Greg) ও ডি' এ্যাল্‌ভিলার (D' Alviella) মতে, স্বস্তিক ইন্দ্রের হাতে বজ্রের বা বিদ্যুতের প্রতীক। টমাস উইলসন স্বস্তিককে বলেছেন—প্রাগৈতিহাসিক। তাঁর মতে, সুপ্রাচীনকালে প্রাচ্যদেশে প্রতীকের ব্যবহার ছিল ও পরে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর প্রচলন হয়। বিদুষী মুরে-এন্‌গ্লে উল্লেখ করেছেন, আদিম ইহুদীয় যুগে স্পেন, রোম, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, স্কান্দিনেভিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে স্বস্তিকের প্রচলন ছিল। প্রাচীন ইজিপ্টে 'তাউ-ক্রশ' প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়েছিল। অধ্যাপক সেয়েস (Prof. Sayace) স্বস্তিককে হিটাইট-প্রতীক বোলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, আর্যেরাই প্রথমে প্রতীকের প্রচলন করেছিলেন।

ইজিপ্টীয় ক্রুশের সাধারণ প্রতীক 'ক্রাক্স আন্‌সাটা' পরবর্তীকালে খৃষ্টানেরা ব্যবহার করতেন। প্রাচীনকালে ক্রুশের মতন খৃষ্টানেরা ত্রিকোণযন্ত্রকেও (△) কল্যাণসুন্দর ত্রিমূর্তির প্রতীক বোলে স্বীকার করতেন। ভারতবর্ষে তন্ত্রে ত্রিকোণযন্ত্র শক্তির প্রতীক। এছাড়া মৎস্য, সর্প, গোলাপ ও পদ্ম প্রভৃতি ফুল, পাখীর ডিম, ঘুঘুপাখী, মেষ, ঈগলপক্ষী, যীশুজননী ম্যাডোনা, অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি প্রতীক হিসাবে গণ্য হোত। ডাঃ আর্থার ড্রুজ বলেছেন, প্রাচীন খৃষ্টধর্মের সকল প্রতীকের পিছনে ভারতীয় ভাবধারার প্রেরণা ছিল এবং প্রতীক যে সম্পূর্ণ বৈদিক, বৈদিক অগ্নির সাথে তার সৃষ্টিরহস্যের সম্পূর্ণ যোগসূত্র আছে, একথা স্বীকার করা অসমীচীন নয়।[৫৪] রেভারেণ্ড জে. পি. লাণ্ডি বলেছেন, খৃষ্টানেরা কখনো কখনো যীশুখৃষ্টকে মৎস্য-রূপে চিন্তা করতেন। তিব্বতী বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে 'দাগ-পো' বোলে অভিহিত করতেন। যীশুখৃষ্ট, এ্যাপোলো, ইকিউলেপিয়াস্ প্রভৃতিকেও সর্প-রূপে চিন্তা করা হোত। যীশুখৃষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকে পৃথিবীর সকল দেশেই বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হোত। বসন্তোৎসবকে লোকে তখন প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন বা পুনর্জন্ম (Resurrection of nature) বোলে চিন্তা করতেন। ডাঃ ফ্রেজারও এই অভিমত পোষণ করেন।[৫৫] রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর 'দি ইন্দো-আরিয়ান্ রেসেস্' বইয়ে শরৎকালে দুর্গোৎসবকে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে বর্ণনা করেছেন, কেননা দেবী দুর্গার আর একটি নাম শাকম্ভরী।[৫৬] বর্তমান লেখক তাঁর

৫৩। (ক) 'দি স্বস্তিক', পৃঃ ৭৭৯-৭৯১ ('রিপোর্ট অব দি ইউ, এস. ন্যাসান্যাল মিউজিয়ম্ ফর্ ১৮৯৬'-এ প্রকাশিত) পৃঃ ৭৫৭-১০১১ ; (খ) এইচ্. জিমার : 'মিথস্ এ্যাণ্ড সিম্বলস্ ইন্ ইণ্ডিয়ান আর্ট এ্যাণ্ড সিভিলিজেসন' (১৯৪৫) দ্রষ্টব্য।

৫৪। "In its symbols also the earliest Christianity coincides with Indian thought in such a striking manner that it can scarcely be explained as chance. Thus horse, the hare and peacock, which play so great a part in symbolic pictures of catacombs, point an *ultimately Vedic origin*, where they all stand in connection with the nature of Agni."—'দি ক্রাইষ্ট মিথ' (১৯১০), পৃঃ ৪৫

৫৫। ডাঃ ফ্রেজার : (১) 'গোল্ডেন বাউ : য়্যাডোনিস্ এ্যাটিস ওসাইরিস্', ১ম ও ২য় ভাগ, (২) 'য়্যাডোনিস' (থিঙ্কার্স লাইব্রেরী সিরিজ)।

৫৬। রমাপ্রসাদ চন্দ : 'দি ইন্দো-আরিয়ান রেসেস্' পৃঃ ১৩১-১৩৪

'শ্রীদুর্গা' বইয়ে এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[৫৭] কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে প্রজাপতি কাশ্যপের উদ্দেশ্যে একটি মন্ত্র উল্লেখ কোরে কোন শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিচয় দিয়েছেন। রায় বাহাদুর চন্দের অভিমতে—উনিই দেবী দুর্গা।[৫৮] রামায়ণেও নাকি ঐ ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বসন্তঋতুর পুনরুত্থান কল্পনা করা হোত শীতঋতুর পরে। শীতঋতুতে প্রকৃতি তথা পৃথিবীর সর্বত্র গাছপালা পত্রশূন্য হোয়ে মৃতপ্রায় হয়, বসন্তের সমাগমে সেই সবে আবার নূতন পত্রোদ্গম হোতে থাকে, প্রকৃতি তখন যেন পুনর্জীবন লাভ করে মনে হয়। প্রকৃতির এই পুনরুত্থান বা পুনর্জীবনকে উদ্দেশ কোরে পৃথিবীর সকল জায়গার লোকে তাই বসন্তোৎসব, শারদোৎসব প্রভৃতি পালন কোরে আসছে। বাসন্তীদুর্গা, শারদীয়াপূজা, হোলি, দশেরা, যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব বা খৃষ্টমাস, গুডফ্রাইডে, ইষ্টার এই সমস্তই বসন্তের অথবা শরৎ-ঋতুর অনুষ্ঠান। রবার্টসন, ডুজ, কনিবিয়র, ডাঃ ইন্‌ম্যান্‌, কেয়ারী, গ্র্যাণ্ট এ্যালেন প্রভৃতি মনীষীরা এগুলিকে সৌর-উৎসব (solar festival) বলেছেন।[৫৯] সমগ্র খৃষ্টানজগৎ প্রাচীনকাল থেকে আজ-পর্যন্ত ২৫শে মার্চ বসন্তোৎসব পালন কোরে আসছেন।[৬০] শীতকালে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অংশ যেন নিদ্রামগ্ন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং সূর্য যখন বিষুবরেখার (equator) ওপর আসে ও মকরক্রান্তির (ট্রপিক অব ক্যান্সারের) দিকে সরে যায়, তখনি মনে করা হোত যে, সূর্যদেবের পুনরুত্থান হচ্ছে। ইহুদীরা সূর্যের এই পুনরুত্থানকে উদ্দেশ কোরে পাসোভার (Passover) বা নিষ্ক্রমণ-উৎসব পালন করেন।

পরবর্তীকালে সমগ্র খৃষ্টানজগৎ সূর্যের পুনরুত্থানকে (Resurrection) যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থান বোলে কল্পনা করেন এবং ২৫শে মার্চের পরিবর্তে ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টমাস-উৎসব পালন করতে আরম্ভ করেন।[৬১] স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, পুনরুজ্জীবন বা

৫৭। প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা' (১৩৫৪), পৃঃ ৬৬-৬৭

৫৮। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (ইংরেজী সংস্করণ), পৃঃ ১৪৫-১৪৬

৫৯। এ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত 'শ্রীদুর্গা', পৃঃ ৫৯—৮৪

৬০। স্বামী অভেদানন্দ জন্ হেন্‌রী স্মিথের লেখায় উল্লেখ কোরে বলেছেন : "Easter had been observed as a pagan festival hundreds of years before Christ. * * The Romans also celebrated their Hilaria on the 25th of March. * * Also, the Persian festivals of Spring and the ancient *Houli* of Hindusthan, all celebrated at this same time. Even China has its festival of *Gratitude of Tien.*"—'পাথ অব রিয়ালিজেসন্‌', পৃঃ ৮০—৮১

৬১। "The 25th of March was celebrated throughout the ancient Greecian and Roman world in honour of the Mother of God and even now it is called the *Lady Day* in Catholic countries. The 25th of December is held to be the birthday of Jesus the Christ, but this day was originally the Sun's birthday. At the commencement of the Sun's apparent revolution round the earth, he was said to be born on the first moment after midnight on the 24th of December and it was celebrated among all pagan nations. It was afterwards accepted by the Christian churches to decide the disputed date of the birth of Jesus the Christ, just as Sunday,

পুনরুত্থানের ধারণা জেন্দাবেস্তায়ও পাওয়া যায়। ইহুদীরা ব্যাবিলোনিয়ায় অবরোধের (Babylonian Captivity), (খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬—৫৩৬) সময় এই ধারণা গ্রহণ করেছিল। আসলে খৃষ্টমাস অথবা ইষ্টার-উৎসব প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনের দিনকে স্মরণ কোরে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জড় থেকে চৈতন্তের বা মৃত্যু থকে প্রাণের বিকাশই এই উৎসবের তাৎপর্য। যীশুখৃষ্টের মৃতদেহ কবর থেকে উঠে পুনর্জীবন পেয়েছিল কিনা সন্দেহ, কেননা সত্যিকারের ইতিহাসে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। 'ক্রুশিফিক্সন্ বাই এ্যান্ আই-উইট্‌নেস্' ও 'আন্‌সিন্ লাইফ অব যীশাস্' বই দুখানিতে ক্রুশে যীশুখৃষ্টের মৃত্যু ও কবর থেকে মৃতশরীরের পুনরুত্থান মোটেই সমর্থিত হয় নি। বরং ক্রুশে বিদ্ধ হোয়ে যীশুখৃষ্ট যে পার্থিব শরীর ত্যাগ করেন নি, জীবিত ছিলেন—একথাই তারা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। রবার্টসন্, কনিবিয়র, ফ্র্যাঞ্জ্ ক্যুমঁ, ড্রুজ, জেন্স, প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা একে যীশুখৃষ্টের পরিবর্তে সূর্যের পুনরুত্থান বলেছেন।[৬২] স্বামী অভেদানন্দ খৃষ্টানদের প্রচলিত বিশ্বাসকে স্বীকার কোরেও যীশুখৃষ্টের মৃতশরীরের পুনরুত্থান-রূপ প্রতীকের সত্যিকারের অর্থ দিয়েছেন: জড়ের মৃত্যু ও চৈতন্যের জাগারণ, অর্থাৎ সমগ্র জগৎকে অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোক দেখাবার জন্যেই এই পুনরুত্থানবাদটি কল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

"* * and the resurrection of the world symbolized in the resurrection of Jesus the Christ. It is the crucifixion of the animal self and the resurrection of the Spiritual self. * * So Christ's resurrection signifies the resurrection of spirit from matter and not the resurrection of matter, though uneducated masses believe in the physical resurrection of Jesus. Death of the flesh, that is, death of one's attachment to flesh and to matter is the beginning of spiritual birth of Regeneration. * * . Regeneration begins with self-mastery over one's animal nature."[৬৩]

স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, কুমারী ম্যাডোনা খৃষ্টানজগতের অন্যতম প্রতীক। প্রাচীন ব্যাবিলোন, চ্যালডিয়া ও অসিরিয়ায় কুমারী মিলিত্তার পূজা প্রচলিত ছিল। যীশুখৃষ্টের মতন মিলিত্তার পুত্র তামুজও নাকি পুনরুজ্জীবন

the Sun's day, was introduced in place of the Jewish Sabbath by Constantine the Great in 321 A. D."—স্বামী অভেদানন্দ: (ক) 'পাথ্ অব রিয়ালিজেসন' (১৯৪৬), পৃ: ৮৬—৮৭; এবং (খ) 'ক্রাইষ্ট এ্যাণ্ড খৃষ্টমাস্' প্রবন্ধ।

৬২। এ' সম্বন্ধে অন্তত নিম্নলিখিত বইগুলি আলোচনার বিষয়:

(১) সি, কনিবিয়র: "মিথ্, ম্যাজিক এ্যাণ্ড মরালস্" (১৯২৫); (২) জে. এম্. রবার্টসন: (ক) "পেগান ক্রাইষ্ট' (১৯১১). (খ) "খৃশ্চানিটি এ্যাণ্ড মাইথোলজি' (১৯৩৬), (গ) 'এ সর্ট হিষ্ট্রি অব খৃশ্চানিটি'; (৩) অধ্যাপক আর্থার ড্রুজ্: 'দি ক্রাইষ্ট মিথ্' (১৯১০); (৪) ফ্র্যাঞ্জ ক্যুমঁ: 'দি মিষ্ট্রিজ্ অব মিথ্' (১৯১০); (৫) লুইস্ জি, জেন্স্: এ ষ্টাডি অব প্রিমিটিভ খৃশ্চানিটি' (১৮৮৭); (৬) ডি, এন, রায়চৌধুরী: 'ইন্ সার্চ অব যীশাস ক্রাইষ্ট' (১৯২৭); (৭) 'রিলিজিয়াস্ সিষ্টেমস্ অব দি ওয়ার্ল্ড' (১৯০১); (৮) এচ্, ডি, ভট্টাচার্য: 'দি ফাউণ্ডেসন্ অব লিভিঙ্ ফেথস্'; (৯) খাজা কমল-উদ্দীন: 'দি সোর্সেস অব খৃশ্চানিটি' (১৯৩৪), পৃ: ২৬—৫৬

৬৩। অভেদানন্দ: 'পাথ অব রিয়ালিজেসন' (১৯৪৬), পৃ: ৮১-৮২

লাভ করেছিলেন। ৪৩১ খৃষ্টাব্দে 'এফিসাস্-আলোচনা-সভা' (Council of Ephesus) মেরীকে 'স্বর্গের রাণী' ও 'ঈশ-জননী' বোলে প্রচার করেন এবং ৮১৩ খৃষ্টাব্দে সেই স্বীকৃতিকে সকলে গ্রহণ করেন। আবার ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পোপ ও 'মন্ত্রণা-সভা' (Council) মেরীকে কুমারী মাতা[৬৪] হিসাবে স্বীকার করেন এবং এটিই ধর্মের প্রতীক-রূপে সমগ্র খৃষ্টানজগতে গৃহীত হয়। অবশ্য যীশুখৃষ্টের জন্মের বহুপূর্ব থেকে ইজিপ্টে ও ভারতে এই ধারণার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন যুগের জীবনচরিতকারেরাও অবতারকল্প পুরুষদের ও মহামানবদের জন্মকথা লিখতে গিয়ে তাঁদের জন্মের ওপর অলৌকিকতা আরোপ করার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। এমন কি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর জন্মবৃত্তান্তকে নিয়েও অপ্রাকৃতিকতার অবতারণা করা হয়েছে। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণাদি অবতারকল্প মহা-পুরুষদের জীবনচরিতেও এইরকম আরোপকে বাদ দেওয়া হয় নি। স্বামী অভেদানন্দ এই ধরণের মনোভাবকে ঠিক সমর্থন করেন নি। তিনি "ইমাকিউলেট কন্‌সেপ্‌শন্"-কে অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বলেছেন। মাননীয় ওয়েষ্টওয়ে বলেছেন: "The evidence for the Virgin Birth is altogether inadequate, and it must be remembered that similar stories are told in regard to many other great personalities of the ancient world, Plato, Alexander and Augustus amongst them." তারপর একথা যুক্তিযুক্ত যে, পূর্ণরূপেই হোক আর অংশরূপেই হোক, ঈশ্বরের অবতারেরা যখন পার্থিব শরীর ধারণ করেন মনুষ্যসমাজকে মুক্তির পথ ও অপার্থিব আদর্শ দেখাবার জন্যে, তখন পুরুষসংসর্গে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করতে তাঁদের বাধা কি? মনুষ্যসমাজের আদর্শ হিসাবে অবতারপুরুষ বা মহামানবদের জীবনী ফুটিয়ে তুলতে গেলে তাঁদের মানুষ থেকে ক্রমবিকশিত অতিমানুষ হিসাবে দেখানোই যুক্তিসঙ্গত।

৬৪। 'ইমাকিউলেট কনসেপশন' (Immaculate Conception)-এর অনুবাদ ঠিক 'কুমারী মাতা' নয়; এর অর্থ—পুরুষসংসর্গ ব্যতীত কুমারীর গর্ভ ধারণ করা। অবশ্য অলৌকিক কোন উপায়ে বা দেবতার আশীর্বাদে এই গর্ভধারণ সম্ভব হয়—একথা এই মতের অনুবর্তীরা বিশ্বাস করেন।

মাননীয় ওয়েষ্টওয়ে (F.W. Westway) উল্লেখ করেছেন: "In the Roman church, for example, the Immaculate Conception, now an Article of Faith, was a debated point until 1854, it was actually denied by St. Augustine and Thomas Aquins. * * The theory of the miraculous birth retains the human mother while dispensing with the human father. It is, however, illogical to maintain that the taint descends in the male line only. To meet this difficulty the church of Rome invented the doctrine of the Immaculate Conception."—'সায়েন্স এ্যাণ্ড থিওলজি' (১৯৩২), পৃ: ৫৬৬, ৬৭১

মনীষী রবার্টসন (J. M. Robertson)-ও এই মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন: "The Descent into Hades, * * the Assumption of Mary, the Immaculate Conception of Mary by *her* mother Anna, these are all as sequent from pagan practice as the myths of the gospels, as the machinery of the priesthood."—'খৃশ্চানিটি এ্যাণ্ড মাইথোলজি' (১৯৩৭), পৃ: ৪০৫

পরিশেষে অধ্যাত্ম সাধনায় প্রতীকের আলোচনায় স্বামিজী উল্লেখ করেছেন, আমরা যখনি কোন-কিছু লিখি বা বলি তার পিছনে থাকে মনের মধ্যে একটি চিন্তা; লেখা অথবা কথাগুলি আমাদের মানসিক চিন্তারই বাইরের রূপ, সুতরাং তারা চিন্তার প্রতীক। কাব্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য এ'সমস্তই শিল্পীর আন্তর চিন্তার বাস্তব পরিণতি বা প্রতীক। প্রতীক ও প্রতিমা তাই কোন দেবতা, মন্ত্র বা ঈশ্বরের প্রকাশক। প্রতীক ও প্রতিমা পথপ্রদর্শক, এদের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনায় অগ্রসর হোলে মানুষ তার চরমলক্ষ্যেই উপনীত হয়।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, জ্ঞানযোগ সম্পূর্ণ বিচারের পথ। অদ্বৈতবেদান্তের সাধনাকে ঠিকঠিকভাবে জ্ঞানযোগ বলা যায়। 'বিচার' বলতে বুঝায় জ্ঞানবিচার, ব্রহ্মবিচার, সদসদ্‌বিচার, আত্মতত্ত্ববিচার, অধ্যাত্মবিচার প্রভৃতি। জড়, চৈতন্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, নাম, রূপ এ' সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশ বা বিলাস। ব্রহ্ম ছাড়া এদের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা ভুল, ব্রহ্মই এদের আধার বা অধিষ্ঠান, অথচ এরা ভিন্ন বোলে মানুষের কাছে প্রতীত হয়। এই প্রতীতি কিন্তু সত্য নয়, বরং প্রাতীতিকী মিথ্যা। মিথ্যা বল্‌তে বুঝায় অনিত্য বা সর্বদা চলমান,—শাশ্বত ও নিত্য নয়। জ্ঞানযোগে বিবেক ও বিচার দ্বারা এই সত্য অনুভব করতে হয় যে, বিশ্বসংসারের চিরস্থায়িত্ব নাই, কারণ এর বিকার বা সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস আছে। একমাত্র অবিকারী ও নিত্য আত্মচৈতন্য। সকলের কারণ মহাকারণরূপা ব্রহ্মই মাত্র সকল গুণ ও পরিণামের অতীত (transcendental), সুতরাং নিত্য ও শাশ্বত। ব্রহ্ম আমাদের স্বরূপ, আর দেহ ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, নাম-রূপ এবং 'আমি' 'আমার' অভিমানযুক্ত আমাদের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব সত্য নয়। এভাবে ক্রমাগত বিচার করার অভ্যাসে বৈরাগ্য আসে, অনিত্য সংসারের ওপর থেকে আসক্তি কমে যায় এবং তখনই চিত্তশুদ্ধির ফলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়।

বেদান্তে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সাধনার ক্রম। পাতঞ্জলদর্শনের যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতিকেও পরবর্তীকালে বেদান্তসাধনের অন্তর্ভুক্ত কোরে নেওয়া হয়েছে। 'শ্রবণ' অর্থে মহাবাক্যের বিচার বা সদসদ্‌বিচার, 'মনন' মহাবাক্যের বিচারে স্থিরীকৃত বস্তুতে মনোনিবেশ ও মনকে নিদিধ্যাসনের উপযোগী কোরে তোলা। নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয়।

এছাড়া তন্ত্রাদির সাধনাও আছে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, তন্ত্র বেদ তথা বেদান্তেরই আনুষ্ঠানিক সাধন। তন্ত্র বেদের মতন প্রাচীনতা ও কৌলিন্য নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে। বেশীর ভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে তন্ত্রসাহিত্য ও তার সাধনা অতীব আধুনিক, মৌর্য বা গুপ্তযুগে নাকি তা বিকাশলাভ করেছিল। কিন্তু এ' সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। বেদের ক্রিয়ানুষ্ঠানই ভিন্ন ভাবে ও আকারে তন্ত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও উপাসনা দেশের বা রাজনৈতিক কোন পরিবর্তনে অথবা বিপর্যয়ে রুদ্ধপ্রায় হোলে, কিংবা বেদের ক্রিয়াকাণ্ড কোন কারণে প্রকাশ্যে কোন এক সময়ে নিষিদ্ধ হোলে, সাধকেরা ভিন্নভাবে গোপনে লোকালয়ের বাইরে সেই অনুষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশ্য দার্শনিকতত্ত্বের দিক থেকে বেদ তথা বেদান্তে ও তন্ত্রে পার্থক্য অনেক। অদ্বৈতের ভাব দুটিতে অব্যাহত থাক্‌লেও একটি শুদ্ধতাকে ও অপরটি শক্তিকে নিয়ে পরিপূর্ণ, একটি

বিশেষ্য-বিশেষণের বাইরে, ও অপরটি বিশেষ্যের ছদ্মবেশে বিশেষণের কোটায় আবদ্ধ। তাছাড়া দুয়ের মধ্যে সাধনার পার্থক্যও অনেক। রাজযোগ-রূপ যোগদর্শনের সাধনার সাথেও তন্ত্রের পার্থক্য আছে। পতঞ্জলি যম-নিয়ম-আসনাদি অষ্টাঙ্গসাধনের উল্লেখ করেছেন, উপনিষদোত্তর বেদান্তের বইগুলি পাতঞ্জলদর্শনের এই যোগসাধনাকে তাদের অঙ্গীভূত করেছে। কিন্তু তন্ত্রে গৃহীত যোগসাধনার বর্ণনা ও প্রণালী বেশ ভিন্ন রকমের, অথবা বলা যায়, পাতঞ্জলের অনেক পরেকার যোগগ্রন্থের সাথেই তন্ত্রোক্ত যোগসাধনার মিল পাওয়া যায়। পাতঞ্জলদর্শনে প্রাণায়াম তথা রেচক, পূরক ও কুম্ভকের অভ্যাসে প্রাণবায়ুকে ও সাথে সাথে মনকে দমন তথা সংযত করার প্রণালী আছে। তন্ত্রেও প্রাণায়াম আছে, কিন্তু সেখানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার রূপচিন্তার-সাথে মেরুদণ্ডের মধ্যে সাতটি চক্রের কল্পনা করা হয়েছে। চক্রগুলি পদ্ম। পদ্মের দেবতা, দেবতাদের বীজ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও দেবী, তত্ত্ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তন্ত্রোক্ত যোগে কল্পনাবৈচিত্র্য ও ভাবমাধুর্য অনেক বেশী। তন্ত্রে প্রাণায়ামকে একটি বিশেষস্থান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তন্ত্রে আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্যও বড় কম নয়। শিব-শক্তির মিলনে অখণ্ড চিন্ময় অনুভূতিলাভই তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য।

বৈদিক উপাসনার মতন তন্ত্রে মানুষের শরীরের তিন জায়গায় ধ্যান (মনস্থির) করার উপদেশ আছে। উপনিষদে হৃদয়কে পুণ্ডরীক বা পদ্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটি শূন্য স্থান (খালি জায়গা) আছে এবং তা বাতাসে পরিপূর্ণ। ঐ স্থানকে আকাশ-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আকাশে যেমন সূর্য প্রকাশ পায়, হৃদয়াকাশেও তেমনি জ্ঞানসূর্য চৈতন্যের আকারে সর্বদা প্রকাশমান। চৈতন্যকে জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধব্রহ্ম-রূপে ধ্যান করতে হয়। তন্ত্রে ভ্রূমধ্যেও ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের কল্পনা করা হয়। ঐ চক্রমধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে আজ্ঞাচক্রের প্রায় পশ্চাতে দ্বাদশদলবিশিষ্ট গুরুচক্রের স্থান। গুরু জ্ঞানদাতা, শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট ও জ্যোতির্ময়। ইনি মানুষগুরু নন, তবে মানুষগুরুকে ইষ্টরূপে চিন্তা কোরে শিবরূপী ব্রহ্মের সাথে ঐস্থানে অভেদভাবে ভাবনা করার উপদেশ আছে। সাধক ধ্যান করেন যে, গুরুচক্রে বরাভয়দাতা গুরু প্রসন্নমূর্তিতে সাধকের দিকে তাকিয়ে আছেন, প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের ওপর এবং কখনো বা জ্ঞানের প্রতীক শ্বেতবর্ণ হংসাসনে তিনি আসীন। এছাড়া মস্তকে সহস্রদলবিশিষ্ট সহস্রারচক্রেও ধ্যান করার বিধি আছে। মস্তকে মনোনিবেশের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে: একটি পিন্ বা সূঁচ ঠিক মস্তকের ওপরে মধ্যস্থানে এবং অপর একটি পিন্ বা সূঁচ ঘাড়ের পিছনে মেডুলা-অব্‌লংগটার (সুষুম্নাকাণ্ডের) মাঝখান থেকে ফুঁটিয়ে দিলে যেখানে দুটি পিন্ বা সূঁচ একসাথে মিলিত হবে ঠিক সেই স্থান সাধকের কল্পনায় অতিসূক্ষ্ম, শূন্য এবং আকাশে (বায়ুতে) পরিপূর্ণ। ঐস্থানে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম সমাসীন। অবশ্য সপ্তচক্রের চিন্তার মতন এই ধারণাটিও কল্পনামাত্র, ধ্যানের সহায় বা অবলম্বন। সাধক এই ধরণের কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কোরে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধি করেন, তাই কল্পনা এবং অবলম্বন

অধ্যাত্ম সাধনায় ভিন্ন ভিন্ন হোলেও একেবারে নিরর্থক বা মিথ্যা নয়, তারা মুক্তির সহায়ক।

তন্ত্র সাধারণত দু'রকম: হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র। জৈনদের মধ্যে মূর্তিপূজা ও পূজানুষ্ঠানের প্রচলন আছে, কাজেই জৈনধর্মেও যে তন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল একথা স্বীকার করা অসমীচীন নয়। হিন্দুতন্ত্র বৈদিক ক্রিয়াকলাপেরই ছদ্মবেশ। অনেকে হিন্দুতন্ত্রকে বৌদ্ধতন্ত্রের নকল বা বৌদ্ধতন্ত্র থেকে ধার করা বলতে চান। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, শক্তিবাদ তন্ত্রকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। পণ্ডিতেরা তন্ত্রবাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণা কোরে নাকি দেখেছেন যে, তন্ত্র ও তন্ত্রবাদ উত্তরদেশীয় বৌদ্ধধর্ম (Northern Buddhism) থেকে জন্মলাভ করেছে।[৬৫] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির অভিমতও তাই। ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ও এ' ধরণের মতবাদ সমর্থন করেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, দেবীপূজা তথা শক্তিবাদ বৌদ্ধধর্মেরই পরিণতি। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধধর্মে ত্রিত্ববাদ, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দেবী হেরুকা, বজ্রবারাহী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে। তন্ত্র প্রথমে বৌদ্ধদের ভিতর প্রচার হয়, পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬৬] বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্বদের ও অনেক বৌদ্ধদেবীকে হিন্দুতন্ত্র নাকি নিজের মধ্যে আত্মসাৎ কোরে নিয়েছিল। যেমন, বৌদ্ধ অক্ষোভ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মে হয়েছেন শিব অথবা তারাদেবীর উপাসক ঋষি।[৬৭] মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীজীর মতে, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে খুব সম্ভবত সিথিয়ান বা শকদের ম্যাগাই (Magi) পুরোহিতরাই তন্ত্রকে ভারতবর্ষে প্রচার করেছিলেন। ডাঃ বাগ্‌চী হিন্দুতন্ত্রকে পাকেপ্রকারে 'foreign origin' (বিদেশ থেকে আমদানী করা) বলেছেন।[৬৮] শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' পুস্তকে এ'সিদ্ধান্তই সমর্থন করেছেন। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'ছদ্মবেশে দেবদেবী' প্রবন্ধে [৬৯] ও 'সাধনমালা'-র অবতরণিকায় [৭০] হিন্দুতন্ত্রের অধিকাংশ দেবদেবীদের বৌদ্ধতন্ত্র থেকে ধার করা বলেছেন। তাঁর মতে, আচার্য বসুবন্ধুর (২৮০-৩৬০ খৃষ্টাব্দ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকাচার প্রবর্তন করেন। তাছাড়া তিনি বলেছেন, বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধেরা যে তন্ত্রমন্ত্রদকলের সাধনা কোরে আসছিলেন ধারনীগুলিই তার প্রমাণ।[৭১] পণ্ডিত তারানাথের মতে, অসঙ্গ ও ধর্মকীর্তির মাঝামাঝি সময়ে গোপনে তন্ত্রধর্ম বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রচলিত হয়।

৬৫। (ক) 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা,' সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ; (২) প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা' (১৩৭৪) পৃঃ ৭-৮

৬৬। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু : 'দি মডার্ণ বুদ্ধিজিম্ এ্যাণ্ড ইটস্ ফলোয়াস´ ইন্ উড়িষ্যা' বইয়ের 'ইণ্ট্রোডাকসন' পৃঃ ১১ ; (খ) প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা' পৃঃ ৮ ; (গ) 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল কোয়াটার্লি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নর্দান বুদ্ধিজিম্' প্রবন্ধ, (১ম ভাগ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)।

৬৭ প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা' (১৩৫৪), পৃঃ ৯

৬৮ ডাঃ বাগ্‌চী : 'ষ্টাডিজ্ ইন্ দি তন্ত্রজ্' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং), ১ম ভাগ, পৃঃ ৪২-৪৩

'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখামালা,' ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮

'সাধনমালা' (গ্রাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ), ২য় ভাগ, 'ইণ্ট্রোডাক্‌সন', পৃঃ ১৭, ১৯

৭১ প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা' (১৩৫৪), পৃঃ ১০

সিদ্ধ সরহা নাকি এই প্রবর্তনকারীদের মধ্যে প্রধান। অনেকের অভিমত, ইন্দ্রভূতিই (৭০০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধতন্ত্রের প্রচারক।[৭২] কিন্তু দেখা যায় যে, ইন্দ্রভূতির আগেও নাগার্জুন (২য় শতক), অশ্বঘোষ (৩য় শতক), আর্যদেব (৩য় শতক) প্রভৃতি ধ্যানীবুদ্ধ ও তন্ত্রচারের কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে সিদ্ধ নাগার্জুনই তিব্বতে পূজিত একজটার সাধনা ভারতে প্রচার করেন। এই একজটাই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যারূপা মহানীলসরস্বতী। হিন্দুদেবী সরস্বতীও নাকি বৌদ্ধদেবী এবং আসলে তিনি ভদ্রকালী, কেননা সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রে আছে—'ভদ্রকাল্যৈঃ নমো নিত্যম্'। কাজেই হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধতন্ত্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—এটাই বেশীর ভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত।

কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। হিন্দুতন্ত্র মোটেই বৌদ্ধতন্ত্রের পরবর্তী বা বৌদ্ধতন্ত্র থেকে ধার করা জিনিস নয়। তন্ত্র বেদের সমসাময়িক না হোলেও বৈদিকোত্তর কালে বেদের অনুষ্ঠানগুলির উপর ভিত্তি কোরে গড়ে উঠেছিল তন্ত্রবাদ, এজন্যে বৌদ্ধতন্ত্রই বরং হিন্দুতন্ত্রের কাছে পুরোপুরিভাবে ঋণী। শ্রদ্ধেয় স্যার জন্ উডরফ্[৭৩] এবং পণ্ডিত হোগরাথ[৭৪] এই মতবাদ অনেকটা পোষণ করেন। তাছাড়া একথা ঠিক যে, বৌদ্ধতন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর মূর্তিকল্পনা হিন্দুতন্ত্রের ঐ সকল থেকে অনেকাংশে বিপরীত, কেননা বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ভিতর মতবিরোধ ও মনকষাকষি বরাবরই ছিল। পুষ্যমিত্র সম্রাট হবার পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হয়, তখন শূদ্রশ্রেণীভুক্ত বৌদ্ধদের দলনও বড় কম হয় নি। হিন্দুতন্ত্রের গণপতি সিদ্ধিদাতা, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে তিনি সিদ্ধিনাশক। হিন্দুদেবী অপরাজিতা গণপতির প্রতি প্রসন্না, কিন্তু বৌদ্ধ অপরাজিতা গণপতিকে পদভারে দলন করছেন—'গণপতি-সমাক্রান্তা'[৭৫] ইত্যাদি। তবে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবার ঐক্যও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, যেমন মন্ত্র, যন্ত্র, চক্রানুষ্ঠান, কারণ-ব্যবহার ও কতকগুলি সাধনপদ্ধতির মিল পাওয়া যায় পরস্পরের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে। আবার কতকগুলি সংশোধন ও পরিবর্তনের খাতিরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আসলে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও পদ্ধতিরই অনুবর্তন। যেমন, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রাচারে কারণের ব্যবহার আছে। তন্ত্রে ব্যবহৃত

৭২। ইন্দ্রভূতি ছিলেন উড্ডীয়ানের রাজা। বেশীর ভাগ পণ্ডিতের অভিমতে, উড্ডীয়ান উড়িষ্যা। ইন্দ্রভূতির পুত্রের নাম পদ্মসম্ভব ও কন্যার নাম লক্ষ্মী দেবী বা লক্ষ্মীঙ্কর দেবী। ওয়াডেল সাহেব ও মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীজীর মতে, ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীদেবীই নাকি সহজযান বৌদ্ধধর্মের প্রচারক। উড়িষ্যা ইন্দ্রভূতির সময়ে তন্ত্রসাধনার একটি পীঠস্থান ছিল। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর অভিমতও তাই। এ' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বইগুলিতে আলোচনা দ্রষ্টব্য :

(ক) প্রাচ্যবিদ্যার্ণব বসু : 'ময়ূরভঞ্জ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে'; (খ) ওয়াডেল :' লামাইজিম্', পৃঃ ৩৮০; (গ) শাস্ত্রী : 'বুদ্ধিষ্ট্ ইন বেঙ্গল' ('দি ঢাকা রিভিউ ২য় ভাগ, নং ৭) পৃঃ ৩৮; (ঘ) শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য 'দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফী' (১৯২৪), পৃঃ ২৭ (ইণ্ট্রোডাকসন)।

৭৩। উডরফ : 'প্রিন্সিপিলস্ অব তন্ত্র' বইয়ের 'ইণ্ট্রোডাক্সন,' পৃঃ ৩৫

৭৪। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড এথিকস,' ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪৭; (খ) রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ : 'ইন্দো-আরিয়ান রেসেস', পৃঃ ১৩৮; (গ) প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা', পৃঃ ৮৩

৭৫। (ক) 'সাধনমালা' (গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ১৯২৮), ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০৩;

কারণ বৈদিক সোমরসেরই অনুকরণ, অনুকল্প বা ছদ্মবেশ। চক্রানুষ্ঠানও তাই। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদীর চারধারে ঋত্বিকেরা বস্‌তেন মণ্ডল রচনা কোরে, সামছন্দের তালে তালে তাঁরা ঘৃতাহুতি দিতেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায়, সোমরস পান করতেন সূর্য, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন কোরে।[১৬] পরবর্তীকালে তন্ত্রে চক্রানুষ্ঠান তাই বৈদিক যজ্ঞবেদীর চারধারে মণ্ডল-রচনারই অনুবর্তন বোলে মনে হয়। বৈদিক ও এমন-কি পৌরাণিক যুগেও সহধর্মিণী তথা শক্তির সাহচর্য ব্যতীত কোন যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হোত না। পরে তন্ত্রানুষ্ঠানেও শক্তি তথা নারীর উপযোগিতাকে অবহেলা করা হয় নি। তবে দিব্যাচার সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। হিন্দুতন্ত্রে যেমন শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ চিন্তা কোরে শিব ও শক্তির কল্পনা করা হয়েছিল, বৌদ্ধতন্ত্রেও তেমনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ (emanation) পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য এঁরা পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ। বজ্রযান থেকে উৎপত্তি বোলে ধ্যানীবুদ্ধদের বলা হয় বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব। 'বজ্র' শব্দের অর্থ শূন্য এবং শূন্য বলতে

(খ) শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য : 'দি ইণ্ডিয়ান্ বুদ্ধিষ্ট আইকোনগ্রাফী' (১৯২৪), পৃ: ১৫৩—১৫৪ ; (গ) হপকিন্স্ : 'এপিক্ মাইথলোজি', পৃ: ৩, ৫০, ২২৯ ; (ঘ) প্রজ্ঞানানন্দ : 'অপরাজিতা' প্রবন্ধ, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ', ২য় ভাগ পৃ: ৭১৫-৭১৮

এ'ছাড়া হিন্দু দেবদেবীদের ওপর বৌদ্ধদের অবিচার সম্বন্ধে উল্লেখ কোরে শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন: "Sometimes in the images of the Buddhist gods and goddesses we notice the presence of Ganesh, who is regarded by the Hindus as *Siddhidâtâ* or the Bestower of Perfection, or Success in Tantric rites. The Buddhists in order to display their aversion to the follower of the Brâhmanical faith, made their gods trample upon Ganesh. Such as Aparâjitâ (of Nalanda, kept in Indian Museum), Vighnântaka (in Sâhitya-Parisat Maseum) * * representing as trampling upon Ganesh under their feet. In the two Vikrampur images of Pranashavari and the Decca Sâhitya-Parisat Meseum, the image of Mahâpratisarâ, Ganesh appears below the lotus seat lying prostrate on the ground, under the pressure of the Buddhist deities. The Buddhists thus showed their animosity against the Hindu god, Ganesh, and gave him the epithet of Bighna or obstacle, * * The four Hindu gods, Brahmâ, Vishnu, Siva and Indra have been designated uniformly as the four Māras or Wicked Beings and several Buddhist gods have been described as trampling them under their feet. * * * This is how the Buddhists attempted to exhibit the superiority of their gods over those of the Brâhmanical faith."—"দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফী' (১৯২৪), পৃ: ১৬৩ ; (ঙ) প্রজ্ঞানানন্দ : 'শ্রীদুর্গা', পৃ: ১০৯

১৬। কুলার্ণবতন্ত্রে (৫।৯০) অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

"যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং বিধীয়তে।
মদ্যপানং তথা কার্যং সময়ে ভোগমোক্ষদম্॥"

বুঝায় আকাশ বা জ্ঞান (ব্রহ্ম)।[৭৭] আর্যদেবের মতে, বৌদ্ধদের পঞ্চস্কন্ধ থেকে পঞ্চবুদ্ধের উৎপত্তি। পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি শক্তি ও বোধিসত্ত্ব কল্পনা করা হয়েছে। বোধিসত্ত্বদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা এঁরা প্রধান। এঁদের থেকে আবার আরো অসংখ্য বুদ্ধ, শক্তি ও বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্র এই ধ্যানীবুদ্ধ, শক্তিরূপিণী দেবী ও বোধিসত্ত্বদের উদ্দেশ্যে বিচিত্র সাধনা ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে। বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীরা নামে, রূপে ও মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন হোলেও পরমস্বরূপে এক ও অভিন্ন। হিন্দুতন্ত্রের মতন বৌদ্ধতন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধককে পরমার্থ-জ্ঞান-রূপ মুক্তি দান করা।

তন্ত্রের সাধনা যে শুধু বাংলাদেশে, কাশ্মীরে, তিব্বতে বা দাক্ষিণাত্যেই প্রসার লাভ করেছিল তা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে ও বিশ্বের সকল দেশেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইলিউসিসে (Eleusis) 'ইলিউসিনিয়ান রহস্যানুষ্ঠান' (Eleusinian Mysteries)-এর কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।[৭৮] ইলিউসিসের মন্দিরে মহাশক্তি ধরিত্রীদেবী ডিমিটারের পূজা হোত। এই দেবী ডিমিটারই বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে সাধকদের কাছ থেকে পূজা লাভ করতেন। যেমন, ফ্রিজিয়াবাসীরা দেবী ডিমিটারকে বলত 'দেবমাতা', এথেন-বাসীরা 'মিনার্ভা', সাইপ্রাসবাসীরা 'ভেনাস', ক্রীটবাসীরা 'ডিক্‌টীন্না', সিসিলিবাসীরা 'প্রোজারপাইন' এবং অন্যান্য দেশে বলা হোত ইউনো, বেলনা, হেকেট, আইসিস প্রভৃতি।[৭৯]

ভারতবর্ষের সর্বত্র তন্ত্রের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও বাংলাদেশ, কাশ্মীর, তিব্বত ও দাক্ষিণাত্য এই কয়টি স্থানেই তান্ত্রিক সাধনা পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়েছিল। এই কয়টি স্থানে সাধনার সাথে সাথে দার্শনিক চিন্তাধারাও (philosophy) গড়ে উঠেছিল, যদিও পরস্পরের মতবাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল বৈচিত্র্য। বাংলাদেশে কাদি-মতের ও কাশ্মীরে শ্রী-মতের প্রচলন। তন্ত্র-সাধনায় হাদি ও ক-হাদি মতের সম্প্রদায়ও আছে। এই সকল সম্প্রদায়ভেদে পাদুকারও (গুরুপাদুকা) আবার রূপভেদ আছে। তবে বাংলাদেশে তন্ত্রের নিজস্ব একটি সম্প্রদায় (school) গড়ে উঠেছিল এবং তাতে সাধনাংশেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরে প্রচারিত হয়েছিল ত্রিক-মত। অবশ্য সর্বত্রই শ্রীযন্ত্রের অর্চনা পেয়েছিল সমাদর। তন্ত্রসাধনা বা সাম্ভবীবিদ্যা কুলবধূর মতন গোপনীয়।[৮০] এমন কি তন্ত্রসাধনসিদ্ধ কৌলগণ নিজেরা সর্বদা গুপ্তভাবে বাস করেন। তন্ত্রে তাই বলা হয়েছে, পশুদের[৮১] কাছ থেকে কৌলগণ নিজেদের গোপনে রাখার জন্যে

৭৭। ডাঃ সুধেন্দুকুমার দাস: 'শক্তি অর্ ডিভাইন্ পাওয়ার' (১৯৩৪), পৃঃ ২৩৮-২৪০

৭৮। ডাঃ ই. ও. জেমস: 'কম্‌পারিটিভ রিলিজিয়ন্' (১৯৩৮), পৃঃ ১২৮-১৩৮

৭৯। ঐ, পৃঃ ১২৭-১২৮

৮০। "ইয়ন্তু সাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।"—কুলার্ণবতন্ত্র ১১।৮৪

৮১। 'পশু' অর্থে এখানে জীবজন্তু (animal) নয়। তন্ত্রে বেদাচারী বা বৈদিক আচারীদের 'পশু' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তান্ত্রিকেরা ব্যতীত তন্ত্রসাহিত্যের দৃষ্টিতে আর সকলেই পশু।

অন্তরে থাকবেন কৌল, বাইরে শৈব ও লোকালয়ের সামনে বৈষ্ণবের মতন আচরণ নিয়ে। [৮২] তন্ত্রে সাতটি আচার আছে: বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। [৮৩] অনেকের মতে আবার ন'টি আচার, যেমন দক্ষিণের চেয়ে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের চেয়ে বাম, বামের চেয়ে অঘোর, অঘোরের চেয়ে যোগ, যোগের চেয়ে কৌল শ্রেষ্ঠ। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার তো আছেই। অনেক তন্ত্রে পশ্বাচার, সময়াচার, বীরাচার ও দিব্যাচারের নামোল্লেখ থাকিলেও সাধারণ বেদাচারীরাই 'পশু' নামে কথিত, সুতরাং বেদাচার ও পশ্বাচার অভিন্ন। [৮৪] বীরাচার বামাচারের ও দেব্যাচার কৌলাচারের অন্তর্গত। জ্ঞানপথের সাধক, সন্ন্যাসী ও তন্ত্রসাধনমার্গের কৌল [৮৫] সমপর্যায়ভুক্ত। বিরজাহোমের পর ত্যাগমার্গী সন্ন্যাসীরা যদি তন্ত্রে পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা বা সাম্রাজ্যাভিষেক গ্রহণ করেন তবে তাঁরা শক্তি (স্ত্রী) গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের কাছে মন্ত্রদাতা গুরুই সাক্ষাৎ শক্তি। তন্ত্রাভিষিক্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ত্যাগমার্গী ব্রহ্মচারী গৃহস্থদের পক্ষে তন্ত্র-

৮২। 'অন্তঃ কৌলো বহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ।
কৌলং সুগোপয়েদ্দেবি নারিকেলফলাম্বুবৎ॥'—কুলার্ণব ১১।৮৩

৮৩। 'সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥'
—কুলার্ণবতন্ত্র ২।৭-৮; সর্বোল্লাসতন্ত্র ৯।৭-৯

এছাড়া নারায়ণীতন্ত্রে আছে,

"ত্রিধাচারঃ ত্রিভাবশ্চ কৌলাচারস্তু কারণম্।
পশ্বাচারশ্চ বীরশ্চ দিব্যঃ কৌলো ন সংশয়ঃ।
সিদ্ধান্তং বা মহেশানি কৌলভাবং সমাশ্রিতম্॥
* * *
পশ্বাচারং ত্রিধা জ্ঞেয়ং বীরাচারস্ত্রিধা শিবে।
চতুর্ধা দিব্যঃ কৌলশ্চ শক্তেশ্চ পুরুষস্তু চ॥
বৈষ্ণবঃ শৈবো দিব্যশ্চ কৌলভাবযুতঃ পশুঃ।
দক্ষিণো বামসিদ্ধান্তঃ কৌলযুক্তো হি শাক্তকঃ॥"
—সর্বোল্লাসতন্ত্র ৯।১-৪

প্রত্যেকটি আচার আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত। কিন্তু সর্বোল্লাসতন্ত্রে আছে: "ষড়াচারং চতুর্ভাবং কৌলজ্ঞানঞ্চ" (৯,১)। চারিটি ভাব যথা—পশুভাব, বীরভাব সভাব ও বিভাব। এর মধ্যে পশু ও বীরভাব সভাব ও বিভাব এই দুট শ্রেণীতে বিভক্ত। দিব্যভাবকে বলা হয়েছে পঞ্চমভাব। 'কৌলমার্গরহস্য' বইয়ে উল্লেখ আছে যে, দক্ষিণাচার ও পশ্বাচারের অন্তর্গত।

৮৪। "য এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স এব হি"—সর্বোল্লাস তন্ত্র ৯।১০

৮৫। বৈদিক, বৈষ্ণব ও শৈবানুষ্ঠান পশ্বাচারের অন্তর্গত এবং বীরাচারের মধ্যে বাম, দক্ষিণ ও সিদ্ধান্তাচার অন্তর্ভুক্ত। সপ্তোল্লাস সম্বন্ধে যাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকে তিনিই 'কৌল'।—কুলার্ণবতন্ত্র ৮।৯১-৯৫ দ্রষ্টব্য।

সাধনে তাই দিব্যাচার তথা কৌলাচার একমাত্র প্রশস্ত। পঞ্চতত্ত্ব-সাধনার সময় তাঁরা পঞ্চমতত্ত্ব হিসাবে দেবীর শ্রীচরণ বা পাদপদ্ম চিন্তা করেন, কেননা বিশ্বের প্রত্যেক নারী তাঁদের দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি জননী। দিব্যাচারীদের চক্রের নাম 'মহাচক্র' বা 'দেবচক্র'। এই সৃষ্টিরূপ মহাচক্রে পঞ্চমতত্ত্বের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এই চক্রে সাধকদের ভাবনাও দিব্য। সর্বোল্লাসতন্ত্রে (১৯।৩৬) আছে: 'পেয়ং মদ্যং দেহমাংসং জলজং মৎস্যকং শিবে, মুদ্রাপি চান্নদ্রব্যাণি সঙ্গমং পাঞ্চভৌতিকম্"। বাহ্যিক কোন আচার এই দিব্যচক্র-রূপ শ্রীচক্রের মধ্যে নাই। এই চক্রের সাধকেরা একমাত্র মুক্তিকামী বোলে ত্যাগপন্থী হন।

উপনিষদের মতন তন্ত্রকেও রহস্যশাস্ত্র বা রহস্যবিদ্যা বলে। তন্ত্রনির্দিষ্ট পূজার নামও তাই রহস্যপূজা। পঞ্চ-মকার পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প। তন্ত্রে চক্রানুষ্ঠানে পঞ্চতত্ত্বের সাধন করা হয়। বীর ও দিব্য ভেদে চক্র দু'রকম এবং বীরচক্রও অনেকের মতে আবার তিন প্রকার। দেবীর যিনি পূজা করেন তিনিই সাধারণত চক্রেশ্বর-রূপে পরিচিত, চক্র তিনিই পরিচালনা করেন, সুতরাং চক্রানুষ্ঠানের সময় সকল সাধক বা বীর[৮৬] চক্রেশ্বরের নির্দেশ মেনে চলেন। তন্ত্রসাধকদের 'শিব'-ও বলা হয়। চক্রে কোন জাতি বা বর্ণের বিচার নাই, সেইখানে সকলেই এক জাতি, একবর্ণ, এবং সকলেই শক্তি।[৮৭] এমন কি চক্রে গুরু-শিষ্যেও কোন ভেদ থাকে না, অভেদ ভাবনাই তখন বীর, শিব বা সাধকমাত্রের আশ্রয়। চক্রানুষ্ঠানে জাতি ও বর্ণভেদ লোপ করায় তন্ত্রশাস্ত্র যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজকে উদারতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া তন্ত্র শিখিয়েছে মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। তন্ত্রের দিব্যদৃষ্টিতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সাধ্বী সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীকে ফলহারিণী কালীপূজার গভীর অমানিশিতে সাক্ষাৎ জগন্মাতা-রূপে পূজা এবং ভৈরবী যোগেশ্বরীকে তন্ত্রসাধনায় নিজের গুরুরূপে বরণ করেছিলেন, তাতে বিশ্বের নারীজাতি পেয়েছে চিরপবিত্রতার আসন ও সম্মান।

জপ, ধ্যান, পূজা, মুদ্রা, মণ্ডল, যন্ত্র, ধারণী, আসন, প্রাণায়াম, দেহশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, এসমস্তই তন্ত্রের উপাদান। এ'সকল বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান থেকে কল্পনা করা হয়েছে একথা পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি। পূজায় দিগবন্ধন, বহ্নিপ্রাকার-চিন্তা, দিনে সূর্যার্ঘ্য ও রাত্রে অগ্নির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৈদিক যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পূজার শেষে হোমানুষ্ঠান বৈদিকের সেই যজ্ঞাগ্নির স্মৃতিকে আজো জাগরূক রেখেছে। বৈদিকের

৮৬। শক্তিসাধকমাত্রেই পূজানুষ্ঠানের সময় 'বীর' নামে কথিত হন।

৮৭। "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।
* * *
জাতিভেদো ন চক্রেঽস্মিন্ সর্বে শিবসমাঃ স্মৃতাঃ।"
—কুলার্ণবতন্ত্র ৮।৯৭-১০১; সর্বোল্লাসতন্ত্র ২১।১-২

গোড়াকার দিকে হোতা ও ঋত্বিকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন গভীর জঙ্গলে, অরণ্যবেষ্টিত স্রোতস্বিনীর কূলে অথবা পার্বত্য অঞ্চলে, সুতরাং বন্য জন্তু জানোয়ারদের থেকে ছিল উপদ্রবের ভয়। তাই নিরুপদ্রব অনুষ্ঠানের জন্যে যজ্ঞশালার চারদিকে সাজাতেন তাঁরা কাষ্ঠরাশি ও তাতে অগ্নি প্রজ্জলিত কোরে দিতেন আগুনের বেড়া। বর্তমানে বহ্নিপ্রাকার-চিন্তা ঐ বৈদিক অনুষ্ঠানেরই অনুবর্তন। বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেতও ছিল প্রচণ্ড প্রজ্জলিত অগ্নি। বৈদিকযুগে আর্যেতর জাতিদের বলা হোত রাক্ষস। তাদেরও তখন ছিল অসাধারণ রকমের উপদ্রব ও অত্যাচার। তাদের এবং পশুপক্ষীদের থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ছিল মন্ত্রের দ্বারা দিগ্‌বন্ধন। বৈদিকের সেই রীতি আজো-পর্যন্ত শুধু সমগ্র হিন্দুসমাজের বুকে কেন, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সঞ্জীবিত আছে।[৮৮] ডাঃ ফ্রয়েড এই রীতিকে বলেছেন 'টটেমিজম্',[৮৯] কিন্তু এ' থেকে হিন্দুরা যে কতবড় রক্ষণশীল জাতি সে-কথাই বরং নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়। স্বামী অভেদানন্দ হিন্দুদের রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে বলেছেন, হিন্দুরা তাদের আচার-ব্যবহারে সম্ভবত চীন বা জাপানীদের চেয়েও অধিক রক্ষণশীল জাতি এবং এই রক্ষণশীলতার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিজাতীয় জাতির আক্রমণের ফলে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"The Hindu people are extemely conservative in their manners and customs, perhaps more than the Chinese or Japanese, and this conservatism has been the outcome of long-standing foreign rule and of continuous inroads and invasions by foreign nations. We ought not to forget that India was first invaded by the Greeks, then by the Scythians, and ofterwards by Mongolians, Tartars, Mahomedans, and lastly by the Portuguese, the Dutch, and other Christians. * * What nation could withstand such successive invasions and survive such repeated disastars without possessing a temendous powers of conservatism ? * * The powers of conservatism which has been so mervellously displayed by the Hindu people is indeed a great lesson to the civilised world. It has kept the nation alive and has protected the Aryan blood and Aryan literataure by creating impregnable social barriers which the destructive forces of successive invaders have never been able to break through."[৯০]

৮৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় উল্লেখ করেছেন: "Practices and beliefs corresponding to those of the socalled Sâkta Tantras, exist in a more or less explicit form in numerous other religious sects of India, both ancient and mediaeval (and even modern), including the Buddhistic and the Jain. The essentials of the cult may perhaps be traced to the Vedic times [*Cf.*, the Mahâvrata rite]."—শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী সংপাদিত 'সর্বোল্লাসতন্ত্র'-এর *Forward*, pp. ii—iii

৮৯। বেদে 'টটেমিজম্' ছিল কিনা সে-সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'ডায়েলেক্টিক্স অব হিন্দু রিচুয়ালিজম্' (১৯৫০), ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৩—১০৪ দ্রঃ

৯০। অভেদানন্দ: 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার্ পিপ্‌ল্', পৃঃ ৮৮-৮৯

হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানে তন্ত্রের প্রভাবই সুস্পষ্ট। তন্ত্রের সাধনা বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে একসময়ে প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল এবং তারই ফলে শক্তিপীঠ তথা তন্ত্রের সাধনপীঠ ও সিদ্ধকৌল সাধকদের সংখ্যা বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক। বাংলার বীরভূম বা 'বীর'-ভূমি তন্ত্রসাধনার জন্যে একসময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এক বীরভূম জেলায়ই দেখ্‌তে পাই আমরা সিদ্ধ একান্ন পীঠের মধ্যে কয়েকটিকে একসাথে। যেমন, লাভপুরে 'দেবী ফুল্লরা', বোলপুরে 'কঙ্কালী মাতা', সাঁইথিয়ায় 'নন্দেশ্বরী'; নলহাটীতে 'নলহাটেশ্বরী', তারাপুর বা তারাপীঠে 'তারাদেবী', পাইকরে 'অপরাজিতা', বক্রেশ্বরে 'জয়দুর্গা' ও দেবী কিরীটীশ্বরী; এবং সিদ্ধভৈরব—বীরচন্দ্রপুরে 'ভাবেশ্বর', মল্লারপুরে 'সিদ্ধনাথ'; এতগুলি সিদ্ধপীঠ এক বাংলাদেশ ছাড়া আর অন্য কোথাও নাই। এছাড়া সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, আগমবাগীশ, ভৈরবী যোগেশ্বরী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা, অঘোরীবাবা এঁরাও তন্ত্রসাধনার স্মৃতিকে চিরসমুজ্জ্বল রেখেছেন। তন্ত্রে বামাচারের অজুহাতে ব্যভিচার সৃষ্টি করেছে ভোগসর্বস্ববাদী স্বার্থান্বেষী তথাকথিত সাধকের দল। ত্যাগের ছদ্মবেশে তারা চায় আকণ্ঠভোগ, মুক্তির নামে তারা জীবনের আদর্শ করেছে বাসনা ও পার্থিব আসক্তিকে। কিন্তু তন্ত্রের মাধুর্য ও পবিত্রতা তার জন্যে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ বা কলুষিত হয় নি, বরং তার নিরাসক্তিময়ী সাধনা চিরদিনই দিব্যমহিমার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ চৌষট্টিখানি শাক্ততন্ত্রের সাধনা ছাড়া অনুষ্ঠান করেছিলেন সমস্ত বৈষ্ণব-তন্ত্র, খৃষ্টানধর্ম, ইস্‌লামধর্ম, সুফীধর্ম প্রভৃতি এবং তন্ত্রসাধনায় অভিষিক্ত করেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের, দিয়েছিলেন শক্তিদীক্ষা মন্ত্রপূত কারণবারি সিঞ্চন কোরে। অবশ্য তাঁরা সকলেই ছিলেন কৌলাচার তথা দিব্যাচারের সাধক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রের সেই দিব্যসাধনা মোটেই আত্মপ্রকাশ করেনি তার সুস্পষ্ট মূর্তি নিয়ে, যদিও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের ভিতর শক্তিসাধনার চিরস্ফূর্ত উৎস ফল্গুধারার মতন প্রবাহিত ছিল। বিশেষ কোরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ ও অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে তন্ত্রাভিষেকও দান করেছিলেন। একথা সত্যি যে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে উপনিষৎ তথা বেদান্তের বাণী ও আদর্শই প্রচার করেছিলেন, এবং সেগুলি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর জ্বলন্ত ভাষ্য। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরও তন্ত্র-সাধনাকে রেখেছিলেন তিনি নানান কারণে আত্মগোপন কোরে, তাই তন্ত্রের সাধনা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেল না শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে সাধকদের ভিতর, আচার্য শংকর-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত হোল শ্রীরামকৃষ্ণসম্প্রদায়, যদিও দশনামীদের আচারবিচার, বিধিনিষেধ ও ধর্মানুষ্ঠানের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের অনেক-কিছুই মেলে না পুরোদস্তরভাবে। সমাজবাসী ও সমষ্টি লোক-কল্যাণকামী শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ শংকরের জগন্মিথ্যাবাদকে গ্রহণ করল নিছক দর্শনচিন্তার দিক থেকে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ত্যাগ ও বিচারকে আদর্শ কোরে দেশের ও দশের সেবায় করল আত্ম-সমর্পণ সাধনার অঙ্গ হিসাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রাণতা, সমদর্শন ও দিব্যানুভূতিপূর্ণ আদর্শের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণসম্প্রদায় সমগ্র বিশ্ববাসীকে গ্রহণ করলো জাগ্রত নারায়ণ-রূপে।

তন্ত্রসাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ অনুষ্ঠান করলেন একে একে সমস্ত ধর্ম; সকলের চরমানুভূতির লাভ কোরে প্রচার করলেন 'যত মত তত পথ'। মতবাদ ও ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বের দরবারে অসংখ্য, সুতরাং অধ্যাত্ম সাধনার প্রণালী বা পথও অনেক। কিন্তু মত ও পথ অসংখ্য হোলেও লক্ষ্যবস্তু সকলের এক। মুসলমান ইস্‌লাম ধর্মের সাধনা কোরে যে মুক্তির আনন্দ লাভ করেন, খৃষ্টান পার্শী হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকলেই যে যাঁর পথ বা অধ্যাত্ম সাধনাকে অবলম্বন কোরে সেই এক ও অদ্বিতীয় আনন্দসত্তায়ই প্রতিষ্ঠিত হন। অসংখ্য স্রোতস্বিনী যেমন বহুমুখী হোলেও এক ও অখণ্ড মহাসাগরেই মিলিত হয়, তেমনি বহু বিচিত্র সাধনার ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হোলেও পরিশেষে এক ও অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-সাগরে লীন ও একাকার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম এবং দর্শনও মহাসাগরের মতন সর্বগ্রাসী; শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনায় পাই আমরা সকল ধর্ম ও সাধনার একত্র মিলন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম অসাম্প্রদায়িক, কোন সম্প্রদায়বিশেষকে তা অবহেলা করেনি। স্বামী অভেদানন্দ তাই সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন: "সম্প্রদায়বিহীনো য সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি"। বিচারীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণসম্প্রদায় তাই অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম সার্বভৌমিক ও সর্বমতসহিষ্ণু হোলেও বিশিষ্ট একটি ধর্ম। সকল ধর্মমত ও সাধনার সমন্বয়-রূপ হোলেও তাই সবার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের একটি বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং সেদিক থেকে তা একটি পৃথক ধর্ম। 'যত মত তত পথ' শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের আদর্শ হোলেও সাধনা ও বিশ্বাস (cult) তার নিশ্চয়ই বিভিন্ন যদিও দৃষ্টি ও ভাব উদারতার মহিমায় চিরসমুজ্জ্বল। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের প্রদর্শিত সাধনপদ্ধতি তাই বিশ্বসাধনার জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার কোরে আছে ও চিরদিন থাকবে। নিছক সংস্কারপন্থী মতবাদে এঁদের ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়, কেননা সেরকম হোলে পৃথক ধর্মনিয়ন্তারূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় বিশ্বের দরবারে কথনই হোত না। কাজেই আচার্য শংকর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম ও দর্শনের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও দর্শনের পার্থক্য কিছু-না-কিছু অবশ্যই আছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদ বোঝার জন্যে সকলের ধর্মমত ও দর্শনের আলোচনা নিশ্চয়ই করতে হবে, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মতবাদ সকল যুগনায়কদের মতের সমন্বয়মূর্তি, আবার ভিন্নও বটে। তাই তার সত্যিকারের বৈশিষ্ট্যকে জানার জন্যে সকল মতের বা সকল দর্শনচিন্তার আলোচনা করা উচিত। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "শ্রীঠাকুরকে বুঝিতে হইলে সমগ্র শাস্ত্র—বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, Eastern and Western Philosophy-র (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের) জ্ঞান থাকা আবশ্যক"।[১১]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন:

"Without understanding Ramakrishna Paramhansa first, one can never understand the real import of the Vedas, the Vedanta, of the Bhâgavata and other

১১। অভেদানন্দ: 'পত্র-সংকলন' (১৯৫০), পৃঃ ৮৪

Purânas. His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian thoughts. He was the living commentary to the Vedas and to their aim."[২১]

'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবধারার অনুশীলন না কোরে কেউ কখনো বেদ, বেদান্ত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পারবে না, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনন্তশক্তিসম্পন্ন সন্ধানী-আলোর মতন সমস্ত ভারতীয় ধর্মচিন্তা ও দর্শনের ওপর ছড়ানো আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ ও তার যথার্থ লক্ষ্যের জীবন্ত ভাষ্য'। এ' থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বচিন্তার জগতে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়ে গেছেন, যা সকলের সাথে যোগসূত্র ও মৈত্রীভাব বজায় রেখেও নিজের স্বতন্ত্র মহিমালোকে চিরদিন সমাসীন থাকবে।

স্বামী অভেদানন্দের মতে, শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের সাধনায় কোন জিনিসেরই আধিক্য নেই। এতে আসন, প্রাণায়াম, কৃচ্ছ্রসাধন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও আহার-সংযমের কোন বাড়াবাড়ি নেই। বাহ্যিক আড়ম্বর, ভাবপ্রবণতা, অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, আমিষ-নিরামিষের দ্বন্দ্ব, পোষাক-পরিচ্ছদের নির্বাচন, তর্পণ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের সাধনে বালাই নেই; কেবল আছে মন ও মুখকে এক করার, সারল্য ও অকপটতার, ভক্তি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার এবং সর্বোপরি একনিষ্ঠার এতে উপযোগিতা। শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম-সাধনের লক্ষ্য অদ্বৈতজ্ঞানের অনুভূতি; সেই জ্ঞান আঁচলে বেঁধে জগতের হিতের জন্যে আত্মোৎসর্গ করা। বাইরের ত্যাগের চেয়ে আন্তর ত্যাগ তথা আসক্তি ও বাসনার ত্যাগই এ'সাধনায় প্রয়োজন; জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে, সকল সম্প্রদায়কে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসাই শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম-সাধনার ব্যবহারিক উপযোগিতা।

২১। বিবেকানন্দ :'কম্‌প্লিট্‌ ওয়ার্কস্‌ অব স্বামী বিবেকানন্দ', ৭ম ভাগ, পৃঃ ৪১৫

—দ্বাদশ আলোচনা—

শিল্প ও সৌন্দর্য

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, সৌন্দর্য আনন্দঘন ভগবানের ভাব ও দিব্যবিকাশ। ভগবানের সত্যিকারের রূপ সত্য-শিব-সুন্দর, সৎ-চিৎ-আনন্দ। সত্যই সৎ, শিবই চিৎ বা প্রকাশ এবং সুন্দরই আনন্দ। উপনিষদে আনন্দ থেকে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। আনন্দই বিশ্বের কারণ ও অধিষ্ঠান; আনন্দ থেকে বিশ্ব-চরাচরের উৎপত্তি, আনন্দে তা স্থিতি লাভ করে, আবার আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। সকল প্রাণীর সত্তা আনন্দের ওপর নির্ভর করে, কেননা সংসারে সকল প্রচেষ্টা, আকুলতা, ভোগ ও বাসনার পিছনে আনন্দলাভের আশা ও ইঙ্গিত থাকে বোলে তারা জীবনসংগ্রাম করে, চলার পথে অসংখ্য দুঃখ-কষ্টকে অবহেলা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সকলেই চায় আনন্দ, সৌন্দর্যসেবী সমস্ত প্রাণীই।

উপনিষদে ঈশ্বরকে 'কবি' বলা হয়েছে—"কবির্মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভূ"। সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের কাব্য, জীব জন্তু বৃক্ষ লতা আকাশ বাতাস সমুদ্র চন্দ্র সূর্য তারকা সবই বিশ্বকবি ভগবানের কবিতা। এই রচনার আনন্দে তিনি সর্বদাই মগ্ন আছেন। রূপে, রসে, গন্ধে, মাধুর্যে, সৌন্দর্যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য ভরপুর; শিল্পী ভগবানের অসামান্য এই শিল্পচাতুর্যের আর অন্ত নাই; সর্বত্রই দিব্যভাব ও মহিমার বিকাশ, সৌন্দর্য ও শিল্পনৈপুণ্য সুপরিস্ফুট।

সুন্দর ও অপার্থিব আনন্দের রাজত্বে ভাল-মন্দের বিচার নাই। দুঃখ-কষ্টও যেমন সুন্দর [১], সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তেমনি সুন্দর। সৌন্দর্যের মধ্যেই থাকে অনাবিল আনন্দ, অথবা সুন্দরই আনন্দ। সংসারের ভোগে নিরাসক্ত সাধকেরা স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যেও দুঃখ আকাঙ্খা করেন, কেননা সুখ ভুলিয়ে-দেয় ভগবানকে, দুঃখ জ্বালিয়ে রাখে স্মৃতির জাগপ্রদীপ প্রেমময় ভগবানের মন্দিরে। তাঁরা দুঃখ চান, যেহেতু দুঃখের মধ্যেই পান আনন্দ, অন্ধকারের ভিতরেই পান আলোক ও আশা। সুন্দরের সংসারে তাই আলো ও অন্ধকারের একই মূল্য, দুঃখ ও সুখের সমান চাহিদা। সুরূপ ও কুরূপ, ভাল ও মন্দ, হাসি ও কান্না সৌন্দর্যের জগতে তাই সমান।[২]

১। এ' সম্বন্ধে অবশ্য বহু মতভেদ আছে। বার্ণার্ড বোসাংকে তাঁর বিখ্যাত 'হিষ্টরী অব এস্‌থেটিক' বইয়ে পৃঃ ১১৫—১১৬ এবং বিশেষ কোরে ১৪শ পরিচ্ছেদে (Chap. XV). ৩৯২—৪৩৮ পৃষ্ঠায় তিনি পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট মনীষী সোলগার (Solger), উইজি [Weisse), ভিস্কার (Vischer), রোজেনক্র্যাঞ্জ (Rosenkranz), কেরিয়ার (Carriere), শ্যাসলার (Schasler), হার্টম্যান (Hartmann), কাণ্ট, হেগেল, গোটে, রাস্‌কিন প্রভৃতির মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের কেউ শিল্পের জগতে সুন্দর ও অসুন্দরকে সমান আসন দিয়েছেন, আবার কেউ বা বলেছেন—দুটি পরস্পরবিরোধী। ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদের মধ্যেও এ'সম্বন্ধে মতবৈষম্য আছে।

২। দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার সুন্দর ও অসুন্দরের প্রসঙ্গে একস্থানে উল্লেখ করেছেন: "There is a special sense of ugliness in which the ugly is one kind of the

বৈচিত্র্যের যা-কিছু ভাল ও মন্দ তাদের সৃষ্টি করেছেন ভগবান তাঁর আনন্দের রূপ দিয়ে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'ফিলজফি অব গুড এ্যাণ্ড ইভিল্' বইয়ে বলেছেন, আলো ও অন্ধকারের মতন সুখ ও দুঃখকে পরস্পর-আপেক্ষিক, সুতরাং সত্যিকারভাবে সুখও নাই, দুঃখও নাই ; অবস্থাবিশেষে সুখই দুঃখের অথবা দুঃখই সুখের আকারে প্রকাশ পায়। আনন্দ সর্বদাই থাকে সৎ বা সত্তার সাথে এবং সৎ সার্থক চিরদিন চিৎ বা প্রকাশকে নিয়ে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাই অবিচ্ছেদ্য, একেরই তিনটি প্রকাশ। সুন্দর বা সৌন্দর্যের যিনি উপাসক, তিনি সকল আনন্দের বস্তুকে চান তাই বাস্তব সত্তারূপে পেতে এবং প্রকাশ করতে চান তাকে কার্যের আকারে। শিল্পী ছবি আঁকেন সৌন্দর্য বা আনন্দের প্রেরণায়, অসীমের আনন্দ দেয় তার প্রাণে দোলা, অব্যক্ত স্পন্দন হৃদয়রাজ্য থেকে পেতে চায় ব্যাপ্তি, আনন্দ ও প্রকাশের যুগ্মরূপ রূপায়িত হোয়ে ওঠে রঙ ও তুলিকার মাধ্যমে বাস্তব শিল্পের আকারে।[৩]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, শিল্পীর অন্তরের আবেদনই শিল্প। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে থাকে তাই শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভা, অন্তর্মুখিতা ও সৌন্দর্যানুভূতি। শিল্প শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি, কোন-কিছুর অনুকরণ বা ধার করা নয়। অনেকের অভিমতে, প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণই শিল্প।[৪] কিন্তু তা ভুল। শিল্পীর কল্পনা কারণাকারে সুপ্ত থাকে তার মনের অবচেতন স্তরে, ইচ্ছার ইঙ্গিতে হয় উদ্বুদ্ধ ও প্রকাশ পায় রস, ভাব, আবেগ, কল্পনা প্রভৃতির আকারে।[৫] কল্পনা আসলে মনেরই

beautiful, such as a grotesque in architecture or a very ugly but highly aesthetic drawing of an old man's head amongst Leonardo's drawing's in the Louvre, * * ." (—'স্পেস টাইম এ্যাণ্ড ডিটি,' ২য় ভাগ, পৃঃ ২৮৭)। অবশ্য আলেকজাণ্ডার সুন্দরের তুলনায় অসুন্দরকেও স্বীকার করেছেন। সুন্দরের সম্বন্ধে বলেছেন: "Beauty has also two meanings, that of obvious beauty, * * or that of what pleases aesthetically. I am dealing here with beauty in general and ugliness in general, and my concern is with the question what kind of reality the aesthetic object possesses or what place it occupies in the scheme of things". (—ঐ, পৃঃ ২৮৭)।

৩। জে, কন্ (J. Cohn) শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আকার ও অভিব্যক্তিকে যুগ্মরূপ হিসাবে উল্লেখ করেছেন: "Form and expression, are intimately mingled in actual exprience, * * ."

৪। জি. এল. রেমণ্ড তাঁর 'এসেন্সিয়ালস্ অব এস্থেটিকস' বইয়ে (পৃঃ ৬৮-১২৯) শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আর্ল অব লিষ্টওয়েল তার উল্লেখ কোরে লিখেছেন: "Art is the *representation* in an external and material shape of the appearances and occurrences of of nature, * * it is *representative* rather than imitative of natural appearnces, * *." —(ক) 'এ ক্রিটিক্যাল হিষ্টরী অব মডার্ণ এস্থেটিকস' (১৯৩৩), ১১৮; (খ) বার্ণার্ড বোসাংকে: 'হিষ্টরী অব এস্থেটিক' (১৯২২), পৃঃ ৪

৫। শিল্পসৃষ্টির পিছনে মনোবৈজ্ঞানিকী প্রণালীর উল্লেখ কোরে আর্ল অব লিষ্টওয়েল বলেছেন: "Its activity becomes apparent in three main forms; as the *intellective imagination*

বৃত্তি। শিল্পী কল্পনার আশ্রয় নিলেও অন্তর্দৃষ্টিকে মোটেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না, বরং অন্তর্দৃষ্টিই (intuition) তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রাণ। কল্পনাই অনুভূতির আকারে রেখা ও রঙের মাধ্যমে বাইরে শিল্প সৃষ্টি করে। রস ও ভাব করে তাতে প্রাণসঞ্চার।

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, বিরাট প্রকৃতির গর্ভে শিল্পের প্রেরণা থাকে লুকানো, শিল্পী সৃষ্টি করেন মানে সেই দিব্য-প্রেরণার সাথে নিজের প্রাণের স্পন্দন ও অন্তরের আবেদনকে করেন মিলিত। তাই প্রকৃতির কাছে আত্মনিবেদন করা শিল্পীর পক্ষে একটি বড় জিনিস। শিল্পী তখনি কোন জিনিসের ছবি সুচারুরূপে আঁকেন যখন তিনি সেই জিনিসটিকে অন্তরে ও বাইরে ভাল কোরে জান্‌তে পারেন * ও ভাবচক্ষে দেখেন তার সমগ্র মূর্তিটি। শিল্প তাই ফটো বা আলোকচিত্রের মতন কোন জিনিসের হুবহু প্রতিফলন নয়; শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর থাকে অসীম স্বাধীনতা।

দেশ, কাল ও পাত্র হিসাবে শিল্পের জগতেও দেখা দেয় বৈচিত্র্য। সকল মানুষের মুখ যেমন পৃথিবীতে মোটেই এক রকমের নয় বা সকল মুখগুলিকে ভেঙে এক রকমের করা যায় না, সকল মানুষের মন এবং রুচিও সেরকম এক রকম নয়, এক রকম করাও অসম্ভব। বিকাশের তারতম্যে মানুষের রুচি এবং ইচ্ছার মধ্যে তাই বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন, দশজন শিল্পী যদি একই গাছের ছবি আঁকেন একই সময়ে, তবে প্রত্যেকের ছবির বিকাশ হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। রুচিভেদই এই বিভিন্নতার কারণ, রুচিভেদেই সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে একই বৃক্ষের আকার, প্রকৃতি ও বর্ণ-নির্বাচনে দেখা দেয় বিভেদ।[৭]

determined by the disinterested desire for pure knowledge, as *prectical construction*, determined by the natural interest which directs practical conduct, and lastly. as *aesthetic construction*, which is determined by the feelings and emotions that sway the mind of the creative artist",—'এ ক্রিটিক্যাল হিষ্ট্রী অব মডার্ণ এস্থেটিকস্' (১৯৩৩), পৃঃ ২৬

৬। লিষ্টওয়েলের মতে: "Art results partly from observation of the outer world, and partly from inspiration from the subconscious inner world, the two being correlated by means of the artistic imagination".—'এ ক্রিটিক্যাল হিষ্ট্রী অব মডার্ণ এস্থেটিকস্' (১৯৩৩), পৃঃ ১১৯

৭। এ'প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন ডাঃ এস, এন, দাসগুপ্ত একটু ভিন্নভাবে : "Even when two persons look at the same scarlet colour of a flower, they cannot be sure that the sensuous experience of each of them is identically and numerically the same. When both use the word 'scarlet' or 'red' to denote the colour which must remain incommunicable to each other. * * There is no proof that two minds act as one and identically the same Photographic Camera recording exactly the same impression".—'রবীন্দ্রনাথ, দি পোয়েট্ এ্যাণ্ড দি ফিলোজফার', (১৯৪৮), ১ম ভাগ, পৃঃ ১১

দেশ, সমাজ এবং আচারভেদেও শিল্পে বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন, ভারতীয় শিল্পী যদি কোন দেবীমূর্তির চিত্র আঁকেন তবে তিনি নিছক ভারতীয় ভাবেই চিত্রের সকল-কিছু ফুটিয়ে তোলেন। ভারতবর্ষেও প্রদেশভেদে আচারভেদ আছে। যেমন, বাঙ্গালী শিল্পী কোন দেবীমূর্তির চিত্র আঁকলে তাঁর মুখের ভাব, পোষাকপরিচ্ছদ ও পরিবেশ খাঁটি বাঙালী মেয়েদের ভাব ও পোষাকপরিচ্ছদ অনুযায়ীই পরিস্ফুট করবেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব অথবা বাঙলাদেশ ভিন্ন অপরাপর প্রদেশের শিল্পীরা আবার হাবভাব, পোষাকপরিচ্ছদ তাঁদের নিজেদের নিজেদের সমাজের মতনই ফুটিয়ে তুলবেন। জাপানী বা চীনা শিল্পীরা তাঁদের সমাজের রীতিনীতিকেই পরিস্ফুট করবেন চিত্রে কিম্বা ভাস্কর্যে। পাশ্চাত্যের দেশ-গুলিতেও তাই। সুতরাং সমাজ ও রীতিনীতি-ভেদে শিল্পের প্রকৃতি এবং টেক্‌নিকেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। তাছাড়া রুচি ও সম্প্রদায়ভেদে শিল্পের রূপেরও পরিবর্তন হয়, যেমন অজন্তা, মোগল, রাজপুত প্রভৃতি শিল্পে রূপভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আবার মথুরাশিল্পের সাথে গান্ধারশিল্পের মিল নেই, অজন্তার সাথে কাংড়া উপত্যকার শিল্পের মিল নেই, উত্তর ভারতীয় শিল্পের সাথে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের অনৈক্যও বড় কম নয়।

শিল্পে পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মানুসারে অঙ্কনেরও (perspective) উপযোগিতা আছে। পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মানুযায়ী অঙ্কনের অর্থ : দূরে দৃষ্ট কোন জিনিসের সাথে শিল্পের বাইরের একটি সম্পর্ক। দূরের কোন জিনিসকে নিশ্চয়ই আকারে ছোট দেখায় এবং আপেক্ষিক জগতের নিয়ম এইটিই। কিন্তু তবুও শিল্পী একে মোটেই সেভাবে গ্রহণ করেন না। আসলে শিল্পী চোখ দিয়ে সব-কিছু দেখলেও মনই তার দেখার কর্তা। মনের কাছে দেশ ও কালের দূরত্ব আছেও বটে, আবার নেইও বটে। চোখের দূরত্ব মনের কাছে অতি নিকট বোলে মনে হয়, আবার অতি কাছের জিনিসকে দূরের বোলে প্রতীত হয়। মনের কাছে তাই দেশ ও কালের ব্যবধানের কোন মূল্য নেই।

পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মানুসারে অঙ্কন দু'রকম : চাক্ষুষ ও মানস। এই দুটি রূপের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পজগতে দুটি সম্প্রদায় ও পদ্ধতিরও (school) সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, একটি পদ্ধতিতে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষকে অগ্রাহ্য কোরে মনের মাধ্যমকে গ্রহণ করা হয়, আর অপরটিতে চাক্ষুষকেই দেওয়া হয় প্রাধান্য, মন থাকে অবহেলিত হোয়ে। এই দুটি পদ্ধতি থেকে আবার দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে : একটি রিয়ালিষ্টিক বা বাস্তব ও অপরটি আইডিয়ালিষ্টিক বা ভাবমূলক। রিয়ালিষ্টিকে বাইরের আকার ও প্রকৃতিকে দেওয়া হয় সম্মান; বাহ্য অঙ্গসৌষ্ঠব, হাবভাব, বর্ণ প্রভৃতিকে হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয় চিত্রের মধ্যে, আর আইডিয়ালিষ্টিকে ভাববৈচিত্র্যকেই করা হয় চিত্রের আসল উপাদান। গ্রীসিয় শিল্প রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন এবং ভারতবর্ষীয় শিল্পে দেখা যায় আইডিয়ালিষ্টিকের তথা ভাবের ব্যঞ্জনা। অনেকের মতে, গান্ধার শিল্পে পড়েছে গ্রীসিয় শিল্পের প্রভাব, কেননা গান্ধারশিল্পে যেখানে গৌতমবুদ্ধের মূর্তিতে পার্থিব

বিকাশের চরম উন্নতি দেখানো হয়েছে, মথুরাশিল্পে বা অন্যান্য ভারতীয় শিল্পে বুদ্ধদেবের মূর্তিকে করা হয়েছে ধ্যানঘন ভাবসম্পন্ন, বাইরের বিকাশ তাতে নাই।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সত্যিকারের শিল্প ভাবেরই অভিব্যক্তি। আধ্যাত্মিকতার উৎস সেই শিল্পে জোগায় প্রেরণা[৮], অপার্থিবতার মাধুর্য প্রবুদ্ধ করে শিল্পীকে অফুরন্তভাবে। অসীম তাই সীমার বন্ধন নিয়ে দাঁড়ায় শিল্পে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী আবার সীমার মধ্যেও অসীমের ফুটান ব্যঞ্জনা, সীমার বন্ধনকে করেন ম্লান গতি ও স্থিতিকে পাশাপাশি ফুটিয়ে তুলে। সান্তের মধ্যে অনন্তকে অভিব্যক্ত করাই সত্যিকারের শিল্পীর কাজ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির দিগ্‌দর্শন করাই ধ্যানদৃষ্টি শিল্পীর উদ্দেশ্য। ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য ও মহিমাই শিল্পের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, শিল্পী কেবল তাদেরি সাধক ও উদ্বোধক। শিল্পসাধনায় শিল্পী তাই আনন্দময় ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হন, সিদ্ধি লাভ করেন তিনি বিশ্বের সকল-কিছুতে অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখে, নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'-কে তিনি মিশিয়ে দেন 'বিরাট আমি-'র মধ্যে, অজানার সকল গণ্ডী যায় ভেঙে, শাশ্বত আনন্দসত্তায় তিনি হন চিরপ্রতিষ্ঠিত।

শিল্পকে নিবিড়ভাবে জানতে, অর্থাৎ শিল্পের সত্যিকারের সমজদার হোতে গেলে শিল্পীর অন্তরের ভাবের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। কোন পুস্তক পড়ার অর্থ—সেই পুস্তকের প্রণয়ন-কর্তা বা গ্রন্থকারের চিন্তাধারার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা; সেখানে গ্রন্থকার ও পাঠকের চিন্তাক্ষেত্র হয় একই স্তরে প্রতিষ্ঠিত। তেমনি কোন সমালোচক বা পর্যবেক্ষক একটি শিল্পকে তখনি যথার্থভাবে বুঝতে বা জান্‌তে পারেন যখন তাঁর মন তথা চিন্তাধারা শিল্পীমনের সমান স্তরে হয় উন্নীত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও হয় আংশিকভাবে, পরিপূর্ণভাবে ঐক্য কোন সময়েই হয় না। শিল্পী যেমন সৃষ্টি করেন তাঁর শিল্প অখণ্ড একটি আদর্শকে সাম্‌নে রেখে, সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্তি তার দেবার চেষ্টা করেন রেখা, রঙ ও সুসঙ্গত পরিমাণের মাধ্যমে, কিন্তু সফলকাম হন না সেই আদর্শকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করতে, বরং আংশিক বিকাশের মাধুর্যেই হন আত্মহারা, সমালোচক ও পর্যবেক্ষকের পক্ষেও ঠিক তেমনি। কিন্তু তা হোলেও যথার্থ অনুধাবনের পিছনে থাকে সর্বদাই একটি সমানুভূতির ভাব, সমগ্রভাবে

৮। অধ্যাপক আর. জি. কলিংউড দার্শনিক ক্রোচের শিল্পদৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর 'আউট্‌লাইন্স অব্‌ এ ফিলজফি অব আর্ট' বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন যে, শিল্প বিশুদ্ধ কল্পনার পরিণতি, এর বিকাশে আছে অধ্যাত্মিকতার ভাব। অধ্যাত্মভাবের বিকাশ পাঁচটি রূপে প্রকাশ পায়: শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন। শিল্প এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম: " * * that art is *imagination* or *pure imagination,* and that imagination is an *activity* which is prior to the logical judgment; thus we find that art, as a spiritual activity, is the first of the five successive stages—artistic, religious, scientific, historical, and philosophical—in the development of man's spiritual life, and that its specific and characteristic feature is pure imagination."—আর্ল অব লিষ্টওয়েল: 'এ ক্রিটিকাল হিষ্ট্রী অব মডার্ণ এস্‌থেটিক্স,' পৃঃ ১৬

না হোলেও আংশিক বা অধিকাংশভাবে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পী ও দর্শকের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, আর তখনি শিল্পের সৌন্দর্য ও মহিমা পরিস্ফুট হয় বাস্তবদৃষ্টির এলাকায়, অনুভূতির জগতে উদ্বুদ্ধ হয় চেতনা, জ্ঞান ও আনন্দ।

মনীষী গ্যেটে বলেছেন, সত্যিকারের শিল্পী প্রচারক বা শিক্ষক নন, তিনি মাত্র শিল্পাদর্শের অংশীদার (sharer), তিনি নির্বিকার চিত্তে দিব্যচিন্তা ও গভীর আবেগের অংশমাত্র দান করেন সকল প্রাণীকে। হার্বার্ট স্পেন্সার শিল্পকে বলেছেন; স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত ভাবধারা, শিল্পের অপর কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য নাই, সকলকে আনন্দ দান করাই তার ব্রত। প্লেটো শিল্প ও সৌন্দর্যকে বিচারের মাপকাটিতে দেখলেও স্বীকার করেন যে, সত্তা তাদের বস্তুনিরপেক্ষ, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয়; কোন আকারের (form) মাধ্যমে প্রকাশ পেলেও অপার্থিব আনন্দের অনুভূতিই তারা বিতরণ করে। তবে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গীতে শিল্প ও সৌন্দর্য বিষয়বস্তুরই বাস্তব গুণ। প্লটিনাস ও নব্যপ্লেটোপন্থীরা সৌন্দর্যকে বলেছেন, দিব্যজ্ঞানের ('Divine Reason') পবিত্র জ্যোতি-বিশেষ, অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান তাঁদের চক্ষে পরমার্থজ্ঞান বা প্রেমঘন ভগবান, সৌন্দর্য সেই জ্ঞান বা ভগবানেরই সত্তা ও অনির্বাণ অভিব্যক্তি। শিল্পও তাই। শিল্পী সেজন্যে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের স্রষ্টা। কাণ্টের বিচারপ্রণালী এ'দিক দিয়ে সত্যিই অভিনব। তিনি শিল্প ও সৌন্দর্যকে আধুনিক বিজ্ঞান ও বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুশীলন করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত 'দি ক্রিটিক্ অব জাজমেণ্ট' বইয়ে অনুভূতিকে (feeling) মনের তৃতীয় বৃত্তি (faculty)-রূপে স্বীকার করেছেন এবং সে বৃত্তি বুদ্ধি ও ইচ্ছার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই অনুভূতি সৌন্দর্যেরই অনুভূতি, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ, সুতরাং পার্থিব সকল-কিছু আনন্দের সম্পূর্ণ উর্ধে। সৌন্দর্যানুভূতি যদিও সাধারণতঃ মনোবৃত্তির কোঠায় পড়ে তবুও তাকে বাস্তব হিসাবে গণ্য করা উচিত, কেননা যখনি আমরা বলি 'এই জিনিষটি সুন্দর,' তখনি সৌন্দর্য বস্তুর গুণ-রূপে প্রতীত হয়।

শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান ও দার্শনিক যুক্তি-বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হেগেল প্রকৃতিকে বিরাট মনের (Absolute Idea) অভিব্যক্তি বলেছেন। সৌন্দর্য ঐ দিব্য-বিশ্বমনেরই পর্যায়ভুক্ত এবং তা বাইরে বিকশিত হয় কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অথবা সৌন্দর্যকে চৈতন্য বা আত্মারই প্রকাশক ('discloser of spirit') বলা যায়। শিল্প, দর্শন ও ধর্মের উদ্দেশ্য সুন্দরের অনুভূতি দান করা। দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের সৌন্দর্যতত্ত্ব যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। চরমসত্য তাঁর কাছে 'বিরাট ইচ্ছা' (Absolute Will)। ঐ বিরাট ইচ্ছাই ভাব, আকার এবং সামান্য ও বিশেষজাতির মাধ্যমে পার্থিব জগতে প্রকাশ পায়। সৌন্দর্য বিরাট ইচ্ছা থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। শিল্প সত্যের প্রকাশক, শিল্পী তাই 'কেন', 'কখন' বা 'কোথায়' এ'ধরণের কোন প্রশ্ন করেন না। তিনি সকল যুক্তি, তর্ক, দেশ ও কালের উর্ধে দিব্য-ইচ্ছার প্রেরণায় সুন্দরকে শিল্পে প্রকাশ করেন। বেনেদেত্তো ক্রোচের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য মানসিক; তিনি সৌন্দর্যকে মনের অভিব্যক্তি (expression) বলেছেন।

তাছাড়া সৌন্দর্যদৃষ্টি তাঁর মতে—বোধির (intuition) পরিণতি। দার্শনিক আলেকজাণ্ডার সৌন্দর্যকে বলেছেন, আনন্দ দান করার কিছু-না-কিছু শক্তিবিশেষ, যে শক্তির মাধ্যমে সুন্দরকে বিচার করার জন্যে আমাদের মধ্যে অনুকূল প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। সুন্দরের উপাসনায় তিনি মনকেই একমাত্র প্রাধান্য দেন নি, বাস্তব জিনিসের উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন। শিল্পকে তিনি বলেছেন—সুন্দরের অভিব্যক্তি। শিল্প ও সৌন্দর্যকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে কাব্য ও দর্শনের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ সৌন্দর্য ও শিল্পকে প্রেম ও আনন্দময় ভগবানের আত্মপ্রকাশ বলেছেন তা আগেই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ ভগবান সৌন্দর্য ও শিল্পের মধ্যে প্রেম ও আনন্দঘন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব সাধকেরা ভগবানকে প্রেমের দিক থেকে দেখতে ও উপভোগ করতে চান, ভগবান তাঁদের দৃষ্টিতে 'রসঘন'। শিল্পীর ভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীও তাই। চিত্র, ভাস্কর্য ও সংগীত স্বামিজীর অভিমতে, চারুশিল্প বা ললিতকলা। অপার্থিব সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ অনুভূতি বাইরে আত্মপ্রকাশ করে চিত্রকরের তুলিকায় রেখা ও রঙে চিত্ররূপে, ভাস্করের তক্ষণযন্ত্রের আঘাতে ভাস্কর্যরূপে এবং সুরশিল্পীর কণ্ঠে স্বরের ব্যঞ্জনায় সংগীতরূপে; একেরই তিনটি রূপে বিকাশ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর মধ্য দিয়ে। সংগীত চারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান; তা প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে আনে আনন্দ, শান্তি ও চিরসান্ত্বনা।

—ত্রয়োদশ আলোচনা—

ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা

ভারতের সকল-কিছুই নিন্দিত ও অবহেলিত এটাই ছিল সুদীর্ঘকাল ধ'রে পাশ্চাত্যবাসীদের ধারণা। সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পবিত্রতা ও সভ্যতার ঐতিহ্যকে কোনোদিনই তাঁরা স্বীকার করেন নি। পরাধীন অবজ্ঞাত প্রাচ্যজাতির সমাজ যে ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের অপার্থিব রূপকে গড়ে তুলতে পারে একথাও তাঁরা স্বপ্নে বা কল্পনায় কখনো ভেবে উঠতে পারেন নি। ভারতবাসী থাকবে চিরদিন কৃপা ও করুণার পাত্র হোয়ে এটাই ছিল যেন তাঁদের ধারণা ও জন্মগত বিশ্বাস! স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোর তথা পাশ্চাত্যের অভিযান তাই হয়েছিল সেই বদ্ধমূল কলঙ্কময় ধারণার মূলে বিষম কুঠারাঘাত। স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, ত্রিগুণাতীত এই বিজ্ঞানদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ করেছিলেন তাই পাশ্চাত্যবাসীদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভ্রমধারণার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিপুল সংগ্রাম, আর সাথে সাথে তাঁদের সংস্পর্শে প্রচারিত ও সংপ্রসারিত হয়েছিল বেদান্তের ধর্ম ও শিক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বজনীন উদার মতবাদ ও বাণী এবং সর্বোপরি ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও সত্যিকারের কাহিনী।

আমেরিকার ব্রুক্‌লিন ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বামী অভেদানন্দ তাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভারতের মহিমময় রূপকে পরিপূর্ণভাবে তেজোদ্দীপ্ত বীর সন্ন্যাসীর মতন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছিলেন তাঁর অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্ক-রূপ সুতীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্যে পাশ্চাত্যের সকল-কিছু অন্যায় ও অবিশ্বাসকে। ভারতের মহিমোজ্জ্বল মূর্তি ও সুপ্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন কোরে নব্যভারতের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পিপ্‌ল্' ('ভারতীয় সংস্কৃতি') বক্তৃতার পূর্বাভাসে তাই তিনি বলেছেন: "My main object has been to give an impartial account of the fact from the standpoint of an unbaised historian, and *to remove all misunderstandings* which prevail among the Americans concerning India and her people ;"—'ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য সপ্রমাণ করার জন্যে নিরপেক্ষ একজন ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজ আমেরিকাবাসীদের সামনে আমি দাঁড়িয়েছি; উদ্দেশ্য ভারতের সকল-কিছুর সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জীর নজিরে পাশ্চাত্যের হীন ও বিসদৃশ ধারণার সংস্কার সাধন করা'।

আমেরিকার ব্রুক্‌লিন ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রদত্ত 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্' বক্তৃতাগুলিতে স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মোটেই বাইরে থেকে আসে নি, ভারতবর্ষই বিশ্বসভ্যতার আদিভূমি। প্রাচীন কাল্‌দিয়া, ফিনিসিয়া, মেসোপটেমিয়া, বাবিলোন বা পারস্যবাসীদের অনেক আগে ভারতের অধিবাসীরাই ঠিকঠিকভাবে বিশ্বরহস্যের কারণ অনুসন্ধান করতে পেরেছিল। থেলিস, হেরাক্লিটাস, পারমেনাইডেস্, এ্যানাক্সাগোরাস্, জেনো, পাইথাগোরাস্,

সক্রেটিশ, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, বার্কলে, হিউম, স্পিনোজা, কাণ্ট, শেলিঙ, ফিক্টে, হেগেল, সোপেনহাওয়ার, হার্বার্ট স্পেন্সার, ব্রাডলে, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা যে-সত্যের আবিষ্কার কোরে ধর্ম ও দর্শনের জগতে যশস্বী ও অমর হয়েছেন, ভারতের তপোবনে ধ্যান-সমাহিত ঋষিরা সেই অবিনশ্বর সত্যকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কোরে তাঁদেরও বহুপূর্বে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যে তা দান কোরে গেছেন। ভারতের সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভারতে কুমারিল, শংকর, পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, মধুসূদন, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, ভাস্করাচার্য, বলদেব, অভিনবগুপ্ত, ভাস্কররায় প্রভৃতি আচার্যগণের অবদানও গৌরবোজ্জ্বল। গ্রীসে এ্যারিষ্টটল্ ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মবিশ্লেষণ কোরে যুক্তি ও তর্কের জগতে যেমন গৌরব অর্জন করেছিলেন, ভারতবর্ষে তেমনি অক্ষপাদ গৌতম প্রাচীনন্যায় ও বঙ্গকুলতিলক রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, মথুরানাথ, গদাধর প্রভৃতি নব্যন্যায়ের আরো সূক্ষ্মবিচারের অবতারণা কোরে বিশ্বের সাহিত্যভাণ্ডারে এক অভিনব দান দিয়ে গেছেন। তাছাড়া শিল্প, সংগীত ও ভাস্কর্যের দিক থেকে ভারতবর্ষের অবদান সত্যই অতুলনীয়। অজণ্টা, বাগগুহা, ইলোরা, সাঁচী, বারহুৎ, কাঙড়া উপত্যকা, মথুরা প্রভৃতির চিত্রকলা ও কারুকার্য পৃথিবীর যেকোন দেশের শিল্পসম্পদের চেয়ে যে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তা ঐতিহাসিকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

ভারতে জাতি ও বর্ণ-বিভাগ, তাদের উৎপত্তি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ ধারাবাহিক ও তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন। ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক ঘটনার প্রসংগকেও তিনি তাঁর অনুশীলন থেকে বাদ দেন নি। বৈদিকযুগের সভ্যতায় আর্যদের স্থান কত মহান্ ছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহে ও রাজ্যশাসনপ্রণালীতে তাদের কোন বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক ধারার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, অস্ত্রের ব্যবহার কিরকম ছিল—এসবের ইতিহাস ও প্রমাণপঞ্জী তিনি বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি থেকে দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ তথা ভারতের স্বর্ণযুগে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন কিরকম ছিল, সম্রাট অশোকের সময়ে ধর্ম রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়েছিল ও তা কিরকম কোরে শুধু ভারতের সর্বত্র নয়—পৃথিবীর সকল দেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল—এসব বিষয়ও তিনি ঐতিহাসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথভাবে আলোচনা করেছেন।

'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপল্' ('ভারতীয় সংস্কৃতি') বক্তৃতাগুলির ভিতর স্বামী অভেদানন্দের অতুলনীয় অবদান "ইনফ্লুয়েন্স অব ইণ্ডিয়া অন্ ওয়েষ্টার্ণ সিভিলিজেসন এ্যাণ্ড দি ইনফ্লুয়েন্স্ অব ওয়েষ্টার্ণ সিভিলিজেসন অন্ ইণ্ডিয়া" আলোচনাটি। এই আলোচনাতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব ও আদানপ্রদান কি ধরণের ছিল এটাই তুলনা-মূলকভাবে দেখাবার তিনি চেষ্টা করেছেন। এই আলোচনায় তাঁর অপূর্ব মনীষা, পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় জাতি ও সমাজই সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা ধর্ম দর্শন ও সকল-কিছু বিষয়ে একে অপরের কাছে কিভাবে ঋণী, ভারতের বাণীমূর্তিরূপে

স্বামী অভেদানন্দই বোধহয় সর্বপ্রথম (১৯০৬ খৃঃ) পাশ্চাত্য জগতের সামনে তার নিদর্শন ঐতিহাসিক নজিরের সাথে হাজির করেছিলেন। ১৯৩৬-১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর 'ইষ্টার্ণ রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ থট্' বক্তৃতায় তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্যবাসীর সামনে এই ধরণের আলোচনা উপস্থাপন কোরে ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে ছাপা 'দি লিগেসি অফ ইণ্ডিয়া' বইয়ে পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক এইচ. জি রলিন্‌সন্‌ও তাঁর সুচিন্তিত 'ইণ্ডিয়া ইন্ ইউরোপীয়ান্ লিটারেচার এ্যাণ্ড থট্' প্রবন্ধটিতে এই সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ঐতিহাসিক উপাদানপূর্ণ আলোচনাতে প্রমাণ করেছেন যে, সভ্যতার অরুণোদয় সর্বপ্রথম আরব পারশ্য গ্রীস কিম্বা অন্য কোন দেশে হয়নি, হয়েছিল একমাত্র ভারতবর্ষের দিক্‌চক্রবালে। প্লিনি, ষ্ট্রাবো, মেগাস্থিনিস্, হেরোদোতাস্, প্রোফাইরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরাও ভারতের ঐতিহ্য ও প্রাচীনতা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। পাইথাগোরাস্ গ্রীসে জ্যামিতিশাস্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন," কিন্তু পাইথাগোরাস্ জন্মাবার অনেক আগে এই জ্যামিতিশাস্ত্র ভারতবর্ষীয় সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 'শুল্বসূত্র' যীশুখৃষ্ট জন্মাবার আট শ' বছর আগে রচনা করা হয়েছিল। পাইথাগোরাস্ যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ও ভারতের কাছ থেকে জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তরবাদ বা পরলোকতত্ত্ব, সন্ন্যাসতত্ত্ব বা ত্যাগনীতি, নিরামিষ আহার ও পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছিলেন এই প্রমাণের মোটেই অভাব নেই। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকে চারটি ভূত: ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বাতাসের কথামাত্র জানত, পরে পাইথাগোরাসের কাছ থেকে আকাশতত্ত্বের কথা তারা জেনেছিল। বীজগণিতের সম্বন্ধেও তাই। ১১১৪-১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্যই প্রথমে ভারতে বীজগণিতশাস্ত্র আবিষ্কার করেন। ক্রমশঃ খৃষ্টিয় ৮ম শতাব্দীতে আরবেরা তাকে অনুবাদ কোরে পাশ্চাত্য জগতের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল। লিওনার্ডো-দা-পিসাই বলতে গেলে, ১৩শ শতাব্দীতে সেই বীজগণিতশাস্ত্র ইউরোপ মহাদেশ প্রচার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাও তাই। চীন ও আরববাসীরাই প্রথমে ভারতবর্ষ থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র ধার কোরে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়।

সংগীতবিদ্যার জন্মও ভারতবর্ষে। ভারতের তপোবনে সামগান আর্চিক গাথিক সামিক স্বরান্তর ওড়ব ষাড়ব ও সংপূর্ণের আকারে প্রচলিত ছিল। এগুলিই বৈদিক সংগীত। সামপ্রাতিশাখ্যকার পুষ্পর্ষি শাখা ও সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সামগান তথা বৈদিক সংগীতের কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাকার নারদের অভিমতও তাই। সামগানে সাতস্বরের প্রচলন ছিল ও তাদের নাম ছিল ক্রুষ্ট প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্দ্র ও অতিসার্য। নারদীশিক্ষার নারদ ও বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ন সে স্বরগুলিকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর বোলেও পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের সামগানই বিশ্বসংগীতের মূল উৎস। ভারতবর্ষ থেকে সংগীত যায় আরবদেশে, আরবদেশ থেকে গ্রীস ও রোমের চার্চগুলিতে এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলির ভিতর।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ শ্রমণ বা সন্ন্যাসীরা যেমন ধর্মচিন্তার অবসরে সাংস্কৃতিক অবদান হিসাবে অজন্টা প্রভৃতি গুহায় ফ্রেস্কো চিত্রকলার রূপদান করেছিলেন, গ্রীসিয় ও রোমীয় চার্চের খৃষ্টান-সন্ন্যাসীরাও তেমনি পাশ্চাত্য ললিতকলার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছিলেন। য়ুরোপীয় চার্চের সন্ন্যাসীরা সর্বপ্রথম তাঁদের দেশের (পাশ্চাত্য) সংগীতের স্বরলিপি (Notation) আবিষ্কার করেছিলেন।[১] কেউ কেউ বলেন, পাইথাগোরাসই সর্বপ্রথম সংগীতে তিনটি সপ্তকের প্রচলন করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। পাইথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকেই যে তিনি তিন সপ্তকের (three octaves) ধারণা পেয়েছিলেন একথা অতীব সত্য। য়ুরোপীয় সংগীতে 'অক্‌টেভ' (octave) বা আটস্বরের সমষ্টি ভারতবর্ষীয় সংগীতের 'সপ্তক' বা সাতস্বরের সমষ্টির অনুকরণ। মোটকথা ভারতেতর দেশগুলির সংগীতের মূল উৎস ভারতীয় বৈদিক সামগান বা সামগীতি।[২]

সংগীত ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র ও রোগনিয়ামক ঔষধাদির প্রথম উদ্ভাবনা আসলে ভারতবর্ষের মাটিতে হয়েছিল। গ্রীসবাসী চিকিৎসক হাইপোক্রেটস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যার ধারা শিক্ষা করেছিলেন। ৩২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য আসেন তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ভারতীয় চিকিৎসকেরা

১। "Musical establishments were founded in connection with monasteries. The venerable Bede, an English monk * *, was a noted musician. * * The monks of the time were musicians themselves, * *. Walter Odington, a monk of Evesham, who flourished in the thirteenth century in the reign of Henry III, wrote a treatise on music from which it may be gathered that the notes were expressed by the first seven letters of the alphabet—* *, and is said to have been the first to suggest a shorter note than the *semi-breve*, * * In the time of Chaucer (132-1400) * * his monk, nuns and friars are all vocalists; * *."—স্যার এস. এম. ঠাকুর: 'ইউনিভার্সাল হিষ্ট্রী অব মিউজিক' (১৮০০), পৃ: ২৫৮—২৫৯

২। স্বামী অভেদানন্দ উল্লেখ করেছেন: "The Hindus first developed the science of music from the chanting of the Vedic hymns. The Sâma Veda was especially meant for music. And the scale with seven notes and three octaves was known in India centuries before the Greeks had it. Probably the Greeks learned it from the Hindus. It will be interesting to you to know that Wagner was indebted to the Hindu science of music, especially for his principal idea of the 'leading motive'; and this is perhaps the reason why it is so difficult for many Western people to understand Wagner's music. He became familiar with Eastern music through Latin translations, and his conversation on this subject with Schopenhauer is probably already familiar to you".—(১) 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার্ পিপ্‌ল্', পৃ: ২২১; (২) প্রজ্ঞানানন্দ: 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৫), পৃ: ৩৯—৪৫; (৩) প্রজ্ঞানানন্দ: 'এ ফরগটন্ চ্যাপ্টার অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক'—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (পূজা-এ্যানুয়েল, ১৯৫০), পৃ: ১৩২—১৫৮

অনেকে তাঁর সাথে ছিলেন। ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস, নেয়ার্কস ও আরিয়ান্ এঁরা হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যার শতমুখে প্রশংসা কোরে গেছেন।

দর্শনজগতেও ভারতবর্ষের দান অপরিসীম। গ্রীক দার্শনিকদের মুকুটমণি প্লেটো ভারতীয় তথা সমগ্র এসিয়া ও য়ুরোপের ভাবধারাদ্বটির সমন্বয় করেছিলেন। প্লেটোর বর্ণিত 'পর্বতগুহায় বন্দী মানুষদের ছায়া'-র ('Men in the Cave'—*Republic*, Bk. VII) উপাখ্যান বেদান্তদর্শনের মায়ার নিদর্শনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্লেটো ঔপনিষদিক ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গ্রীসের দার্শনিক থেলিস্, পারমেনাইডেস, প্রোটাগোরাস সকলে এবং ইলিয়েটিকসম্প্রদায় ভারতের ঔপনিষদিক ভাবধারা গ্রহণ কোরে তাঁদের মতবাদ পরিপুষ্ট করেছিলেন। মনীষী মোক্ষমূলার ও পণ্ডিত হপ্‌কিন্স্ বলেছেন, এনাক্সামিণ্ডার ও হেরাক্লিটাসের মতবাদ গ্রীসদেশের নিজস্ব নয়, ভারতবর্ষীয় বেদান্তের ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের ভিতরেই বরং সে ভাবের প্রথম বিকাশ দেখা যায়। আলেকজাণ্ডার-দি-গ্রেট কর্তৃক ভারত অভিযানের পরই ভারতবর্ষ ও গ্রীসদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও শিক্ষানৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। দার্শনিকদের অনেকে এথেন্স ও গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসবাস করতেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের 'জিমনোসফিষ্ট্' বা 'ভারতীয় দার্শনিক' বোলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক গার্বের অভিমতও তাই। তিনি মরমী দার্শনিক প্লটিনাসের ভিতরেও ভারতীয় ভাব-মন্দাকিনীর উজান দেখতে পেয়েছিলেন। প্লটিনাসের শিষ্য প্রোক্লাস এবং প্রোফাইরি ভারতীয় দার্শনিকদের মতন আত্মা ও পরমাত্মার মিলনকে 'যোগ' বলেছেন। তবে হিব্রু, পারসিক ও ইজিপ্টবাসীদের মধ্যে যোগসাধনের কোনরকম নিয়ম প্রচলিত ছিল না। প্লেটো ও তাঁর মতানুবর্তী নবাপ্লেটোবাদীগণ, ষ্টোয়িক ও আলেকজান্দ্রিয়ার ফাইলোর ভিতর দিয়েই ভারতীয় দর্শনের ভাব পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া প্লেটো, ফাইলো প্রভৃতি মনীষীদের প্রবর্তিত 'লোগাসতত্ত্ব' * যে পরে চতুর্থ গস্‌পেলে স্থান পেয়েছিল তার আসল জন্মভূমি হলো ভারতবর্ষে।

কিন্তু একথা সত্যি যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরাই সাইবেরিয়া থেকে সিংহলে, চীনদেশ থেকে ইজিপ্ট, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। ইহুদীসম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা এসেনিদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ভাবধারা পুরোপুরিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমীয় ঐতিহাসিক প্লিনি (২৩-৭৯ খৃষ্টাব্দে) ও ফাইলো জুডিয়া এই এসেনিসম্প্রদায়ের সাধকদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন। যোসেফাসও এসেনিদের সম্বন্ধে বলেছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় একটু পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এসেনীরা ছিল নিরামিষাশী; ব্রহ্মচারীভাবে তারা থাকৃত, বিবাহ করত না, তন্ত্র ও যোগদর্শন অনুসারে তারা সাধনভজন করত, নির্জন নিভৃত স্থানে নিশাকালে তান্ত্রিক

*। এই লোগাসতত্ত্বকে ভারতীয় দর্শনে 'শব্দব্রহ্মবাদ' বলা হয়েছে। পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্য' এবং ভর্তৃহরি তাঁর 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে এই শব্দব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। এই লোগাসকে ওয়ার্ড, আইডিয়া, স্ফোট ও ওংকার ইত্যাদিও বলা হয়।

চক্রের অনুষ্ঠান করত। দার্শনিক শেলিঙ ও সোপেনহাওয়ার, খৃষ্টান মনীষী ডিন্ ম্যানসেল ও পণ্ডিত মিলম্যান এঁরা সকলে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় বৌদ্ধ তথা হিন্দুসন্ন্যাসীদের প্রভাব ও ভাবের প্রেরণা থেকেই এসেনী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল। আর্নেষ্ট রেণাঁর অভিমতও তাই। থেরাপুত্তবাদের ইতিহাসও একই রকমের। বার্লাম ও যোষাফটের কাহিনী আসলে গৌতম বুদ্ধের জীবনীর হুবহু অনুকরণ। জেকবস্ ও ওয়ালিশ বাজ্-প্রমুখ মনীষীরাও একথা স্বীকার করেছেন। বার্লাম ও যোষাফট্ বা ইউযুফ্ শব্দগুলি সম্বন্ধে জেকবস্ বলেছেন, বার্লাম বলতে খৃষ্টান সন্ন্যাসী সেণ্ট বার্লামকে অনেকে বুঝে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। বার্লাম 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটিরই অপভ্রংশ। সেণ্ট যোষাফট্ নামে একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসীও ছিলেন। আরবদের ইতিহাসে বার্লামের যুদাসাফ (Yudasaph) বা বুদাসাফ্ (Budasaph) নামেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় বার্লামের কাহিনীকে 'ফেবেলস অফ্ বিড্ফাই' বোলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যোষাফট্, যুদাসাফ, বা বিডপাই পরিভাষা বা শব্দগুলি আসলে গৌতম বুদ্ধের নামের পরিবর্তেই ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই আরব, প্যালেষ্টাইন, সাইবেরিয়া ও পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, আর তার ফলে ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টধর্ম-প্রভাবিত জাতিরা নিজেদের নিজেদের ভাব ও ভাষা দিয়ে গৌতম বুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা কোরে গেছেন।*

নষ্টিকস্ ও ম্যানিসিয়ানরাও বৌদ্ধধর্মের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। খৃষ্টানধর্মের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, খৃষ্টধর্মও বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রচার ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্রকে উপলক্ষ্য কোরে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতির আদানপ্রদান সকল দেশে সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য জগতের সাম্‌নে এইরূপে পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শ তথা ভারতের ত্যাগ, তপস্যা, অনুভূতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির ভাব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কোরে ভারতের আভিজাত্য, গৌরব ও পবিত্রতাকে স্বামী অভেদানন্দ যে সমগ্র বিশ্বের সাম্‌নে মহীয়ান্ কোরে তুলেছেন—'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্' বইখানি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

* * * *

যা দিয়ে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ে, বিবেক বিচার চরিত্র নৈতিকতা, স্বজন-আত্মীয় ও দেশ-দশের প্রতি কর্তব্যের চেতনা বৃদ্ধি পায়, ধর্ম ও

*। জোসেফ জেকবস্ এ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "This latter book received some such title as *Bhagavan Bodhisattvascha*, and was the original of our Barlaam. * * * The story of the conversion of the Bodhisattva by the Bhagavân was on the other hand, admirably adopted for propagandist interpolation and modification, and was therefore transformed by the Greek translator into the legend of St, Barlaam and St. Josaphat, as it afterwards spread through Europe".—Cf. Jacobs : *Barlaam and Josaphat* (1895), pp. liii-liv,

আধ্যাত্মিকতার দ্বার উন্মুক্ত হয় তাকেই শিক্ষা বলে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন: 'জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্যে মনের উন্নতিসাধনই প্রকৃত শিক্ষা' (—"Education is the training for completeness of life.")। স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, শিক্ষা মানুষের সুপ্ত চেতনা ও পূর্ণতাকে জাগ্রত করে। মানুষ স্বভাবতই পবিত্র শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞানতার বশে সে তা জানে না, শিক্ষা এই অজ্ঞানতা দূর করে। এছাড়া শিক্ষা জাতীয়তার বোধ ও চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, দেশ ও দশের ব্যক্তিত্বকে করে সচেতন। কতকগুলি ভাব, ধারণা ও উপদেশের একত্র মিশ্রণে মস্তিষ্কের ভিতর বিপর্যয় ও আলোড়ন সৃষ্টি করাই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ নয়। অজ্ঞান অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের ক্রমপরিণতিই প্রকৃত শিক্ষা। * * শুধু প্রতিভার উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার সত্যিকারের উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত শিক্ষা অর্থে জ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই আমাদের আধ্যাত্মিক পরিণতি ও বিকাশসাধনকে বুঝি।[৫]

স্বামী অভেদানন্দ ভারতের শিক্ষার কালকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন: (১) বৌদ্ধপূর্বযুগ বা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী, (২) বৌদ্ধযুগ বা যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পাঁচশত বৎসর পূর্ব থেকে খৃষ্ট জন্মাবার পরে দশম শতাব্দী পর্যন্ত, (৩) মুসলমান শাসনের আমলে, (৪) ইংরেজ শাসনের আমলে। কোন জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে গেলে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার।[৬] ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন দেশ, ভারতের পুণ্যাকাশেই সর্বপ্রথম বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অরুণোদয় হয়েছিল। শিক্ষার সম্বন্ধেও তাই। বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষার আদর্শে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভাব দিয়ে ছাত্রজীবন তৈরী করার রীতি ছিল। ছাত্রেরা গুরুগৃহে যথার্থ শিক্ষার আলোক পেয়ে হয় আদর্শ গৃহস্থ অথবা যথার্থ বানপ্রস্থী হোত।

জাতির শিক্ষার আদর্শ জাতীয় আদর্শের অনুযায়ী হওয়া উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,

"The object of education should be the attainment of perfection. That is the highest aim of education. In the Vedas we read of two kinds of *Vidyâ*: *Parâ Vidyâ* and *Aparâ Vidyâ*. *Aparâ Vidyâ* is that which explains the laws of nature and describes the causes of various phenomena; but *Parâ Vidyâ* is that by which one attains to Godconsciousness and that should be the aim of *Aparâ Vidyâ*."[৭]

শিক্ষার আদর্শ—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান লাভ করা। বেদে পরা ও অপরা বিদ্যার উল্লেখ আছে। অপরা বিদ্যায় জাগতিক জ্ঞান ও পরাবিদ্যায় অপার্থিব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয় কথার অর্থ—শিক্ষার পবিত্রোজ্জ্বল আলোকে মনে সৎ সংস্কারের সৃষ্টি

৫। অভেদানন্দ: (ক) 'আইডিয়াল অব এডুকেশন' (১৯৪৫), পৃঃ ১৩-১৪; (খ) 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম' (১৩৫৪), পৃঃ ১০-১১

৬। অভেদানন্দ: 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' (১৯৪০), পৃঃ ১৭০

৭। অভেদানন্দ: 'আইডিয়াল অব এডুকেশন' (১৯৪৫), পৃঃ ৩২

হয়, সৎ বা শুভ সংস্কার অসৎ বা অশুভ সংস্কারের বিদ্রোহী হোয়ে তাদের ধ্বংস করে এবং তখনি আনন্দময় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিকাশ হয়।

স্বামী অভেদানন্দ শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবান করতে বলেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বল্‌তে বুঝায়—মাত্র জন্মের পরে নয়, জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে যে ভাষা সন্তানেরা তাদের মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা পায় তাই 'মাতৃভাষা'। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুসন্তান সমগ্র চিন্তা ও ভাবধারা উত্তরাধিকারী-রূপে তার মায়ের কাছ থেকে গ্রহণ করে। যে ভাষায় মা কথা বলেন, যে ভাষার মাধ্যমে মা চিন্তা করেন, সন্তানগণ সেই ভাষায় কথা কইতে ও চিন্তা করতে চেষ্টা করে।[৮] ভাষাই ভাবের বাহক বা মাধ্যম। কিন্তু ভাষা ও সকল কাজের মূলে থাকে ভাব, ভাবের অভিব্যক্তিই সকল প্রাণীর ভাষা ও কার্যের আকারে প্রকাশ পায়। তাই ভাষা ও ভাব এই দু'য়ের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ। শিশুসন্তানেরা যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখনি তাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কোষগুলি গঠিত হয়, সুতরাং সাথে সাথে বীজাকারে তাদের মধ্যে ভাবেরও সৃষ্টি হয়। মায়ের ভাবের সাথে শিশুর মনোভাবের যোগাযোগ থাকে, তাই মা যে-ভাষায় কথা কন বা যে ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করেন, সন্তানের মনোভাবও ঠিক সেইভাবে গঠিত হয়। সুতরাং শিশুসন্তানদের শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যমই মাতৃভাষা।

স্বামী অভেদানন্দ সংস্কৃতকে সকল ভাষার আদিকারণ বা জননী এবং ভাষা হিসাবে ইংরেজীকে অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বলেছেন। কেননা ইংরেজীতে ব্যাকরণের অনেক নিয়মই সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে লক্ষ্য করা হয় না; যেমন, To—টু এবং Go—গো, অথবা Though—দো এবং Cough—কাফ্। এখানে 'O' এবং এবং 'Ough' বর্ণগুলির উচ্চারণভঙ্গীতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিমাণে আছে। সংস্কৃত ভাষায় ততবেশী জটিলতা নেই।[৯] পরিশেষে শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,

"Whether you learn English or any other language you must remember that the highest ideal of all education is the attainment of Godconsciousness. Then and then only we will realise that we are the children of immortal bliss. Then and then only we shall gain true happiness in this world and after death we shall enter the abode of supreme happiness, eternal bilss and everlasting life."[১০]

৮। ঐ, পৃঃ ৪৪-৪৫

৯। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আইডিয়াস অব এডুকেশন' (১৯৪৫), বইয়ের 'প্র্যাক্‌টিকাল এডুকেশন' প্রবন্ধে' এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, পৃঃ ৫৬-৫৭। এছাড়া 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' বইয়ে 'এডুকেশন ইন্ ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৭০-২১৫

১০। অভেদানন্দ: 'আইডিয়াল অব এডুকেশন', পৃঃ ৬৯

—চতুর্দশ আলোচনা—

সমাজ ও নারীজাতি

'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম' বইখানিতে 'শিক্ষা ও সমাজ' লেখাটা স্বামী অভেদানন্দের মৌলিক বাংলা রচনা, যদিও বক্তৃতার আকারে পেশ করেছিলেন তিনি এটি সর্বসাধারণের সামনে দার্জিলিঙ 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল্'-এ। প্রাচীন ও বর্তমান হিন্দুসমাজের বিবর্তন, অবস্থা ও আদর্শ সম্বন্ধেই তিনি তাতে আলোচনা করেছেন। হিন্দুসমাজে জাতিবিভাগের উল্লেখ কোরে তিনি বলেছেন : "বর্তমান সময়ে জন্মগত জাতিবিভাগ গুণ ও কর্মগত জাতিবিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈদিক সময়ে গুণগত ও কর্মগত জাতিবিভাগই ছিল। ইহা এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে বৈদেশিকগণের আক্রমণের সময় হিন্দুসমাজে সঙ্কীর্ণতা (conservatism) প্রবেশ করিলে সেই সময় হইতে ঐ সমস্ত প্রবল বৈদেশিকদের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality) রক্ষা করিবার জন্ম জন্মগত জাতিবিভাগের সৃষ্টি হয়। ইহা যদি না হইত তাহা হইলে হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্মের আজ বোধহয় অস্তিত্বও থাকিত না"।[১] মোটকথা স্বামী অভেদানন্দ জাতিবিভাগ পছন্দ করেন লোকের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী। কেননা তাঁর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তই তাই যে, "সুতরাং বর্তমানে বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদের কথা বলিলে তাহা এই সময়ের উপযোগী গুণ এবং কর্মের অনুযায়ীই হওয়া উচিত। যেমন, যিনি ধর্মসাধন ও পুরোহিতের কাজ করিবেন তিনিই ব্রাহ্মণ। যে সৈনিক হইবে সেই ক্ষত্রিয়, যে ব্যবসা করিবে সেই বৈশ্য এবং যে পরের চাকরী বা দাসত্ব করিবে সেই শূদ্র। ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সভ্যদেশে এইরূপেই বর্ণ বা জাতির বিভাগ প্রচলিত আছে। পাদ্রী, পুরোহিত বা clergyman-এর সন্তান যে পুরোহিত বা clergyman-ই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; অথবা সেনাপতির সন্তানকে যে যোদ্ধা হইতেই হইবে ইহারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। আমাদের প্রাচীন ভারতের জাতিভেদের পদ্ধতি ঠিক এই রকমই ছিল। কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি ইহাঁরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম, অর্থাৎ সেনাপতির কার্য করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণের মর্যাদা পাইয়াছিলেন। সুতরাং বর্তমান যুগেও অব্রাহ্মণদের কাহাকেও ব্রাহ্মণের গুণে ভূষিত দেখিলে অথবা তাহাদের যজন যাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি-রূপ ব্রাহ্মণের কার্য করিতে দেখিলে কেন তাহাকে ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান দেওয়া হইবে না—এইরূপ প্রশ্নের কেহই সদুত্তর দিতে রাজী হইবেন না"।[২] প্রগতিশীল হিন্দুজাতি সমাজের কল্যাণ, বিস্তৃতি ও

১। অভেদানন্দ : 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম' (১৩৫৪), পৃঃ ৬৯

২। ঐ, পৃঃ ৭০-৭১

উদারতার মুখ চেয়ে নিজে জাতিবৈষম্য বিচার করবেন এটাই ছিল স্বামী অভেদানন্দের অভিমত।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সমাজ চিরদিনই গতিশীল, পরিবর্তন এর স্বভাব, সুতরাং সমাজকে স্থিতিশীল লৌহপ্রাচীরবেষ্টিত কোন প্রাসাদ বোলে মনে করলে নিতান্ত ভুল করা হবে। বৈদিক কালে সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, বৈদিকোত্তর যুগে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যযুগেও তাই, বর্তমান যুগের তো কথাই নাই। দেশ ও কালের অবস্থা অনুযায়ী সমাজের রূপ-বিবর্তন ঘটে এবং ঘটাই স্বাভাবিক। বরং পরিবর্তনই সমাজের প্রাণ। উদার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজপতিদের সমাজব্যবস্থা করা উচিত। নূতন কোরে আবার সমাজ-শাসনব্যবস্থা-রূপ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণয়ন করা কর্তব্য। দেশ ও সমাজ ক্রমশই অগ্রগামী, তা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, সুতরাং সমষ্টি-কল্যাণের দিকে নজর রেখে সমাজের সংস্কারসাধন চিরদিনই চলবে অব্যাহত থাকবে।

ধর্মকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন ঊষর মরুভূমির সমান সমাজ-জীবনেও তেমনি ধর্মকে বাদ দিলে তা হয় নিরর্থক। সমাজজীবনে শিক্ষা, সংযম ও কর্তব্যপালনের মতন বিবাহেরও উপযোগিতা আছে। অবশ্য চতুরাশ্রমবিহিত জীবন সকল যুগেরই আদর্শ। বিবাহের উদ্দেশ্য পার্থিব ভোগসুখ অথবা দেহের উপর অধিকার স্থাপন করা নয়, পুরুষ ও নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় পারস্পরিক সাহায্যের, সহানুভূতির ও ভাবের আদানপ্রদানের ভিতর দিয়ে যথার্থ কল্যাণকে বরণ করার জন্যে। অধ্যাত্মভাবের প্রেরণা ও ভাই-বোন এই মধুর মৈত্রীসম্বন্ধ যদি থাকে বিবাহিত জীবনের পশ্চাতে, তবেই বিবাহের উদ্দেশ্য হয় সাধিত এবং পুরুষ ও নারীর জীবন হয় যথার্থ সুখশান্তিলাভের ভিতর দিয়ে শাশ্বত কল্যাণের অধিকারী।

সমাজে আহারাদির ও জাতীয় একতার বিচারপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'আহারাদি বরং নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী করা ভাল এবং সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার বৈষম্য থাকিলেও জাতীয় একতার তাহাতে কিছুই হানি হইবে না, কেননা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষই হইল জাতীয় একতার পরমশত্রু। * * অন্তরে ঘৃণা না থাকিলে এবং 'আমি অপরের অপেক্ষা অনেক বড়' এই অভিমান হৃদয়ে না রাখিলে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব (friendliness) অবশ্যই অব্যাহত থাকে। এই গুণগুলিই হইল একতার ভিত্তিস্বরূপ'।[৩] এ'ছাড়া আহার, ব্যবহার ও বিচার-আচার নিয়ে বাড়াবাড়ি করায় তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলতেন: 'নিজ নিজ প্রবৃত্তি লইয়াই কথা। ভাল না লাগিলে একসঙ্গে সকলে না খাইতেও পার, কিন্তু তাই বলিয়া একজাতি অপর জাতিকে যে ঘৃণা করিবে ইহা অত্যন্ত অন্যায়। ইহা হইতেই সমাজের অধঃপতন হইয়া থাকে'।

আহারে বাচ-বিচার করা কতটুকু সমীচীন সে-সম্বন্ধে উল্লেখ কোরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, একই নিয়ম সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রচলিত হোতে পারে না।

৩। অভেদানন্দ: 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম', পৃঃ ৭২

আহারের উদ্দেশ্য শরীরধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা করা, আচার পালন করা নয়। যা খেলে সহজে হজম হয়, স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতিকর হয় না, তা আমিষই হোক আর নিরামিষই হোক, তাই সুখাদ্য ও আহারের উপযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: যে ব্যক্তি গোমাংস খেয়েও ভগবানে মনকে ঠিক রাখ্‌তে পারে সে হবিষ্যাশী বিষয়াসক্ত লোকের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষমতালোলুপতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনাই সমাজের অগ্রগতিকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সুতরাং "কুসংস্কার যতদিন না আমরা দূর করিতে পারিতেছি—ততদিন আমাদের দেশের এবং নিজেদের কল্যাণ হইতে পারে না। যতদিন আমাদের হৃদয়ে প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর, আমাদের ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ঘৃণার ভাব থাকিবে, ততদিন পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ভাব আসিতে পারে না, আর ভালবাসা না থাকিলে জাতীয় একতার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব"। সমাজে জাতিভেদ ও গোত্রবৈষম্য থাকায় তিনি ব্যথিত, তাঁর অভিমতে, এতে সমাজের শক্তি দুর্বল হয়। যেমন, তিনি উল্লেখ করেছেন: "ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতিদের ভিতরেও শ্রেণীগত অনেক বৈষম্য আছে। একগোত্র আবার অন্য গোত্রে কখনও বিবাহ দিবে না, অথবা সেই গোত্রের লোকের সহিত আহার করিবে না। এইরূপ এক এক জাতির ভিতরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ আছে। ব্রাহ্মণদের ভিতর তো রাঢ়ী, বারেন্দ্র, কনৌজ, মৈথিলি, দক্ষিণী এইসব অনেক ভেদ আছে। গোত্রের তো কথাই নাই, সুতরাং ঐ অবস্থায় একতা কিম্বা মনের মিল সকলের ভিতর কিরূপে হইতে পারে? অখণ্ড হিন্দুজাতিকে আমরা এইরূপে খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছি, অথচ অখণ্ডের ভাণ করিতে আমরা কখনও পশ্চাদ্‌পদ নহি"।

স্বামী অভেদানন্দের অভিমতে, বর্ণবৈষম্য থেকে সমাজে ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং সেই ঘৃণাই সমাজের কল্যাণকে নষ্ট করে। ধনী বা উচ্চবর্ণের লোকেরা দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সমাজের প্রাণ। উচ্চ-বংশের অভিমানসম্পন্ন শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত হিন্দুদের মানুষ বোলে গণ্য করতে চান না, সেজন্যে নিম্নশ্রেণীর লোকে হিন্দুসমাজে আজও পর্যন্ত পতিত ও লাঞ্ছিত হোয়ে রয়েছে। অথচ তারাই আমাদের জাতির ও সমাজের মেরুদণ্ড। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারাই আমাদের পেটের অন্ন জোগাচ্ছে, কিন্তু তাদেরি আমরা আবার সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, তাদের দেখ্‌তে পর্যন্ত পারি না। প্রকৃতপক্ষে এরই নাম অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও আত্মাভিমান। কিন্তু একথা অতীব সত্য যে, যাদের আমরা ছোট ও অবজ্ঞাত বোলে মনে করি, তারাই একদিন সমাজের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে হিন্দুসমাজকে আবার নূতন কোরে গড়ে তুল্‌বে ও মহাশক্তিমান জাতিতে পরিণত করবে।[৪]

৪। এ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম' পুস্তক এবং 'ইণ্ডিয়া এণ্ড হার পিপ্‌ল' বইয়ে 'দি সোসাল ষ্ট্যাটাস্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান পিপল: দেয়ার সিষ্টেম্ অব কাষ্ট' (পৃঃ ৮৭-১১৫) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বের নারীজাতিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন দিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ-প্রমুখ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা সেই দানকেই পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। নারীজাতি পুরুষের ভোগ্যা নন, সম্মানীয়া পূজ্যা—একথার উল্লেখ পেয়েছি বৈদিক সাহিত্যে, কিন্তু বর্তমান যুগে প্রত্যক্ষভাবে সেই আদর্শকে রূপায়িত দেখতে পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনে। স্বামী অভেদানন্দও বলেছেন, নারী আদ্যাশক্তি। নারীরা যতদিন পর্যন্ত না সমাজের শীর্ষস্থানে এসে দাঁড়াচ্ছেন ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ-রূপে শ্রদ্ধালাভ করছেন ততদিন সমাজের যথার্থ কল্যাণ নাই। সৃষ্টির প্রভাতে প্রজাপতি নিজের শরীরকে দুভাগ কোরে সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও নারী। বৈদিক সমাজে পুরুষ ও নারীর ছিল সমান অধিকার। যজ্ঞভাগ নারীরা পেতেন অর্ধেক, পরিষদে শাস্ত্রের আলোচনায় নারীরাও বসতেন অগ্রণী হেয়ে, ধনী-নির্ধন নারীজাতীর সম্মানকে রাখতেন অক্ষুণ্ণ। মধ্যযুগে নারীরা করেছেন দেশশাসন, রাজ্যরক্ষার জন্যে সম্মুখসমরে দিয়েছেন আত্মবলিদান। কিন্তু এ'সবের নজির কেবল বাগ্‌চাতুর্য ও লেখনীর ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেই চল্‌বে না, বর্তমান যুগের সমাজেও সেই আদর্শকে অটুট রাখতে হবে। নারীরা যাতে সকল রকম শিক্ষা লাভ কোরে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে একযোগে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন করতে পারেন, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জগতে চলার পথ যাতে পরস্পরের সহায়তা লাভ কোরে সার্থক হয় তার চেষ্টা করা উচিত। এই চেষ্টা অবশ্য একদিক থেকেই হবে না, পুরুষ ও নারী উভয়েই উভয়কে করবেন সাহায্য, উভয়েই উভয়ের পথের হবেন দিক্‌দর্শন-কারী, তবেই সমাজ ও সংসার হবে আনন্দময়, দেশ ও দশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী হবেন প্রসন্না, বিশ্বের দরবারে স্বদেশের মহিমা থাকবে গৌরবোজ্জ্বল হোয়ে। "নারীজাতি সকল দেশেই সমান। জননীর হৃদয়ে বীরভাব ও নির্ভীকতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ বর্তমান থাকিলে তবেই সন্তানগণ সেই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে। জননীরা যদি দুর্বল ও ভীতা হন তাঁহাদের সন্তানেরাও দুর্বল ও ভয়শীল হইবে। সেজন্য মনু বলিয়াছেন: 'একটি মাতা সহস্র পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ'। সুতরাং নারীদের শিক্ষিত করিতে হইবে। নারীরাই সমাজ ও জাতির মেরুদণ্ড। মহীয়সী নারীরাই বীর ও দেশপ্রেমিক সন্তানগণের জননী হইতে পারেন। সদ্‌গুণসম্পন্না নারীরাই দেশের যথার্থ কল্যাণ বরণ করিয়া আনেন।"[২]

অভেদানন্দ: (১) শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম' (১৩৫৪), পৃঃ ৭৬; (২) 'হিন্দুনারী'

উপসংহার

স্বামী অভেদানন্দের বহুমুখী প্রতিভার অবদান বড় কম নয়; বিচিত্র তার রূপ, বিশাল তার পরিধি। একদিকে যেমন গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি ধর্ম বিষয়ে, অপর দিকে তেমনি ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত-সাহিত্য, তুলনামূলক দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শিল্প, ললিতকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, রসায়নবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, জ্যোতি-বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রভৃতি সম্বন্ধে ছিল পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এই সকল বিষয়ের ওপরই তিনি দিয়েছিলেন বিশেষকোরে ইংরেজীতে বক্তৃতা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের সুধী ও বিদ্বদ্বর্গের সম্মুখে। দৃষ্টি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ, উদার, সুদূরপ্রসারী, বিচক্ষণ ও শিল্পীসুলভ; রুচি ছিল সূক্ষ্ম, সুমধুর ও বিশ্লেষণমূলক, ভাব ছিল প্রসন্ন অথচ গম্ভীর; চিন্তাধারা ছিল সতেজ, সুস্পষ্ট ও চিরসম্ভাবনাপরিপূর্ণ; ভাষা ছিল স্বচ্ছ, সাবলীল ও অনাড়ম্বর এবং স্বভাব ছিল সুমিষ্ট, অমায়িক ও আনন্দময়। পার্থিব বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল যেমন বিচিত্র, অপার্থিব আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি ছিল তেমনি প্রশান্ত-মহাসাগরের মতন সীমাবিহীন অনন্ত সুগভীর।

দর্শনজগতে তাঁর দান অভিনব—কি অচলায়তন গতানুগতিকতারই পুনরাবৃত্তি—এই প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনার অবসরে। প্রকৃতপক্ষে নূতন বা অলৌকিক কোন মতবাদ গড়ে তোলার তিনি চেষ্টা করেন নি, তবে চিন্তা, অনুশীলন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছিল তাঁর নূতনত্বের দান এবং অগ্রগতির তিনি ছিলেন বিশেষ পক্ষপাতী। নূতন কোন দর্শন বা দার্শনিক মতবাদ তিনি গড়ে না তুল্লেও প্রকাশভঙ্গী ও বিশ্লেষণী নীতি ছিল তাঁর সত্যই অপূর্ব ও অভিনব। যুক্তি ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সকল-কিছুকে যাচাই করার মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে থাকলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে তিনি বলেছেন—সত্য-নির্ধারণের পথে সকল জিনিসের মাপকাটি। পুরাতন ও নূতনের, প্রাচীন ও বর্তমানের সমন্বয় সাধন কোরে তাই নূতন একটি অবদানের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার জগতে। মন ছিল তাঁর উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ, কিন্তু অসত্য ও অযৌক্তিক সকল-কিছুর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। জীব-জগৎ, জড়-চৈতন্য সৃষ্টি-ভগবান, ব্রহ্ম-মায়া ধর্ম-সাধনা এই সকল বিষয় ও তত্ত্বের অবতারণা তিনি করেছেন পূর্বগামীদেরই মতন, কিন্তু সব-কিছুর প্রকাশভঙ্গী ও ব্যাখ্যানপ্রণালীর মধ্যে আছে একটি স্বকীয়তা, সবলতা ও নূতনত্ব। সকল জিনিষের মধ্যে তিনি ছিলেন সমন্বয়সাধনের পক্ষপাতী, তাই শংকরকে দিয়ে রামানুজকে, ব্রহ্মবাদ দিয়ে বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদকে, প্রাচ্যকে দিয়ে পাশ্চাত্যকে, বেদান্তকে দিয়ে তন্ত্রকে, অথবা জ্ঞানকে দিয়ে ভক্তি বা কর্মকে তিনি অযথা খণ্ডন করেন নি, বরং প্রত্যেককেই দেখেছেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,

প্রত্যেকের যথাযোগ্য ভূমি থেকে প্রত্যেককেই দিয়েছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান, আর সাথে সাথে প্রত্যেকের অযৌক্তিক ও অনুদার যা-কিছু তাদের বিরুদ্ধ করেছেন তিনি গঠনমূলক সমালোচনা।

স্বামী অভেদানন্দের মন, প্রাণ ও আদর্শ ছিল তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত; শ্রীরামকৃষ্ণময় ছিল তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর দার্শনিক চিন্তার সুরম্য প্রাসাদ সুপ্রষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই অধ্যাত্ম চিন্তা ও ভাবধারার ভিত্তির ওপর। মোটকথা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানেরা ছিলেন তাঁদের অলোকসামান্য আচার্যদেবেরই চিন্তা ও ভাবের জীবন্ত ভাষ্যকার ('They were living commentators of Bhagavân Sri Ramakrishna.') সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, ধর্মেতিহাস প্রভৃতি অনুশীলন করেছিলেন তা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বসমন্বয়মূলক ধর্ম ও ভাবকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বের দরবারে প্রচার করার জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমগ্র বিশ্বকে মরু-মরিচীকার মতন অসৎ বা মিথ্যা বলেন নি, অথবা শাশ্বত অনন্তকালস্থায়ীও বলেন নি। তাঁর মতে, ব্রহ্মই জীবজগৎ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন। শাঁস, বীচি ও খোলাকে বাদ দিলে যেমন বেলের সার্থকতা কিছুই থাকে না, তেমনি সকল-কিছুকে নিয়েই ব্রহ্ম পূর্ণ। জলেরই তরঙ্গ আবার তরঙ্গই জল, ব্রহ্ম সাকার আবার নির্গুণ ও নিরাকার। যে সাপ স্থির, সেই সাপই হয় গতিবিশিষ্ট। শিবই শক্তি হোয়ে বিকশিত হোলে হয় সৃষ্টি, আবার স্বরূপে তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। যে চূণ-সুরকী দিয়ে তৈরী, হয় বাড়ীর সিঁড়ি তাই দিয়েই আবার তৈরী হয় বাড়ীর ছাদ; সিঁড়ি ও ছাদ সাধারণতঃ আলাদা হিসাবে প্রতীত হোলেও উভয়ের উপাদান কিন্তু এক ও অভিন্ন। সিঁড়ি জ্ঞান আর ছাদ বিজ্ঞান; জ্ঞান বিশেষ ও বিজ্ঞান সামান্য; জ্ঞান সাধকের ব্যষ্টি-অনুভূতি আর বিজ্ঞান সমষ্টি-অনুভূতি, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বিজ্ঞান। আসলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান অভিন্ন, দেশ ও কালের ভেদ তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই, ভেদ বা তর-তম প্রতীত হয় আপেক্ষিক জগতের দিক থেকে। ব্রহ্মবস্তু এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয়, খণ্ড ও দ্বিতীয় প্রতীত হয় বিকাশে বা সৃষ্টির দিক থেকে। কিন্তু সকল বিকাশের অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্মই। আধার ও আধেয়ভেদ অজ্ঞানে, জ্ঞানে আধারও নাই, আধেয়ও নাই, সবই এক। দুটির অস্তিত্ব থাকলেই বিচিত্র সম্বন্ধের ধারণা আসে, যেখানে দুই নাই, সবই এক ও অদ্বিতীয়, সেখানে সম্বন্ধের কোন বালাই নাই। "আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং, সমুদ্রমাপ প্রবিশান্তি যদ্বৎ"—মহাপ্লাবনে খাল-বিল, নদ-নদী ও সমুদ্র সবই একাকার হয়। আসলে ব্রহ্মই সব-কিছু হয়েছেন—জীবজগৎ, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, নদনদী-সাগর, চন্দ্র-সূর্য-তারকা। অজ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্যকে নিয়েই, আবার জ্ঞানের সার্থকতাও ব্রহ্মচৈতন্যকে গ্রহণ কোরে; আসলে অজ্ঞান ও জ্ঞান দুয়ের অধিষ্ঠানই ব্রহ্ম। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,'—ব্রহ্মই বিশ্বচরাচরের আশ্রয়, ব্রহ্মসত্ত্বাকে নিয়েই সকল-কিছু সত্ত্বাবান। মোটকথা সকলের সার্থকতাই ব্রহ্মকে নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের মূলকথাই তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের এই সিদ্ধান্ত অধ্যাত্ম অনুভূতির চরমভূমিতে প্রতিভাত হয়। এই ভূমিতে 'সব শিয়ালের এক রা'। এই চরম উদারতার ক্ষেত্রে সকল মতবাদই

তাদের আপন আপন গণ্ডীকে বিসর্জন দিয়ে অখণ্ড অসীম ব্রহ্মসমুদ্রে মিলিত হয়, আর ঠিক তখনই হয় সকল দ্বন্দ্বের ও সকল সমস্যার চিরসমাধান। সর্বভাবের সমন্বয়মূলক শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের প্রতিধ্বনি কোরে তাই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,

"On that highest spiritual plane there is no distinction, no idea of separation, no idea of creation. All ideas of separateness, all differentiations of phenomenal names and forms, merge into the absolute ocean of reality which is unchangeable, eternal and one. ** The essence is like the all-pervading background of the phenomenal appearances. Phenomena are like the waves in the ocean of Infinite Reality. Individual souls are like so many bubbles in that ocean of Absolute Existence."

স্বামী অভেদানন্দের মতেও, পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় অথবা বৈচিত্র্য কেবল বিকাশে বা সৃষ্টিতে অনুভূত হয়, তাও অখণ্ড ব্রহ্মেরই বিকাশ বৈচিত্র্য—ব্রহ্মকে বাদ দিলে বিকাশ-রূপ সৃষ্টিবৈচিত্র্যেরও কোন অর্থই থাকে না। তবে নির্গুণ ব্রহ্মে সৃষ্টির কল্পনা নেই—"no idea of creation," সগুণব্রহ্মেই সৃষ্টির সার্থকতা, যদিও তা শাশ্বত নয়। পরিবর্তনশীল মায়িক আকারকে ছেড়ে দিলে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি থেকে মোটেই পৃথক নয়, জলবিন্দু যেমন জল ছাড়া অন্যকিছু নয়, প্রাণীমাত্রেই তেমনি ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, অথবা এক ব্রহ্মই বহু জীবরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন সৃষ্টির লীলাকে সার্থক করার জন্যে। মানুষ স্বরূপতঃ শিবই, ভুল ধারণার বশেই সে নিজেকে মনে করে পৃথিবীবাসী মরণশীল মানুষ হিসাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ সর্বদা সচেষ্ট স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে এবং যখনি সফল হয় অজ্ঞানতার সংকীর্ণ পরিধিকে অতিক্রম করতে তখনি সে সমর্থ হয় নিজের শাশ্বত দিব্যমহিমাকে উপলব্ধি করতে, আর তখনি আসে সার্থকতা তার সাধনায়, তার শাশ্বত চেষ্টায়। স্বামী অভেদানন্দ তাই বলেছেন,

"The tendency of the individual self of each man is not to remain confine with one narrow circle, but to go beyond the boundary of the circle of the animal nature, beyond human nature, and ultimately to become universal". ২

মানুষমাত্রেরই আত্মজাগরণ আসে, দিব্যচেতনার তার উদ্বোধন হয়, তবে কখন ও কিভাবে সেই জাগরণ আসে তা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু নিজের অপার্থিব শাশ্বত মহিমা প্রত্যেক মানুষ কেন, প্রত্যেক প্রাণীই একদিন-না-একদিন উপলব্ধি কোরে কৃতকৃতার্থ হয়:

"The awakening may come at any time and under any circumstances. One may be suddenly awakened in the midst of all the comforts, luxuries and

১। অভেদানন্দ: 'ডিভাইন হেরিটেজ অব ম্যান্' (১৯৪৭), পৃঃ ১২৮—১৩৯

২। ঐ, পৃঃ ১২৮

pleasures of the earthly life. No one can tell when or how such an awakening will come to the individual soul". ৩

স্বামী অভেদানন্দ মানুষের মধ্যে সহসা আত্মানুভূতির প্রদীপ জ্বলে উঠার উদাহরণ দিতেন সাঁতার অথবা সাইকেল শিক্ষার উপমা দিয়ে। তিনি বলতেন, সাঁতার বা সাইকেল শেখার সময় যেমন লোকে বলতে পারে না যে, ঠিক কোন্ সময়ে সে তা আয়ত্ত করবে, কিন্তু ক্রমাগত জলে হাবুডুবু ও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ হয়তো এক সময়ে শিখে ফেল্লে ও তা দেখে সে নিজেই স্তম্ভিত হোয়ে গেল: আত্মানুভূতির বেলায়ও তেমনি। একনিষ্ঠভাবে সাধনা বা চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ হয়তো কোন্ শুভমুহূর্তে দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ্ত প্রদীপ জ্বলে ওঠে এবং হাজার হাজার বছরের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর একটিমাত্র দেয়াশালাই কাঠির আলোতে মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হওয়ার মতন মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার চিরদিনের জন্যে দূরীভূত হয়:

"A room that has held darkness for thousands of years, a cave where darkness has been for thousands of years, is instantly illumined by the stroke of a match-stick—the darkness of thousands of years is dispelled". ৪

অনুভূতির প্রত্যক্ষপ্রকাশ ('Divine flash') হঠাৎ নিমেষের মধ্যেই মানুষের মধ্যে আসে, নির্দিষ্ট কোন দেশ বা কালের বিচার অথবা ব্যবধান তার মধ্যে থাকে না। অথচ এই অনুভূতি ঠিক 'accident' বা আকস্মিক ঘটনা নয়, কেননা আত্মচৈতন্যের জ্যোতি সর্বদাই প্রকাশমান, অন্ধদৃষ্টির জন্যেই মাত্র এই প্রকাশকে আমরা বুঝতে বা ধরতে পারিনি। একে সুষুপ্তি থেকে হঠাৎ জাগরণের সাথেও অনেক তুলনা করেন। দিব্যজাগৃতিও একে বলা যায়। স্বামী অভেদানন্দ এই জাগৃতি বা চেতনার জাগরণকে অদ্বৈতদৃষ্টিতে দেখেছেন। এই জাগরণই আত্মানুভূতি। তিনি আত্মানুভূতিকে 'মানুষের ক্রমবিকাশের শেষ বা চরমপরিণতি' বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বামী অভেদানন্দ মানুষমাত্রকে দেখিয়েছেন চিরসম্ভাবনাময়ী আশার প্রদীপ্ত দীপশীখা, নৈরাশ্যের অন্ধকার তাঁর ধর্ম ও দর্শনচিন্তায় নাই। তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আত্মানুভূতির নিবারণ মহিমোজ্জ্বল রূপ, তাই দর্শনে তাঁর ভাষা ও ভাবের কুজ্ঝটিকাবরণ বিন্দুমাত্রও নাই, বরং মেঘমুক্ত প্রদীপ্ত সূর্য-কিরণের মতন তারা সর্বদাই প্রকাশশীল ও স্বচ্ছ। তাঁর দর্শন বা চিন্তাধারা সর্বসাধারণের জন্যে, বনের বেদান্তকে ঘরে আনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, তাই প্রত্যেকটি মানুষের ব্যবহারিক ও দৈনিন্দিন জীবনের উপযোগী করাই তাঁর দর্শনের উদ্দেশ্য। জীবন্ত ও বাস্তব তাই তাঁর দর্শন, কেবলি যুক্তি ও তর্কের অভিযান নিয়ে তা নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে না। বুদ্ধির জয়যাত্রা তাই তাঁর দর্শনের চোখে নগণ্য, বোধির প্রত্যক্ষ পরিচয় দান করাতেই তা নিজেকে সার্থক মনে করে।

৩। অভেদানন্দ: 'ডিভাইন হেরিটেজ অব ম্যান', পৃঃ ১৯৯-২০০

৪। অভেদানন্দ: 'আওয়ার রিলেসান টু দি এ্যাবসোলিউট', পৃঃ ১৯২

পরিশেষে স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারায় অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এচ. ডি. মহাশয়ের অভিমত [৫] এই আলোচনার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,

"It is an uphill task to undertake the evaluation of the philosophy of Swami Abhedananda. In him Sankara's Monistic Vedanta (অদ্বৈতবেদান্ত) received a new orientation. He was pre-eminently a subtle logician and his knowledge of modern science and his grasp of modern trends of thought-movement enabled him to put on an unassailable basis the truths of Vedanta and make them intelligible to the modern mind. It was natural that he won the unstinted admiration and appreciation of the learned world. Scholars and thinkers were compelled to recognize the force of his logic, even when they followed their own lines of thought. Swamiji's spirituality was shot through and through by his intellectuality like Sankaracharya's. As is the case with Sankaracharya, the student, who reads his Bhâsyas (ভাষ্য) with their arrays of arguments supported by incisive logic and their relentless criticism of rival systems of thought is tempted to believe that the philosopher in Sankara was greater than the man of realization. Such is also the case with Swami Abhedananda. He strikes the students of philosophy as a philosopher, out and out, yes, it is undeniable that philosophy is the element in which Swami Abhedananda's genius shines most prominently. But one must not lose sight of the truth that the srength of his philosophy is not derived from the intellectual resources, but has at its back the realization of a Yogi.

"It is not possible for many of us to take a full measure of the whole personality the great Swami possessed. We are bound to approach him from definite angle of view and there is nothing strange in the fact that the Swami is regarded as a philosopher and thinker of a high order, as a man of stupendous scholarship, and or as a great Seer and a man of spiritual illumination. He was all these and much more than our intellect can fathom."

অর্থাৎ 'স্বামী অভেদানন্দের দর্শনের মূল্য নিরূপণ করা একটি দুঃসাধ্য ব্রত। শংকরের অদ্বৈতবেদান্ত তাঁর মাঝে পেয়েছে নূতন রূপ। তিনি ছিলেন অতিগূঢ় তার্কিক এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বর্তমান বিপ্লবী চিন্তাধারার স্বকীয়তা তাঁকে সমর্থ করেছে বৈদান্তিক সত্যকে দুষ্প্রধর্ষ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ও আধুনিক মনের উপযোগী কোরে গ'ড়ে তুলতে। তাঁর পক্ষে শিক্ষিত জগতের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করা স্বাভাবিকই। মেধাবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তাক্ষেত্রেও তাঁর যুক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। শংকরাচার্যের মতন স্বামিজীর

৫। 'অভেদানন্দ স্মৃতিগ্রন্থ—বিশ্ববাণী', চতুর্থ বার্ষিক খণ্ড (আশ্বিন, ১৩৫৭, পৃঃ ১০:—১০৯), স্বামী বোধানন্দ লিখিত প্রবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে গৃহীত।

আধ্যাত্মিকতা বারবার বিদ্ধ হয়েছে তাঁর বৌদ্ধিকতার দ্বারা। শংকরের বেলায় যেমন তাঁর ভাষ্যপাঠরত জ্ঞানার্থী অকাট্য যুক্তিসমর্থিত বিচার ও প্রতিকূল চিন্তাধারা খণ্ডনের ন্যায্যতায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, দার্শনিক শংকর আত্মোপলব্ধ শংকরের চেয়ে অনেক বড়, স্বামী অভেদানন্দের বেলায়ও তাই। এটি সত্যই অনস্বীকার্য যে, দর্শনই সেই শাস্ত্র যাতে স্বামী অভেদানন্দের প্রতিভা লাভ করেছে সর্বাধিক প্রাঞ্জলতা। কিন্তু তাই বোলে কেউ যেন এ' সত্যদৃষ্টিটুকু না হারান যে, তাঁর দার্শনিক শক্তির অভ্যুত্থান বৌদ্ধিক ক্ষেত্র হোতে নয়, পরন্তু তার উদ্ভব যোগোপলব্ধির পৃষ্ঠপোষকতায়।

'আমাদের অনেকের পক্ষেই স্বামিজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। আমরা তাঁকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহন করতে বাধ্য এবং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, স্বামিজীকে ধরা হবে একজন উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক ও চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে, একজন প্রতিভাশালী বিদ্বান বা মহান ঋষি ও আত্মজ্ঞান-উদ্ভাসিত পুরুষ হিসাবে। তিনি এ'সমস্তই ছিলেন আবার এর চেয়েও অনেক বেশী ছিলেন—আমাদের বুদ্ধির গভীরতায় যাঁর পরিমাপ করা যাবে না'।

পরিশিষ্ট

এই পুস্তকে ব্যবহৃত ইংরেজী দার্শনিক পরিভাষার অনূদিত বাংলা পরিভাষা :

ইংরেজী পরিভাষা		বাংলা পরিভাষা
Absolute ...	...	শুদ্ধচৈতন্য, ব্রহ্ম, ভগবান
Absolute Idealism	...	পরাবিজ্ঞানবাদ
Absolute Reality	...	অপরিণামী সত্তা
Absolute Command	...	পরম-নির্দেশ
Acquired Character	...	অর্জিত প্রকৃতি বা সংস্কার
Aesthetic Physics	...	সৌন্দর্যপরতন্ত্র পদার্থবিজ্ঞান
Afferent or Sensory	...	অন্তর্বাহী (স্নায়ুতন্ত্রী)
Affirmation of Will	...	ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা
Aggregate	...	সমষ্টির সমন্বয়
Agnosticism	...	অজ্ঞেয়বাদ
Analytic Intuition	...	বিশ্লেষণাত্মক প্রত্যক্ষ
Analytic Psychology	...	বিশ্লেষণমূলক মনোবিজ্ঞান
Antithesis	...	উত্তরপক্ষ
Apperception	...	প্রত্যাক্ষানুভূতি
Appitition	...	ইচ্ছা, সৃষ্টির ইচ্ছা
A´ priori	...	আন্তর
Asceticism	...	সাধুতা
Associationism	...	সংসর্গবাদ
Automatism	...	স্বয়ংচলতাবাদ
Behaviourism	...	ব্যবহারবাদ
Behaviouristic Psychology	...	আচরণ বা ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞান
Category	...	পদার্থ
Category of Existence	...	সত্তামূলক পদার্থ
Category of Explanation	...	বিশ্লেষণমূলক পদার্থ
Category of the Ultimate	...	চরমপদার্থগত পদার্থ
Categorical Imperative	...	যুক্তিসিদ্ধ নৈতিক নিয়ম, অপরিহার্য অনুজ্ঞা
Categorical Obligation	...	পদার্থগত বাধ্যবাধকতা

ইংরেজী পরিভাষা		বাংলা পরিভাষা
Causal Consciousness	..	কারণজ্ঞান
Conceptual	...	অনুভবাত্মক, মননাত্মক
Consciousness	...	জ্ঞান, চৈতন্য, বিজ্ঞান
Concrete Intuition	..	বাস্তব প্রত্যক্ষ
Conservation of Energy	...	শক্তিসংরক্ষণ
Conditioned Reflex	...	আপেক্ষিক স্নায়বিক উত্তেজনা
Continuity of Germ-plasm	...	জীবাণুর ক্রমসংসরণ
Cosmic Energy	...	বিরাট প্রকৃতি, মহামায়া
Creative Synthesis	..	সৃষ্টিমুখী সমন্বয়
Degrees	...	বিভিন্ন স্তর
Denial of Will	...	ইচ্ছার প্রতিষেধ
Dialectical Historical Meterialism		যুক্তিপরতন্ত্র ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদ
Doctrine of Karma	..	কর্মবিজ্ঞান, কর্মতত্ত্ব
Doctrine of Unity	..	একত্ববাদ
Doctrinal Pantheism	..	তত্ত্বপরতন্ত্র সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Effect	...	কার্য
Efferent or motor	..	বহির্বাহী (স্নায়ুতন্ত্রী)
Ego	..	জীবাত্মা
E'lan Vital	...	প্রাণশক্তি
Emotion	...	চিত্তবৃত্তি, আবেগ
Empirical Consciousness	..	পার্থিব জ্ঞান
Empiricism	...	প্রত্যক্ষবাদ
Enjoyment	...	উপভোগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি
Epistemological Process	...	প্রমাবিজ্ঞানপ্রণালী
Epistemology	...	প্রমাবিজ্ঞান
Ethical Idealism	...	নৈতিক বিজ্ঞানবাদ
Ethical Qualities	..	নৈতিক গুণরাশি
Evolution	..	বিকাশ, অভিব্যক্তি
Explosion	..	স্ফোটন
Extention	..	বিস্তৃতি
Feeling	..	ইন্দ্রিয়ানুভূতি
Forms of Sensibility	..	ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আকার
Forms of Thought	...	চিন্তার আকার-বিশেষ

ইংরেজী পরিভাষা		বাংলা পরিভাষা
Freedom	...	স্বাধীনতা, মুক্তি
Free Choice	...	স্বাধীন নির্বাচনী নীতি
Godconsciousness	...	ব্রহ্মচৈতন্য
Good and Justice	...	কল্যাণ ও ন্যায়নিষ্ঠা
Good Will	...	কল্যাণময়ী ইচ্ছা
Grey Matter	...	ধূসরবর্ণ পদার্থ
Hedonism	...	সুখবাদ
Hypothetical Imperative	...	আনুমাণিক অনুজ্ঞা
Ideas	...	ভাব, বিশ্বমন, বিরাট ইচ্ছা
Idealism	...	আন্তরসত্তাবাদ, অধ্যাত্মবাদ, বিজ্ঞানবাদ
Idealist	...	বিজ্ঞানবাদী, ভাববাদী, আন্তরসত্তাবাদী
Image	...	প্রতিকৃতি
Immanent	...	বিশ্বগত
Immediate Unity	...	সাক্ষাৎভাবে বা প্রত্যক্ষ একীকরণ
Impressions	...	ভাবধারা, সংস্কার সন্তান
Individuality	...	সত্তা, ব্যষ্টিসত্তা
Individual Mind	...	ব্যষ্টিমন
Innate Idea	...	সঞ্চিত (সুপ্ত) সংস্কার
Instinct	...	সহজাত সুপ্তজ্ঞান
Instinctive	...	প্রকৃতিসিদ্ধ
Intellectual	...	বৌদ্ধিক
Intellectual Love	...	বৌদ্ধিক প্রেম বা ভালবাসা
Intellectual Sympathy	...	বৌদ্ধিক সহানুভূতি
Intelligence	...	বুদ্ধি
Intuition	...	অপরোক্ষজ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞান (কাণ্ট)
Knowing and Being	...	চিৎ ও সৎ
Matter	...	জড়, দ্রব্য
Materialism	...	বস্তুতন্ত্রবাদ
Materialistic Pantheism	...	ইহবাহ্যপরতন্ত্র সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Mathematical	...	গণিতশাস্ত্রাত্মক
Medium	...	মাধ্যম, উপায়
Memory	...	স্মৃতি, মন, সংস্কার

ইংরেজী পরিভাষা		বাংলা পরিভাষা
Mental	...	আন্তর, মানস
Mental World	...	মনোলোক
Mentalism	...	ভাববাদ
Metaphysical Idealism	...	অধ । ঃজ্ঞানবাদ
Modes	...	বিকাশ
Modification	...	মনোবৃত্তি, বৃত্তি
Monism	...	একেশ্বরাবাদ
Moral Freedom	...	নৈতিক স্বাতন্ত্র্য
Moral Obligation	...	নৈতিক নীতির অনুরোধে
Morality	...	নৈতিকতা
Natural Selection	...	প্রাকৃতিক নির্বাচন
Necessary Revelation	...	অপরিহার্য অভিব্যক্তি
Nagative	...	নেতিবাচক
Neo-Platonist	...	নব্য-প্লেটোপন্থী
Neo-Realist	...	নব্যবস্তুতন্ত্রবাদী
Neutral Monism	...	নিরপেক্ষ একত্ববাদ
Neutral Particulars	...	নিরপেক্ষ উপাদানসমষ্টি
Non-dualism	...	অদ্বৈতবাদ
Noumenon	...	বিশ্বোত্তীর্ণ পরিপূর্ণ সত্য
Objective	...	জ্ঞেয়, প্রমেয়
Objective Idealism	...	বিষয়-বিজ্ঞানবাদ
Objective Mind	...	বিষয়-মন
Objectification	...	বহিরাভিব্যক্তি
Optic Nerve	...	রূপবহা স্নায়ু বা নাড়ী
Organic Evolution	...	জৈববিকাশ
Pantheism	...	সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Parallelistic Monism	...	সমান্তরাল বা সমনিয়ততন্ত্র একত্ববাদ
Perception	...	প্রত্যক্ষজ্ঞান
Personality	...	ব্যক্তিত্ব
Phenomenology	...	দৃশ্যবাদ
Philosophic Pantheism	...	দর্শনপরতন্ত্র সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Physico-chemical Process	...	আন্তর-বাহ্যপ্রণালী
Poetic Aesthetic Pantheism	...	কাব্য-সৌন্দর্যপরতন্ত্র দেবতাবাদ

ইংরেজী পরিভাষা		বাংলা পরিভাষা
Positive	...	ইতিবাচক
Positivism	...	ধ্রুববাদ
Practical Intuition	...	ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ
Pre-established Harmony	...	পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সমন্বয়
Primal Stuff	...	মূল-উপাদান
Primal Undifferentiated Unconscious	...	অখণ্ড অবচেতন জ্ঞান
Progress	...	অভিব্যক্তি, প্রগতি
Protoplasm	...	প্রাণপঙ্ক
Psyche	...	আত্মা, বিদেহী আত্মা
Psychology	...	মনোবিজ্ঞান
Pure Act	...	বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি
Pure Reason	...	নিছক বিচার, শুদ্ধবিচার
Realism	...	বস্তুতন্ত্রবাদ, জড়বাদ
Realist	...	বস্তুতন্ত্রবাদী
Realistic Pantheism	...	বস্তুপরতন্ত্র সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Reason	...	বিচার
Recognition	...	প্রত্যভিজ্ঞান
Reconciliation of Opposites	...	ভেদের একীকরণ
Reflection-into-Itself	...	প্রতিভাস
Reflex Action	...	অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়া
Relative	...	সাপেক্ষ
Sameness	...	একত্ব
Scientific Pantheism	...	বিজ্ঞানপরতন্ত্র সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Self-coherence	...	অন্তর্বিরোধহীন আত্মসঙ্গতি
Self-caused	...	স্বয়ংকারণ
Sensationalism	...	সংবেদনবাদ
Sensation	...	সংবেদন, ইন্দ্রিয়ানুভূতি
Sensibila	...	বুদ্ধি
Sexual Impulse	...	ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি
Sexual Instinct	...	কামপ্রবৃত্তি
Skepticism	...	সন্দেহবাদ
Solipcism	...	বিজ্ঞানমাত্রবাদ

ইংরেজী পরিভাষা		বাংলা পরিভাষা
Spirit	...	চৈতন্য, আত্মা, প্রেতাত্মা
Spirit World	...	পরলোক
Spiritualism	...	অধ্যাত্মবাদ, প্রেততত্ত্ববাদ
Structure of Energy-units	...	শক্তিকণার সমষ্টি
Subconscious	...	অবচেতন, অজ্ঞাত
Subject	...	বিষয়ী, জ্ঞাতা, প্রমাতা
Subjective Idealism	...	বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদ
Subjective Mind	...	বিষয়ী-মন
Superconscious	...	পরচেতন
Supermind	...	পরমন
Suggestion	...	ইঙ্গিত
Synthesis	...	একীকরণ, সংশ্লেষণ, সমন্বয়
Synthetic Intuition	...	সংযোগাত্মক প্রত্যক্ষ
System	...	গোষ্ঠি
Theological Morality	...	ধর্মশাস্ত্রসম্মত নৈতিকতা
Thing-in-itself	...	পরমার্থিক বস্তু বা সত্য (ব্রহ্ম)
Thought and Knowledge	...	মন ও প্রাণ
Time and Category	...	উপাদানমূলক বা গুণাত্মক কাল
Transcendent	...	বিশ্বোত্তীর্ণ
Transcendental Absolutism	...	অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিজ্ঞানবাদ
Unconscious	...	অজ্ঞাত মন, অবচেতন
Unknown and Unknowable	...	অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়
Unified Pluralism	...	বৈচিত্র্যের সমন্বয়
Universal Godism	...	সার্বভৌমিক দেবতাবাদ
Utilitarianism	...	উপযোগবাদ, হিতবাদ
Wholly-other	...	একান্তবিরহী ব্রহ্ম

নির্ঘণ্ট